বাংলা লোকনাট্য পালাগান : প্রকৃতি ও প্রয়োগ

M.Phil

তত্ত্বাবধায়ক : ড. ওয়াকিল আহমদ
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক : আলিম আল রাজী
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

RB
B L
398.2049144
ALB
D

জনাব আলিম আল রাজী আমার তত্ত্বাবধানে "বাংলা লোকনাট্য পালাগান : প্রকৃতি ও প্রয়োগ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা সমাপ্ত করেছেন। তিনি এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা জমা দিবেন। এম. ফিল. গবেষক হিসেবে তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৭/৯৭-৯৮, তারিখ : ৩১-০১-২০০০।

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, তাঁর এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এটি বা এর অংশ-বিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

ওয়াকিল আহমদ ১৪-৩-০২

(অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

400830

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
400830

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লোকনাট্য পালাগান : প্রকৃতি ও প্রয়োগ

তত্ত্বাবধায়ক : **ড. ওয়াকিল আহমদ**
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক : **আলিম আল রাজী**

এম ফিল ২য় বর্ষ : আরম্ভ ২৭-০৩-২০০১
নিবন্ধন নং ও তারিখ : ৭/৯৭-৯৮, ৩১-০১-২০০০
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

400830

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ থেকে এম এ সমাপ্ত করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম ফিল গবেষণার কাজ শুরু করি। নাট্য ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ে আন্তরিক আগ্রহ আমাকে এই গবেষণায় তাড়িত করেছে। আমার গবেষণার বিষয়, "বাংলা লোকনাট্য পালাগান : প্রকৃতি ও প্রয়োগ"। গবেষণালব্ধ অভিসন্দর্ভ তৈরী করতে আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. ওয়াকিল আহমদ স্যারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের এম এ ক্লাশে বাংলা লোকনাট্যের উপরে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক সম্পর্কিত অভিনয়ের উপরে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণের সময় নবীন পালাকার ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর পরিবেশিত পালাগানের অভিনয়-দক্ষতা দেখে পালাগান সম্পর্কে আমার মধ্যে আগ্রহ তৈরী হয়। পাশ্চাত্যের অভিনয় কৌশলের উপরে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে বাংলা লোকনাট্যের বিভিন্ন অভিনয় রীতিকে বিশ্লেষণাত্মক আঙ্গিকে দেখার জন্য নতুনভাবে আগ্রহ তৈরী করে দেন পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ। এম এ পাশের পরে ড. ওয়াকিল আহমদ স্যারের কাছে উপরোল্লিখিত শিরোনামে গবেষণা করার জন্য আমার আগ্রহের কথা জানালে তিনি সানন্দে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। গবেষণার অভিসন্দর্ভ কিভাবে তৈরী করতে হয়, তার গঠন কেমন হওয়া উচিত মূলত আমি কি করতে চাই সে ব্যাপারে তিনি আমাকে পরিষ্কার ধারনা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই আমি আমার অভিসন্দর্ভের কাজ শেষ করতে পেরেছি। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপদেশ, তথ্য-উপকরণ সরবরাহের দ্বারা ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আলোচনার দ্বারা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কখনও নতুন আঙ্গিকে তা বিশ্লেষণ করার চিন্তাকে জাগ্রত করার সাহস যুগিয়েছেন। শুধু ছাত্র হিসেবেই নয় তাঁর তত্ত্বাবধানে একজন গবেষক হিসেবে গবেষণার কাজে যেখানেই থমকে গিয়েছি সেখানেই তিনি আমার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে গবেষণাকে নতুন উদ্যমে চালিয়ে যাবার প্রেরণা যুগিয়েছেন। শুধু পুথিগত বিদ্যাই নয়, তার বাইরেও একজন গবেষককে, যে নিজস্ব চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণী ক্ষমতার দ্বারা গবেষণার কাজকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে হয়, সেই বিশ্বাসের দ্বার উন্মোচন করতেও তিনি আমাকে সাহস যুগিয়েছেন। তাঁর অপরিসীম মহানুভবতার ঋণ কোনদিন পরিশোধযোগ্য নয়।

গবেষণা কাজে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে আমি অকৃপণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও সুফিয়া কামাল গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ ব্যবহারের সহযোগিতা পেয়েছি। আমি এসব গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণা কাজে ব্যবহৃত তথ্যাদির জন্য আমার পূর্বসূরী গবেষক, সমালোচক ও প্রাবন্ধিকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা রইল।

আলিম আল রাজী
এম ফিল দ্বিতীয় বর্ষ
নিবন্ধন নং : ৭/৯৭-৯৮
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়সূচী

		পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১
২.	বাংলা লোকনাট্য ও পালাগান	৪-২৬
	২.১. লোক কি?	৪
	২.২. লোকনাট্য ও অভিনয় উপাদান	৮
	২.৩. লোকনাট্য হিসেবে পালাগান	২৩
৩.	পালাগানের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, রীতি ও শ্রেণীবিভাগ	২৭-৮৭
	৩.১. পালাগানের সংজ্ঞা	২৭
	৩.২. স্বতন্ত্র রীতি হিসেবে পালাগান	২৯
	৩.২.১. পালাগান (পূর্ব ময়মনসিং অঞ্চল)	২৯
	৩.২.২. মণিপুরীদের পালাগান	৩৯
	৩.২.৩. পালাগান (বগুড়া অঞ্চল)	৪১
	৩.২.৪. তারী গান	৪৩
	৩.২.৫. রয়ানী গান	৪৫
	৩.২.৬. 'পাজ্খু' ও 'জ্যা' (মারমা সম্প্রদায়)	৫৫
	৩.২.৭. কেচ্ছাকাহিনী	৫৭
	৩.২.৮. কেচ্ছাগান	৫৯
	৩.২.৯. হাস্তর গান	৫৯
	৩.২.১০. ঘাটুগান	৬০
	৩.২.১১. মাটিয়াল গান	৬৪
	৩.২.১২. গম্ভীরা গান	৬৬
	৩.২.১৩. যোগীর গান	৬৮
	৩.২.১৪. আলকাপ গান	৭৪
	৩.২.১৫. সচেতনতামূলক কার্যক্রমে পালাগানের ব্যবহার (ইসি বাংলাদেশ)	৭৮
৪.	পালাগানের বিষয় ও আঙ্গিক	৮৮-১০৩
	৪.১. পালাগানের বিষয়	৮৮
	৪.২. পালাগানের ছন্দ	৯৬
	৪.৩. পালাগানে কাহিনীর গঠন-কাঠামো (ইতিবৃত্ত)	৯৮
	৪.৩.১. প্লট বা ইতিবৃত্ত বিচার	১০০
৫.	পালাগান উপস্থাপনা	১০৪-১২২
	৫.১. পালাগানের রস নিষ্পত্তি	১০৪
	৫.২. পালাগানের অভিনয় কৌশল	১০৭
	৫.৩. উৎস সন্ধান	১২১
৬.	উপসংহার	১২৩

অতিরিক্ত সংযোজন

লোকনাট্য সমীক্ষা	গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নছক	১২৪-১২৫
পরিশিষ্ট	পালাগানের অভিনয় উপস্থাপন আলোচনায় "যোগীর গান" এর অংশ বিশেষ	১২৬-১৪১
গ্রন্থপঞ্জি		১৪২-১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

১. ভূমিকা

লোক ঐতিহ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার হল আমাদের বাংলা লোকনাট্য। যারা এই লোকনাট্যের ধারক ও বাহক সাধারণ অর্থে তাঁরা আমাদের কৃষিজীবী সমাজ। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির সামাজিক আবর্তের দ্বারা অনুবর্তিত হয়ে লোকনাট্য রূপ নিয়েছে বিভিন্ন রীতি ও বৈশিষ্ট্যের। মাধ্যম হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা মুখে মুখে, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চর্চিত হয়ে এসেছে। মুখে মুখে প্রচলিত বলে তা লিখিতরূপে সংরক্ষণের উদাহরণ খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সমাজের বিবর্তনের সাথে এসব লোকনাট্য পরিবেশনের রীতিও পরিবর্তিত হত এবং এখনও পরিবর্তিত হয় বলে প্রতিনিয়তই সেখানে উদ্ভাবিত হচ্ছে পরিবেশনার নতুন নতুন আঙ্গিকগত বিভিন্ন বিষয়। আবার কোথাও কোথাও স্থানীয় লোকাচার ও লোক বিশ্বাসের কারণে একই বিষয়ের নাট্য পরিবেশনা ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এসব লোকনাট্যের কোনরূপ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত না থাকায় লোকনাট্য পরিবেশনার সংলাপগুলি কোন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। কিন্তু তার একটি গঠনগত ছক (শুরু-মধ্য-শেষ) অবশ্যই থাকে। এই ছকের উপর ভিত্তি করে লোকনাট্য শিল্পীদের তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভাবন করতে হতো তাঁদের যাবতীয় অভিনয় কৌশল। তাঁদের অভিনয়ের ধারা বা বৈচিত্র্য সবসময় একইরকম হতো না বা এর কাঠামোগত দিক কোন নির্ধারিত ছকে বাধা ছিল না। সেখানে লোকনাট্যের অভিনয় ছিল অভিনয়ের বিধি-বন্ধন থেকে একেবারেই মুক্ত। তবে লোকনাট্যের মধ্যে যেসব বিধি-বন্ধন পরিলক্ষিত হয় সেগুলি তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত এবং পালনীয় কিছু আচার-ব্যবহার। যেমন- নাটোর অঞ্চলে মনসা বিষয়ক লোকনাট্য 'পদ্মাপুরাণ গান', বাগেরহাট অঞ্চলে 'রয়ানীগান' ইত্যাদি পরিবেশনার পূর্বে অভিনেতারা মনসার ঘট সাজিয়ে পূজা করেন। শত্রু ক্ষতি করতে পারে ভেবে তাঁরা নিজেদেরকে রক্ষার জন্য 'দেহ-বন্ধন', 'আসর-বন্ধন' ইত্যাদি লোকাচার পালন করে থাকেন। এসব ধর্মীয় কৃত্য বা লোকাচার পালন লোকনাট্য পরিবেশনার একটি অংশ বিশেষ। অত্যন্ত সতর্কতা ও গভীর মনোযোগের সাথে এসব লোকাচার পালিত হয় বলে লোকনাট্য পরিবেশনায় কলাকুশলীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা বা পাঠ্য বিষয় হিসেবে 'নাট্য' বিষয়ের একজন শিক্ষার্থীকে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে লোকনাট্যের ঐ পরিবেশনকারীদের মতোই 'নাট্য'কে মনে-প্রাণে, ধ্যানে-জ্ঞানে ধারণ করে নিয়মিত এবং একাগ্রতার সাথে গভীরভাবে অনুশীলন করতে হয়। আর যখন সে অভিনয়ে নিজেকে এবং তাঁর পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হয়, তখনই একজন অভিনেতা নিজেকে সফল অভিনেতা হিসেবে দাবী করতে পারে। এটা হল অভিনয়ের সেই শক্তি বা ক্ষমতা বা দক্ষতা যা- লোকনাট্যের ঐ অভিনেতার মধ্যে থাকে, যা তাঁদের দীর্ঘ দিনের নাট্যচর্চার ফল বা অর্জিত শক্তি। একজন নাট্য শিক্ষার্থী বা নাট্য অনুরাগী হিসেবে লোকনাট্য অভিনয়ের এইরূপ শক্তিকে অর্জন করতে হলে তার পঠন-পাঠন, চর্চা এবং অনুশীলন করা একান্ত জরুরী। এরফলে অভিনয় সম্বন্ধে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষালব্ধ অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি লোক ঐতিহ্যের মধ্যে নাট্যানুসন্ধান করার চেষ্টা, বর্তমান নাট্যচিন্তার অভিজ্ঞতাকে আরও পরিশীলিত করে শিক্ষার্থীকে নাট্যচিন্তা ও ভাবনায় সময়োপযোগী ও গতিশীল করে তুলতে পারে।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী বিশেষ করে পূজা-পার্বণ, চৈত্র-সংক্রান্তিতে, বৎসরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত কোন মেলায় যেমন- বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা ইত্যাদি লোক-উৎসবে বিভিন্ন লোকনাট্য অভিনীত হয়। এসব লোকনাট্য সাধারণভাবে লোক বা জনগণ দ্বারা অভিনীত হয়ে এসেছে। বিশেষ করে যারা শহুরে নয় এমন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন অথবা নিরক্ষর লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ধর্মীয় কোন কাহিনী, কিংবদন্তী, প্রথাভিত্তিক, মৌসুমভিত্তিক কোন বিষয়বস্তুকে নিয়েই আমাদের বিশাল সম্ভারের লোকনাট্য চর্চিত হয়ে থাকে, 'যা একেবারে দেশজ নাট্য' অর্থাৎ বিদেশ থেকে আসেনি যে নাট্য বা নাট্যক্রিয়া। এখানে যারা নাট্য উপস্থাপন করেন তাঁদেরকে আমরা কুশিলব বলি।
সেক্ষেত্রে, নাট্য বলতে আমরা;

> দর্শক + কুশিলব + ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া + অভিনয়স্থান = নাট্যকে বুঝব।
> এখানে 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' হল;
> লোকনাট্যে যে অভিনয় করছে 'সে' প্রভাবিত হয়, 'যে' দেখছে তাঁর দ্বারা → তাঁর (অভিনেতা) দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে দেখছে সে। অর্থাৎ ক্রিয়ার আদান-প্রদান। এখানে অভিনেতা যেমন দর্শকের দ্বারা প্রভাবিত হয় তেমনি দর্শকও অভিনেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

আমাদের দেশে ধর্ম বা প্রথা চালিত কোন উৎসব উপলক্ষে অথবা অবসর সময়ে আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই হাজার বছর ধরে এই লোকনাট্য সাধারণ মানুষের দ্বারা লালিত হয়ে এসেছে। এসব লোকনাট্যের মধ্যে পালাগান একটি জনপ্রিয় নাট্যরীতি। পূর্ব ময়মনসিং অঞ্চল এবং নেত্রকোনা, বগুড়া, চট্টগ্রামসহ বেশ কিছু অঞ্চলে এই পালাগান পরিবেশিত হতে দেখা যায়। মিশ্র রীতির (সংলাপ-বর্ণনার অংশ সমান পরিমাণ) এই পালাগানের মধ্যে বর্ণনাত্মক

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয়, সংলাপাত্মক অভিনয়, নৃত্য-গীত বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় 'পালাগান' অন্যান্য লোকনাট্য রীতির সাথে যথেষ্ট সম্পর্ক যুক্ত। এছাড়াও পালাগানের মধ্যে একজনমাত্র মূল গায়েন থাকেন, যিনি একাই বর্ণনা, সংলাপ, নৃত্য-গীত এর মাধ্যমে এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দর্শকদেরকে ধরে রাখতে সমর্থ হন। পালাগানের এই মূল গায়েনকে সাহায্যের জন্য দোহার দল থাকে আসরের মধ্যে, যারা মূল গায়েনের গানের সাথে পাইল ধরে পালাগানের পরিবেশনাকে আরও জোরালো ও আকর্ষণীয় করে তোলে। দোহারদের মধ্যে একজন আবার কোন স্থান পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র বাচিকাভিনয় ব্যবহার করে মূল গায়েনকে সাহায্য করে থাকেন। পালাগানের এইরূপ পরিবেশনার জন্য এই পাইল-দোহাররাই একই সাথে যন্ত্রীদলেরও কাজ করে থাকেন। পাইল-দোহারদের প্রত্যেকেই কোন না কোন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসরে অবস্থান করেন। এদের ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোর মধ্যে হারমোনিয়াম, ঢোল-তবলা, করতাল, মন্দিরা, চটি ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

সুগ্রথিত ঘটনার পরিণামমুখী অগ্রগতি, দ্বন্দ্বময় বৃত্ত এবং সংলাপের প্রাণময়তা পালাগানের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে লক্ষণীয়। এছাড়াও পালাকার বা মূল গায়েন পালা পরিবেশনে বিভিন্ন রুচির দর্শকদেরকে তাঁর পরিবেশনার প্রতি আকৃষ্ট করে ধরে রাখার জন্য কতগুলি অভিনয়-কৌশল ব্যবহার করেন। ব্যবহৃত এসব অভিনয়-কৌশল পালাকার বা মূল গায়েনের তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট এবং পালা পরিবেশনের সময় এগুলির ব্যবহার সাধারণত দর্শকের রুচিবোধ এবং প্রতিক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে থাকে।

আমরা জানি, শহুরে থিয়েটার চর্চিত হয় মঞ্চ বা প্রসেনিয়ারম থিয়েটারের চার দেয়ালের ভেতরে। অন্যদিকে লোকনাট্য দাবী করে উন্মুক্ত স্থান। তাই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের থেকে লোকনাট্য একটি বড় রকম আলাদা বিষয়। থিয়েটারের সূক্ষ্ম কাজ এখানে সম্ভব নয়। এখানে টাইপ চরিত্র বা ট্রিপিক্যাল চরিত্র সবসময় কাজ করে। সে কারণে নাট্যপরিবেশনায় দর্শক ধরে রাখা অনেক শক্ত কাজ এবং অভিনেতার জন্য অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে পালাগানকে জনপ্রিয় করে পরিবেশনার জন্য মূল গায়েনকে যেমন নাচে, গানে, সংলাপের আদান-প্রদানে এবং সামগ্রিক দল পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হয়, তেমনিভাবে একজন অভিনেতা হিসেবে তাঁকে দর্শকের মনোভাব, রুচি, মানসিক অবস্থাসহ নিজের সামর্থ বা যোগ্যতার প্রতিও আস্থাশীল হতে হয়। 'পালাগান' তাই শুধুমাত্র নাট্যজগতেরই নয় বরং আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত।

আমাদের দেশে বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় 'নাট্য' বিষয়টি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের মতো একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে 'নাট্য', 'নাটক', বা 'নাট্যতত্ত্ব' নামে জায়গা করে নিয়েছে। বাঙালী হিসেবে আমাদের রক্তে মিশে আছে হাজার বছরের নাট্য ঐতিহ্যের 'অণু'। তাই নাট্য বিষয়ে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পাশাপাশি একবিংশ শতাব্দিতে পালাগানের দক্ষ পরিবেশনা রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা একজন নাট্য শিক্ষার্থীমাত্রই জরুরী বিষয়।

'বাংলা লোকনাট্য পালাগান : প্রকৃতি ও প্রয়োগ' শীর্ষক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে লোককলা তত্ত্বের 'Performance Theory' বা 'প্রদর্শন পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহে লোকনাট্যের অভিনয়ে কথক-গায়ক-দর্শক-শ্রোতা আসরে যেরূপ আচরণ করে ও মনোভাব ব্যক্ত করে-সেসব বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়। আবার তথ্যদাতা (informant) নিজেরা কিরূপ অর্থপোষণ করে, তাও নথিভুক্ত করা হয়। সঙ্গীত অভিনয়াদি প্রদর্শন ছাড়াও এমন অনেক বিষয় আছে যা কেবল গায়ক-কথকের মুখের কথায় ধরা পড়ে না, কেবল গান পরিবেশনার সময় অভিনেতা তাঁর অভিনয়ের (আঙ্গিক ও স্বাত্ত্বিক) ভেতর দিয়ে সেগুলিকে প্রদর্শন করে থাকেন, যেমন- অঙ্গভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গি, হাততালি ইত্যাদি দ্বারা আবেগ-উল্লাস প্রকাশ করেন। এসব তথ্যাদি সংগ্রহে যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ-

১) মূল উপকরণ (text);
২) গায়ক-কথক তথ্যদাতা (informant)
৩) পরিবেশ-পরিস্থিতি (Context) / পাঠ সংক্রান্ত তথ্য

পাশ্চাত্যের লোককলাবিদগণ বর্তমানে লোককলার সংগ্রহ ও গবেষণায় 'Performance Theory' বা 'প্রদর্শন পদ্ধতি'র কথা বলছেন। ডান বেন-আমোস এ পদ্ধতির একজন প্রবক্তা। এটি ঠিক তত্ত্ব নয়। কি পদ্ধতিতে লোককলার উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে-এরূপ ধারণা থেকে পণ্ডিতগণ 'Performance

Dhaka University Institutional Repository

Theory'-এর কথা বলেন। পরিবেশ-পরিস্থিতিসহ মূল পাঠের সার্বিক গবেষণার (Contextual Research) রীতি-পদ্ধতি এর মূখ্য বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়।[১]

[১] ড. ওয়াকিল আহমদ, লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

২. বাংলা লোকনাট্য ও পালাগান

২.১. লোক কি?

বাংলা লোকনাট্যের সম্ভার যতটা বিশাল ঠিক ততটাই বিশাল ছোট্ট দুটি বর্ণের এই 'লোক' শব্দটি। লোকনাট্যের 'লোক' বিষয়ে প্রত্যেক মনীষীই অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার আলোকে প্রথমে 'লোক' এবং পরবর্তীতে 'লোকনাট্য'কে বুঝতে চেষ্টা করব। 'লোক' শব্দটির আভিধানিক যে অর্থ সেই সাধারণ 'লোক' বা 'ব্যক্তি' অর্থে এর প্রয়োগ সাধারণত হয় না। 'লোক' শব্দ দ্বারা সংকীর্ণ অর্থে নাগর-শিক্ষা, সংস্কৃতির বাইরের অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, বিশ্বাস প্রবণ, প্রাচীন সংস্কার ও প্রথাচালিত মানুষের একটি পর্যায়কে বুঝে থাকি। ধারণা করা হয়, এক সময় সমস্ত মানুষ লোকপর্যায়ভুক্ত ছিল। তাহলে বলা যেতে পারে, সে সময়ে লোক-অলোক বলে কোন পার্থক্য ছিল না এবং এই লোক-অলোক পার্থক্য শ্রেণী বিভক্ত সমাজেরই সৃষ্টি। সমাজের নিম্নস্তরের প্রতি উচ্চস্তরের সামাজিক শ্রেণীর এক ধরণের মানসিকতা বা মনোভাব থেকেই এর উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে ড. গৌরী শংকর ভট্টাচার্য এর বিশ্লেষণটি অনেক বেশি সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়, "সমাজ বিবর্তনের একটি বিশেষ অংশকে আর এক অংশ যে দিন 'লোক' বলে চিহ্নিত করল সেদিন হতেই 'লোক' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে ঐ বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও আজও একটা অংশকে আর একটা অংশ 'লোক' বলে চিহ্নিত করে থাকে।"[২]

এক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে জনগোষ্ঠীর এক অংশ অন্য অংশকে 'লোক' বলে গণ্য করে থাকে তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে যে সভ্যতার উদ্ভব হয় তাকে নাগরিক জীবন ও গ্রাম্য জীবন এ দু-ভাগে ভাগ করতে পারি। অবশ্য এখানে দুটি জীবনধারার পেছনে দুটি মানসিকতা কাজ করে। যা দুই জনপদের দুই সংস্কৃতিকে পৃথক করে দেয়। এই পার্থক্যের ফলে নাগরিকেরা গ্রামের সব কিছুকেই গ্রাম্য আখ্যা দিয়ে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করতে থাকে। বিশেষ করে শিক্ষিতেরা নিজেদেরকে শিষ্ট এবং নিজেদের আচারকে শিষ্টাচার বলে ধরে নিয়ে অশিক্ষিতদের অশিষ্ট ও তাঁদের আচারকে অশিষ্টাচার বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে। এ প্রসঙ্গে গৌরী শংকর ভট্টাচার্য যথার্থই বলেন, "ক্রমে নাগরিক ও শিষ্ট সমার্থক হইয়া দাঁড়াইবার ফলে নাগরিক আচারই শিষ্টাচার বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং গ্রাম্য ও অশিষ্ট সমার্থক হইয়া পড়ায় গ্রাম্য ও অশিষ্ট জনগোষ্ঠীই শিষ্টদের কাছে 'লোক' আখ্যা পায়।"[৩] এই লোক মানসিকতা ও আচার শুধু গ্রামের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা নাগরিক মানুষের আচার আচরণের ভিত্তি হয়ে আছে। যেমন- গ্রামের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ঘটে থাকে অতি সরল লোকগাথা, লোক-উপকথা, লোকসংগীত, লোকনৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে। গ্রাম্য লোকের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ, চিরাচরিত প্রথানুবর্তনের প্রবৃত্তি, কুসংস্কার ও যৌথ চেতনা বেশি কাজ করে। গ্রাম্য লোকের এই সংস্কৃতির অনগ্রসরতা-সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোক যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তাকে পাবার অধিকারে বঞ্চিত থাকার অবস্থা। যারা সে সব শ্রেণীর অর্থনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত হয়েছে, অপরের জমি চাষ করে, মাছ ধরে, পশুপালন করে বা এই জাতীয় স্বল্পার্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করে কোন রূপে প্রত্যন্ত প্রদেশে কোনঠাসা জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে, তারা সাংস্কৃতিক জীবনের অর্থাৎ শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারেনি। ফলে অসংস্কৃত মতি-বুদ্ধি নিয়ে তারা চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তন করে কুসংস্কারকে আদিম বিশ্বাসের ঐকান্তিকতায় আঁকড়ে ধরে জীবনযাপন করেছে এবং সমাজের তলানিতে পরিণত হয়েছে। যে প্রক্রিয়ায় সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বা জনগোষ্ঠীকে সমাজের কেন্দ্র হতে পরিধিতে, নগর থেকে গ্রামে ঠেলে দিয়েছে এবং নগরের ও গ্রামের গণ্ডীর মধ্যেও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে তলানিতে পরিণত করেছে সেই প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তা আসলে অর্থনৈতিক।

এ প্রসঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন- সমাজ বিজ্ঞানী William Graham Summer তাঁর Folkways গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, সমস্ত যুগের এবং সমস্ত সাংস্কৃতিক পর্যায়ের মানুষের জীবন প্রধানত লোকরীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, এই লোকরীতি বা সংস্কার মানব জাতির বা গোষ্ঠীর আদিমতম অবস্থা থেকে লোক পরম্পরার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং পশুর স্বাভাবিক আচরণের সাথে তার মিল রয়েছে। তিনি বলেন, "এই সংস্কারের শুধু উপরিতলেই পরিবর্তন ঘটে এবং দর্শন, নীতি ও ধর্ম অথবা অন্যবিধ মনন দ্বারা সামান্য পরিমাণেই তা পরিবর্তিত হয়।"[৪] এই উক্তির মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় হল, মানব সমাজের আদিমতম স্তরে যে লোক মানসিকতা ও আচার অনুষ্ঠান দেখা গিয়েছিল, তা সমস্ত যুগের ও সমস্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে লোক-অলোক সমস্ত মানুষের মানসিকতা ও আচার বিচারের ভেতর দিয়ে

---

[২] গৌরী শংকর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৭

[৩] ঐ, পৃ. ১৮

[৪] ঐ, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

অলিখিতভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যদিও এই প্রবাহ আপেক্ষিক কিন্তু তার বস্তুগত বিভাজনের পেছনের কারণটি হল ঐ অর্থনৈতিক বা 'অর্থবৈষম্য'।

এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর ভিত্তি করেই জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে লোক মানসিকতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করে এবং অপরাংশের মধ্যে অন্যরূপ মানসিকতার (লোক মানসিকতার মাত্রা হ্রাস) উদ্ভব ঘটে, যা কৃষিযুগ থেকে শিল্পযুগের বিবর্তন প্রক্রিয়ার ইতিহাসের মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়-

আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না। সবাই সমান অধিকার ভোগ করত বলে কাউকেই 'লোক' বলে উপেক্ষা করার মত সে সমাজে কেউ ছিল না। শ্রম বিভাগ তথা শ্রেণী বিভাগ হবার পরেই শক্তি বা অধিকার ও কৃষ্টির পার্থক্যের ভিত্তিতে, সাম্যাবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ও বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। শ্রম বিভাগ তথা শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে এই বৈষম্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেয়া যেতে পারে। গৃহ নির্মাণের পরে আদিম মানবের মধ্যে কর্ম বিভাগ শুরু হয়। অপেক্ষাকৃত কম শারীরিক শক্তির জন্য নারী রন্ধন, সেবন জাতীয় প্রভৃতি গৃহকর্মে নিযুক্ত হত এবং অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী পুরুষ খাদ্য সংগ্রহ, অস্ত্র নির্মাণ, শিকার ও যুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হত। কেবল স্ত্রী-পুরুষ ভেদে এই কর্ম বিভাগের উৎপত্তি ঘটে যাতে কোন শ্রেণী-চেতনা ছিল না।

পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক লোক যখন ধাতু দ্রব্যের ব্যবহার যেমন- পাত্র নির্মাণ, নৌকা নির্মাণ, যুদ্ধরথ প্রস্তুতকরণ এবং গৃহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরীর কাজে মনোনিবেশ করল, তখন পশুচারিক জনগণ তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। এখানেই প্রথম সামাজিক কর্ম বিভাগের সূচনা। শ্রেণী-চেতনার বীজও এর মধ্যে নিহিত। এ সময় থেকেই এক বিষয়ের কর্মী কর্তৃক অন্য বিষয়ক কর্মীর উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করার সুবিধা গ্রহণের জন্য দ্রব্য বিনিময় প্রথার প্রচলন ঘটে। কর্মীদের সবাই-ই প্রধানত জমির চাষ করত। কেবল অবসর সময় প্রবণতা অনুসারে অন্য কাজে লিপ্ত হত। প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করে নিপুণতা অর্জন করার পরে কিছু লোক চাষ ছেড়ে অন্য কাজে মনোযোগী হতে থাকে। কাজেই গোষ্ঠীর চাষের জমি গৃহপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। আবার একই গৃহের লোক প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করতে থাকায় শেষ পর্যন্ত চাষাবাদে মনোযোগী ব্যক্তির হাতেই জমি আসে এবং এভাবেই চাষ-বাসের ফলে জমির উপর চাষীর এক প্রকার দখলিস্বত্ব জন্মায়। এই স্বত্ব নিয়ে কেউ কেউ কৃষিকাজে ও পশুপালনে আবার কেউ বা শ্রমশিল্পে বিশেষভাবে নিযুক্ত হতে থাকে। এর ফলে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। জনসংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকার ফলে যেমন কৃষিকর্ম তেমনি শ্রমশিল্পেও কাজের সুবিধার জন্য অধিক লোক যোগ দিতে থাকে এবং উভয় সম্প্রদায়ই কর্মস্থলের কাছাকাছি বসবাস করতে আরম্ভ করে। ফলে কৃষিকাজ ও শিল্পকর্ম নিয়ে দুটি পৃথক অঞ্চল গড়ে ওঠে এবং কৃষি জনপদে পল্লী ও শিল্পাঞ্চলে শহরের সূচনা হয়। অল্পায়াসলভ্য জীবিকার মাধ্যমে পল্লীতে সরল জীবনযাপনে সুবিধা হওয়ায় অনেকেই কৃষিকাজে নিয়োজিত হয়। এদিকে ধীরে ধীরে শ্রমশিল্পের অগ্রগতির ফলে শিল্পাঞ্চলে লোকাভাব দেখা দেয়। এই অভাব দূর করার জন্য সমাজে একটি প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং তাহল 'ক্রীতদাস প্রথা'। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহে বিজয়ী দল যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। এই ক্রীতদাস কর্মীদের প্রভুরা শাসন ও শোষণ করত। ফলে প্রভু ও ক্রীতদাস প্রথার মধ্যে শোষণ বৃত্তির সূচনা ঘটে। ক্রীতদাস তাঁর প্রভুকে খুশি করতে না পারলে অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দিন কাটানোই ছিল তাঁদের পরিণাম। এভাবে স্বাধীন মানবের পাশে পরাধীন মানবরূপে আর একটি শ্রেণী গড়ে ওঠে। তবে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ব্যবসার সাহায্যে অনেক শিল্পপতি অধিক সম্পদের অধিকারী হয় এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দেখা দেয়।

শহরাঞ্চলে জনগণ অধিকতর বুদ্ধি, শক্তি ও সম্পদশালী ব্যক্তিকে তাঁদের নেতা রূপে নির্বাচন করে। এই নেতার দ্বারাই রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। রাজতন্ত্রের সঙ্গে অঞ্চল রক্ষার জন্য যুদ্ধনেতা ও আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভা গঠিত হয়। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা রাজ্য বিস্তৃত হওয়ায় শাসনের সুধির জন্য উদ্ভব হয় সামন্ততন্ত্রের। সেখানে রাজা বসবাস করতেন শহরে আর সামন্তগণ পল্লী অঞ্চলে রাজদৃষ্টির অন্তরালে থেকেও নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুশিমত গ্রাম শাসন করতেন। এই শাসক শ্রেণী অর্থনৈতিক কারণে সাধারণ পল্লীবাসীর তুলনায় যেমন বেশি সুখ সুবিধা ভোগ করত তেমনি উন্নত কৃষ্টির ধারক বলেও বিবেচিত হত। এর পরে শহরে আবার আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়। উৎপাদনের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই, কেবল পণ্য বিনিময়-ই ছিল এই শ্রেণীর প্রধান কাজ। এরা হলো, পরিশ্রমভোগী, শ্রমিকের উৎপন্ন শস্য সস্তায় নিয়ে মুনাফা অর্জনকারী। শ্রমিককে তাঁর শ্রম মূল্য ফাঁকি দেয়। তাদের মুনাফাই শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম, যার দর সে পায় না।[৫] ধাতব মুদ্রা ছিল এই সম্প্রদায়ের বণিকের পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম। এই মধ্যস্বত্ব ভোগী বণিক সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হওয়ায় সামন্তগণকে তাঁরা আর মেনে

[৫] গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা-১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

নিতে চাইল না। ফলে, দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বে সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে এবং অভিজাত বুর্জোয়া পুঁজিদার বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই অভিজাত পুঁজিদার বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থের সাহায্যে কেবল যে উৎপাদক ও উৎপাদনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাই-ই নয়, তাঁরা জমিকে পণ্য দ্রব্যে পরিণত করে ও বন্ধকি রীতির প্রচলন করে। এর ফলে আর্থিক সংকটে পড়ে অথবা আপাত অর্থ লাভের জন্য বহুলোক জমির ব্যক্তিগত মালিকানা হারিয়ে ভূমিহীন হতে থাকে। ভূমিহীনরা জীবিকার্জনের জন্য নানারূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করতে থাকে। এই কর্মের ভিত্তিতে সমাজে কতগুলি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এমনিভাবে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিক তারাই অধিক সুখ সুবিধার অধিকারী হতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সুখ সুবিধা ভোগ করার বাসনা বর্তমান, তাই অর্থনৈতিক কারণে সমাজে শ্রেণী সংঘাত ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠে। এই সংঘাত প্রশমণের জন্য বহুবিধ আইনের সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই আইনের ধারক রূপে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। এই রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় শ্রেণী সংঘাত না ঘোঁচানোর পেছনের কারণ হল, "আইন প্রণয়নে অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবল অভিজাত বণিক সম্প্রদায়ের প্রভাব বহুলাংশে কার্যকরী হওয়া।"[৬] কাজেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূলত অভিজাতদের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনিভাবে আদিম যুগের স্বাভাবিক গণতন্ত্র নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎকট অভিজাততন্ত্রে রূপান্তরিত হল। এই সমাজ ব্যবস্থায় শক্তিশালী সংখ্যালঘু শ্রেণী স্বার্থপরতা, লোভ, পরস্বাপহরন স্পৃহা, প্রবঞ্চনা, বল প্রয়োগ ও দেশদ্রোহিতার দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীকে নানা পর্যায়ে ও নানাভাবে নির্যাতিত ও শোষিত করে নিজের শ্রীবৃদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে।

সাম্য ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও বৈষম্যের আলোচনা হতে বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক ও সমান অধিকার ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে রাজার অধিকার কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং সামন্তের উপকেন্দ্রে গিয়ে সংহত হয়েছিল। অর্থনৈতিক অধিকারের এই সংকোচন ও বৈষম্যকে ভিত্তি করে এবং রাজা, রাজ-অমাত্যদের আবাসস্থলকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠেছিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তাহল, কৃষ্টির আভিজাত্য, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক অধিকারকে অধিক পরিমাণে আত্মস্যাৎ করে সমাজের মধ্যে যেমন নগর কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনি ধর্মান্ধতা ও ধর্ম শিহরণজাত (Religious Experience and Religious Thrill) তোষণী বিদ্যার (মন্ত্র-তন্ত্র) উপর বিশেষ অধিকার দাবী করে বিদ্যাভিজাত (অভিজাত-ব্রাহ্মণ) শ্রেণীরও উদ্ভব হয়েছিল। এই শ্রেণীই পুরোহিততন্ত্রের ধারক। দেবতা, অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে পুরোহিত সম্প্রদায়ের চিন্তাশীলতা হতেই প্রণালীবদ্ধ ধর্মীয়রীতি ও উপাখ্যানাদির সৃষ্টি সম্ভব হয়। যাহোক, উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর শক্তি নিহিত ছিল ভূমি-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে, নিজেদের এবং অনুগতজনের দৈহিক ক্ষমতার মধ্যে, শৌর্যবীর্যের মধ্যে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায়ের শক্তি নিহিত ছিল দৈব-বিদ্যার মধ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে এবং রাজার উপরেও প্রভুত্বের মধ্যে। এই বিদ্যার আভিজাত্যকে সংক্ষেপে 'ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য' বলা যেতে পারে। ফলস্বরূপ পৃথক ধারায় পুরোহিত বংশ আভিজাত্যের একাধিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সুতরাং অর্থ-শক্তি এবং বিদ্যা-শক্তিকে সভ্যতার ক্রমবিকাশে লোক-অলোক বিভাগের ভিত্তি বা অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

অন্যদিকে, আদিম স্তর হতে শুরু করে নাগরিক সভ্যতা পর্যন্ত যে কোন একটি মানব গোষ্ঠীকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, আহরণ ও শিকার যুগে এবং পশুপালন যুগে মানব গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল যেমন অল্প তেমনি জীবন ছিল যাযাবর। গোষ্ঠীর মধ্যে সবার অধিকার প্রায় সমান ছিল না। অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে বা বন্য পশুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অথবা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যায়, যে বা যারা অধিক দৈহিক বা মানসিক শক্তি দেখাতে পেরেছিল, সে বা তারাই গোষ্ঠীর অন্য ব্যক্তির কাছে নায়কের মর্যাদা লাভ করেছিল। এই নায়ক হল কালক্রমে গোষ্ঠীপতি এবং আরও পরে রাজা হওয়ার সূচনা পর্ব। কৃষি আবিষ্কৃত হবার পরে নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ হতে শস্য বা আহার্য সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় যেমন মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটেছিল, তেমনি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ও পরিবার চেতনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণ অধিক পরিমাণে ভূমি অধিকার করায় সচেষ্ট হয়েছিল এবং মূল উপনিবেশ হতে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের দূর ভূমিতে কৃষিকার্য ও বাসস্থান নির্মাণ করে এবং অন্যদিকে অপরের শ্রমলব্ধ শস্যের উপর নির্ভর করে গোষ্ঠীপতি বা রাজা ও তাঁর সহচরদিগের মূল উপনিবেশে সুদৃঢ় অট্টালিকায় ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করতে থাকে এবং মূল উপনিবেশটিকে সুদৃশ্য করে তোলার জন্য প্রাচীর, রাস্তাঘাট, উপবন, দেবগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ শুরু করে। এ দুটি প্রবৃত্তির প্রেরণায় ক্রমে জনগোষ্ঠী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।[৭]

মূল উপনিবেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সকল পরিবার দূরবর্তী ভূমিতে কৃষিকার্য করতে লাগল, তারা গ্রাম্য বলেই পরিগণিত হল। আর যারা রাজার বাসস্থানকে কেন্দ্র করে রাজ-ঐশ্বর্যের অংশভাগী হয়ে বাস করতে থাকল, তারা নাগরিক আখ্যা লাভ করেছিল। বলা যেতে পারে, কেন্দ্রাতিগ প্রবৃত্তি হতে গ্রামের এবং কেন্দ্রানুগ প্রবৃত্তি হতে নগরের সৃষ্টি হয়েছিল। কেন্দ্রাতিগ প্রবৃত্তি বর্ধিত জনসংখ্যার একাংশকে দূরে অসংস্কৃত ভূমিতে বসবাস করতে বাধ্য করেছিল

---

[৬] পূর্বোক্ত, গৌরী শংকর ভট্টাচার্য, পৃ. ২০

[৭] নিহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

এবং কেন্দ্রানুগ প্রবৃত্তি মূল উপনিবেশের চারপাশে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সুগম ও সুখকর পরিবেশে বাসস্থান নির্মাণে শক্তিমান অংশকে আকৃষ্ট করেছিল। এভাবে জনপদে গ্রাম্য ও নাগরিক এই দুই শ্রেণীতে জনগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নগরের উৎপত্তি ঘটে। সমাজ বিজ্ঞানের 'Society' গ্রন্থের আলোচনায়ও একই রকম তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, "তখনই নগরের উৎপত্তি হয় যখন কোন সমাজ বা সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী জীবনধারণের উপযোগী ধন সম্পদ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধন সম্পদের অধিকারী হয়। প্রাচীন যুগে এই ধন সম্পদ অর্জিত হত প্রধানত মানুষের উপর মানুষের আধিপত্যের মাধ্যমে। নাগরিক জীবনের মারাত্মক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল দাস প্রথা, অধ্যাত্মমূলক শ্রম দান এবং বিজেতা বা শাসক শ্রেণী দ্বারা কর আদায়ের উপরে।"[৮] তাই বলা যায়, ধন সম্পদই হল নগরোৎপত্তির প্রধান কারণ এবং উদ্বৃত্ত ধন সম্পদ বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ শোষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সঞ্চিত হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এক শ্রেণীর শ্রমলব্ধ ধনের একটি মোটা অংশ আর এক বিশেষ শ্রেণীর বিনাশ্রমে ভোগ করার অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত (ধনোৎপাদক কৃষক শ্রেণীকে ঐ বিশেষ শ্রেণীর বাসস্থান হতে দূরবর্তী স্থানে বসবাস করতে বাধ্য না করা পর্যন্ত) নগরোৎপত্তি সম্ভব হয়নি। পরবর্তী শিল্প বাণিজ্যের যুগে শিল্প কারখানাকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠলেও প্রথমে নগরের গোড়াপত্তন হয়েছিল রাজার রাজপ্রাসাদ বা রাজধানীকে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য, কৃষকদের শস্য সম্পদ হতে রাজার এবং রাজানুচরদের ভোগের জন্য একটি মোটা অংশ কর হিসাবে আদায় করার ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত জনপদের মধ্যে উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণকারী 'গ্রাম্য' এবং উৎপন্ন দ্রব্য ভোগকারী 'নাগরিক' এই দুই বিভাগ সৃষ্টি হতে পারেনি। যে মূল কারণে নগরের উৎপত্তি ঘটেছে, সেই মূল কারণের মধ্যেই যেমন নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে ছিল, তেমনি কারণেই জনগণের একাংশের মধ্যে গ্রাম্য জীবনের বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। এ ব্যাপারে সমাজ বিজ্ঞানীদের তুলনামূলক আলোচনায় গ্রাম্য জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যেতে পারে-

ক) গ্রাম্য জীবনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল গ্রামের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা। নগর থেকে দূরে কতগুলি পরিবার কৃষিক্ষেত্র বা বন-প্রদেশ পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করে। এইসব বসতি যে শুধু নগর থেকে দূরে তাই নয়, অন্য বসতি থেকেও নদী নালার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। অধিকাংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য গ্রাম সদস্যকে পরিবার পরিমণ্ডলের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। ফলে, সমবেত জনশ্রম ও পারস্পারিক সহযোগিতা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সম্পদের বন্ধনও বিশেষভাবে দৃঢ় করে দেয় এবং গৃহ নির্মাণস্থলের ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্য স্বভাবত পারিবারিক ঐক্য জোরদার হয়ে থাকে। বাইরের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ কম থাকায় গ্রাম্যদের পারিবারিক রীতি-নীতি বা প্রথা দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে থাকে। পারিবারিক আচার বিচারকে অভ্রান্ত এবং আদর্শ ব্যবস্থা বলে মনে করার গোঁড়ামি দেখা দেয় ও চিরাচরিত প্রথা তাঁদের উপর প্রভুত্ব করতে থাকে।

খ) গ্রামের মানুষের মধ্যে সামষ্টিক চেতনা প্রবলভাবে কাজ করে। মানুষের রীতিনীতি, চালচলন, ভাষা সাহিত্য, সংগীত, শিল্প আনন্দ প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম, ভাব-ভাবনা ও মানসিক গঠন প্রভৃতি অবলম্বনে জীবন ধারার প্রকাশ তার মধ্যেই সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

নগর সীমানায় বাস করা সত্ত্বেও নগরের প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এবং শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে এক নয় অর্থাৎ নগরেও তলানী শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। আবার গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ নাগরিকের তুলনায় অসংস্কৃত বা অশিক্ষিত নয়, অর্থনৈতিক মর্যাদার দিক দিয়েও একই শ্রেণীর অন্তর্গত নয়, সেখানেও অধিকতর ক্ষমতাশালীরা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাশালীদের কোনঠাসা করে গ্রামের তলানিতে পরিণত করে। যেখানেই সমাজ অবাধে বিবর্তিত হতে পেরেছে, সেখানেই একই নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রম বিভাগ তথা শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতে এই ক্রমবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, অর্থক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের অবস্থান থেকে সরতে সরতে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী কেন্দ্র হতে পরিধিতে পৌঁছেছে এবং অর্থনৈতিক অধিকারহীন ও সংস্কৃতিবিহীন জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও সমাজ অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে পরাজিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে ঠিকই তবে তাঁরা সমাজের এক কোণে শূদ্র জীবনযাপন করার অধিকার ছাড়া তাঁদেরকে আর কোন অধিকারই দেয়া হয়নি। সেখানে সমাজের তলদেশে যা পাওয়া যায় তাহলো, সমাজের নিজেরই তলানি শ্রেণী এবং ঐ বিজিত অসংস্কৃত অধিকার বিহীন জনগোষ্ঠী। এই দুই শ্রেণীকে নিয়ে লোকস্তর গঠিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রাম্য হলেই ব্যক্তি যেমন লোকস্তরের অন্তর্ভুক্ত হয় না, তেমনি নাগরিক মাত্রেই শিষ্ট নয়। গ্রামের জনবিন্যাসে যেমন স্তরভেদ রয়েছে, তেমনি নাগরিক জীবনেও তা বর্তমান। গ্রামের শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন শ্রেণী গ্রামে বাস করলেও এই শ্রেণী লোকস্তরের লোক নয়। শহরের অর্থ সঙ্গতিবিহীন ও অশিক্ষিত মুটে-মজুর শ্রেণী নগরের বস্তিতে বা ফুটপাতে বাস করলেও তাঁদেরকে আমরা লোকস্তরের লোক বলতে পারি। গ্রাম্যদের মধ্যে যারা অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাবে সংস্কৃতিতে অনগ্রসর হয়ে লোকশ্রেণীর অন্তর্গত, নাগরিকদের মধ্যেও ঐ একই কারণে যারা আদিম

---

[৮] Maciver A.C.H., Society, London, 1955, Page 314

Dhaka University Institutional Repository

মানসিকতার সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে পারেনি, তারাও লোকস্তরের অন্তর্গত। ফলে তারা কেবল গ্রামেই নয়, শহরেও বর্তমান। আদিম স্তরের লোক মানসিকতা ও আচার-বিচার, বিবর্তনের ফলে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে লোক-অলোক সকল মানুষের মানসিকতা ও আচার-বিচাররের মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে প্রবাহিত হলেও, সংস্কৃতির মানের তারতম্যের ভিত্তিতেই কোন ব্যক্তিকে 'লোক' শ্রেণীর এবং কোন ব্যক্তিকে 'অলোক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। জীবনে Folk Ways এর প্রাধান্য কতখানি থাকলে ব্যক্তিকে 'লোক' পংক্তিতে স্থান দেয়া যেতে পারে এবং কত কম হলে তাকে 'অলোক' বা সু-সংস্কৃতের পর্যায় বলে গণ্য হবে তার পরিমাণ পরিমাপক বা মূল্য নির্ধারক কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই বলে মোটামুটিভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, অর্থনৈতিক দুরবস্থাজনিত সাংস্কৃতিক অনগ্রসারতার উপর ভিত্তি করেই লোক-অলোক পার্থক্য নির্ণিত হয়ে থাকে। ধরে নেয়া যেতে পারে, লোক শব্দটি গ্রাম ও শহর দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহার যোগ্য।

যেমন ভারতীয় সমাজে : সমাজের শাস রূপে যদি আর্য জনগোষ্ঠীকে ধরি তাহলে দেখা যাবে যে, অর্থনৈতিক শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ফলে আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিন্যাস ঘটেছে, তাতে কোন শ্রেণী অর্থনৈতিক সামর্থ ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে সমাজের উপরিতল বা উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করেছে এবং কোন শ্রেণী ঐ সামর্থ্য ও শিক্ষালাভের সুযোগের অভাবে নিম্ন শ্রেণীরূপে সমাজের তলায় পড়ে আছে। এছাড়াও সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে নানা বিজিত আদিম জাতি তাঁদের আদিম আচার-বিচার অনুষ্ঠান নিয়ে বসবাস করছে। ঐ সকল আদিবাসী বা আগন্তুক জাতি নিজেদের আচার-বিচার, পূজা-পার্বণ এবং আমোদ-অনুষ্ঠান সহকারে আজও বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করছে। ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও তাঁরা ভারতীয় সমাজদেহের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হতে পারেনি। অর্থনৈতিক অধিকার বলতে যা বুঝায় তা, এদের মধ্যে নেই বলেই এরা এমন সব বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, যার দ্বারা দুই বেলা দুই মুঠো খাবার যোগান তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে সুশিক্ষার সুযোগ থেকেও তাঁদেরকে বঞ্চিত হতে হয়। এদের মধ্যে কোন কোন জাতি হয়ত আর্য সংস্কৃতি দ্বারা সমীকৃত হওয়ায়, গ্রাম্য সমাজদেহের অঙ্গীভূত হয়েও অর্থনৈতিক শ্রেণীর অন্যতম শ্রেণী হয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্বের যাঁতাকলে পিষ্ট। যার দরুণ, সুযোগ সুবিধার অভাবে শিক্ষা-দীক্ষা হতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাঁরা আদিম মন, আদিম প্রথা, আদিম আমোদানুষ্ঠান নিয়ে জীবনযাপন করছে এবং 'লোক' পর্যায়েই রয়ে গেছে।[৯]

২.২. লোকনাট্য ও অভিনয় উপাদান

এই 'লোক' দ্বারা অভিনীত 'নাট্য'ই হলো, আমাদের লোকনাট্য। লোকনাট্য কতটা প্রাচীন তা নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে ভরতমুণি নাটককে, 'লোক বৃত্তানুকরণ' বলেছেন। নানাভাব ও অবস্থাযুক্ত লোকনাটকের কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ভরতমুণি কথিত দশ রূপকের মধ্যে নাটক, ডিম, ব্যায়েগ প্রভৃতির মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর বিখ্যাত লোকদের কাহিনী উপস্থাপিত হয়, কিন্তু প্রকরণ, প্রহসন প্রভৃতি রূপক -এ সাধারণ লোকই স্থান পেয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের যে আলোচনা রয়েছে, তা সুনির্দিষ্ট বিধি নিয়ন্ত্রিত, সুগঠিত ও সুমার্জিত। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভরত নাট্যশাস্ত্রকে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের নিকটবর্তী কালের রচনা বলে মনে করেন।[১০] ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্র রচনারও বহু পূর্বে যে অভিনয় ধারার প্রচলন ছিল, তাহল 'লোকনাট্য'।[১১] অর্থাৎ লোকনাট্যে লোক মানুষ হিসেবে যেমন সাধারণ গ্রাম্য শ্রেণীর মানুষের জীবন উঠে এসেছে, তেমনিভাবে উঠে এসেছে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের কথা।

অনেকে যাত্রাকে খাঁটি লোকনাট্য বলে মনে করেন। যাত্রা বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে প্রাচীন যাত্রার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। তারও পূর্বে কৃষ্ণলীলার অভিনয়ের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা-ই আমাদের প্রাচীন যাত্রার নিদর্শন। এই ধারা, সখের যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্যকে অনেকখানি অক্ষুণ্ন রেখেছিল। ষোড়শ শতককেই তাই যাত্রার উদ্ভবকাল বলে গণ্য করা হয়।[১২] শিশুরাম, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, মধুসূদন কান প্রভৃতি ঐ প্রাচীন যাত্রার অনেকখানি ধারক ও বাহক। যাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গান, তাই যাত্রাকে যাত্রাগানও বলা হয়। যাত্রায় সঙ্গীতের বাহুল্য থাকলেও অবিরাম সঙ্গীতের স্রোতধারা সেখানে লক্ষণীয় ছিল না। যাত্রায় দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য এক ধরনের সঙ্গীত থাকে। কোনো দৃশ্যের শুরুতে বা দৃশ্যের শেষে বালকদের কণ্ঠে সমবেত এই সঙ্গীত গীত হয়ে থাকে। একে

---

[৯] পূর্বোক্ত, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃ. ২৮

[১০] ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভরত নাট্যশাস্ত্র-১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৬ (অবতরণিকা)

[১১] ড. অজিত কুমার ঘোষ, নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৬৩

[১২] ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, কলিকাতা, ১৩৯১, পৃ. ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রার 'জুড়িগান' বলা হয়ে থাকে। 'অষ্টকগানে'ও এই জুড়িগান বর্তমান। সেখানে কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েরা রাধা-কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আসরে জুড়ি গান গেয়ে নৃত্য পরিবেশনার সাথে অভিনয় করে থাকে। 'অষ্টকগানে'র এই কিশোর-কিশোরীদেরকেও 'বালক' সম্বোধন করা হয়ে থাকে। শুধু গান নয়, বাদ্যও যাত্রাগানের আনুষাঙ্গিক উপাদান। প্রাচীনতম যাত্রায় সংলাপের প্রাধান্য ছিল না, পরে ধীরে ধীরে তারমধ্যে সংলাপ বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। লোকশিল্পের অঙ্গ হিসেবে, এই যাত্রার মধ্যে বক্তব্যের সারল্য ও উপস্থাপনের মধ্যে স্থূলতা, তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জনরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে, যাত্রার পালাকারগণ প্রাচীন যাত্রার আদর্শ থেকে সরে এসেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। যেমন- যাত্রার বক্তৃতাধর্মী দীর্ঘ সংলাপ-উচ্চারণে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কষ্ট হওয়ায় সংলাপের সংক্ষিপ্ততা, কায়িক অভিনয়ে স্বাভাবিকতার প্রাধান্য লাভ, নিরন্তর আবৃত্তির সুরেলা ভঙ্গির বদলে কথা বলার সহজ পদ্ধতির গ্রহণ, বিবেকের গানের বাহুল্য ও সখীদের কোরাস নাচ-গানের হ্রাস, অশ্লীল ভাঁড়ামীর স্থলে হাস্যরসের প্রাধান্য এবং সাজ-সজ্জারও সরলীকরণ লক্ষণীয় ছিল। জানা যায়, প্রাচীন যাত্রার ভাঁড়ামী থেকে যাত্রাকে মুক্ত করে তারমধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ, গোপাল ভাড়, মতিলাল রায়, লোকনাথ দাস প্রমুখ পালাকার, পরিচালক ও যাত্রা অভিনেতা। এর বিষয় হিসেবে নানা পৌরাণিক আখ্যান, মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত নানা কাহিনী ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপজীব্য করে যাত্রাপালা রচিত হতে থাকে। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তাহলো; বাংলার সামগ্রিক লোকনাট্যে তেমন বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না, বরং অমিলের তুলনায় মিলটাই বেশী পাওয়া যায়। যদিও লোকনাট্যের বিষয় ও আঙ্গিক যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। কোন একটি স্থির আদর্শকে বরাবর অক্ষুণ্ন রাখা লোকনাট্যের ধর্ম নয়। লোকনাট্যের মধ্যে বাদ্য যেমন সাধারণ বিষয় (এখানে বাদ্যকে সাধারণ বিষয় বলার কারণ হল; লোকনাট্যের একমাত্র পুথিপাঠ ছাড়া আর প্রায় সকল প্রকার লোকনাট্যের মধ্যে কম-বেশি বাদ্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়), ঠিক তেমনি লোকনাট্যে নৃত্যও একটি অন্যতম বিশেষ উপাদান। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাঁদের আনন্দ-বেদনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনাকে, ইঙ্গিত-ইশারা বা অস্ফুট ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে এবং তারপর তারা আশ্রয় করেছে নৃত্যকে। অঙ্গবিক্ষেপ ও নৃত্যের পরই অস্ফুট ধ্বনি গানে পরিণতি লাভ করে, আর তখন তার সঙ্গে সহযোগিতা করে বাদ্য। স্বামী যুদ্ধে গমন করলে, স্ত্রী শত্রু হননের নানারকম অনুকরণমূলক অভিনয়ে মেতে উঠত। নৃত্যের মধ্য দিয়ে আদিম জাতি আকাশ থেকে বৃষ্টিকে আবাহন করত। মোট কথা মনের নানা ভাব-প্রকাশের বাহন ছিল এই নৃত্য। কোনো একটি ভাব বা ঘটনাকে নৃত্যের মধ্য দিয়ে রূপ দেবার এই প্রাচীন প্রথা থেকেই ধীরে ধীরে নাটকের জন্ম। অবশ্য নৃত্যের সঙ্গে বাদ্যও ছিল এবং পরে তাতে সঙ্গীতও যুক্ত হয়েছে। এই নৃত্য, গীত ও বাদ্যই সম্মিলিতভাবে নাট্য সৃষ্টির পথ কেটে দিয়েছে। আদিম মানুষ শিকার করত ও লড়াই করত, তারপর আরও পরে কৃষিকর্মও শিখেছিল। তারা তুক্‌তাক্ ও নানা যাদুকর্মে বিশ্বাস করত। তাঁদের জীবনেও এই সমস্ত বিষয় সংলাপহীন মূকাভিনয়ে এবং কৃত্যাভিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অনুমান করে নেয়া চলে যে, পরে ঐ অভিনয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যবহুলতার স্থানে সংলাপযুক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রাধান্য পায় এবং নৃত্যের দিকটি সংক্ষিপ্ত হয়ে অভিনয়ের দিকটি গুরুত্ব পায়। তাই লোকসঙ্গীত ও লোক-নৃত্যই লোকনাট্যের গোঁড়ার কথা।

লোকনাট্যের আসর সাধারণত দুই রকমের-স্থির ও চলমান। স্থির আসর হল; কোন গাছতলা বা খোলা জায়গা কিংবা কোনো দেবমন্দির বা নাটমন্দির। আর চলমান আসর দেখা যায় নানা শোভাযাত্রায় নৃত্য-গীতাভিনয়ে। নৃত্যগীত ও বাদ্যের এই লোকনাট্যে কোনো একটি ঘটনাকে নৃত্যের মধ্য দিয়ে রূপ দিতে গিয়ে জন্ম নিয়েছে চরিত্র। সঙ্গীতের স্থানে অর্থময় আবৃত্তি, একাধিক চরিত্রের আবির্ভাব, উক্তি-প্রত্যুক্তির প্রচলন এবং ঘটনার কাহিনীতে উত্তরণ -এভাবে বিবর্তনের পথে জন্ম নিয়েছে লোকনাট্য। লোকনাট্যের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যাকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে-

ক. গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যেই লোকনাট্যের উদ্ভব হয় এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছেই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তা পরিবেশিত হয়। কোনো জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত কোনো কাহিনীকে লোকনাট্যের বিষয় হিসেবে আশ্রয় করা হয়। কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানব-সম্প্রদায়ের বীরত্ব ও কীর্তিকথাকে সাধারণত ঐ কাহিনীতে যুক্ত করা হয়। কালের বিবর্তনে উন্নত ও সভ্য সমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রভাব ঐ কাহিনীতে পড়া কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু এতে আদিম মানব-সম্প্রদায়ের চিন্তা, প্রথা ও সংস্কারই প্রাধান্য লাভ করে এবং অঞ্চল বিশেষের প্রাকৃতিক চিত্র ও সেখানকার মানবগোষ্ঠীর জীবনধারা ও প্রাণস্পন্দন ধরা পড়ে। কালপরম্পরাগত কাহিনীকে অঞ্চল বিশেষের মানুষ ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে, এর বৃত্ত বা কাহিনী গড়ে ওঠে।

খ. লোকনাট্যের মধ্যে গীত, নৃত্য ও বাদ্য এই তিনের সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। তবে মূলত গীতিপ্রধান মৌখিক রচনা বলে এতে, গীতিধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। এর যে বাদ্য, তারমধ্যে চর্ম বাদ্যই প্রধান। তবে বাঁশি ও শিঙাও থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. লোকনাট্য আয়তনের দিক থেকে দীর্ঘ নয়। মুখে মুখে লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এর প্রচার। মৌখিক প্রচারের ফলে একই বিষয়ের বহু পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এটি একটি পরিবর্তনশীল শিল্প, এর আকার ও আয়তন ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়।

ঘ. লোকনাট্য সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকই লোকনাট্যের অভিনয় দেখে, অভিনয় করে এবং নাট্য রচনা করে থাকে। লোকায়ত স্তরের সমস্ত মানুষ-দর্শক ও শিল্পীগোষ্ঠী এর সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ঙ. লোকনাট্যের বিষয়বস্তু সাধারণ লোকায়ত স্তরের মানব জীবনাশ্রয়ী হয়ে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যে, উচ্চকোটির হিন্দুদের পৌরাণিক আদর্শের প্রভাবে পৌরাণিক বিষয়কে আশ্রয় করে লোকনাট্য রচিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, পৌরাণিক চরিত্র ও তাঁদের নিয়ে রচিত কাহিনী সম্পর্কে আমাদের মনে একটা অবিচল সংস্কার কাজ করে। কিন্তু লোকনাট্যের প্রধান উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। তাই এখানে ধর্মমূলক বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করে।

চ. লোকনাট্যে সংলাপ থাকে। এর ভাষায় আঞ্চলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। অঞ্চল বিশেষের শব্দ ও বাক্‌রীতি এর প্রাণ।

ছ. খোলা আসরে লোকনাট্যের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। এর অভিনয়ে অনেক ক্ষেত্রে মুখোশের ব্যবহারও দেখা যায়।

জ. লোকনাট্যের কাহিনীর ক্রমবিকাশ, ঘটনা-বিন্যাস, কাহিনীর বিস্তার অনেকটা সরল রৈখিক। পাশ্চাত্য নাট্যের মত দ্বন্দ্ব মুখরতা এর মধ্যে একরকম নেই বললেই চলে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের বিচারে বলা যায় যে, পৃথিবীর অপরাপর দেশের মতো আমাদের বাংলাতেও নৃত্যকলার মধ্যে লোকনাট্যের আদিম রূপের ইঙ্গিত মিলে। বাংলার লোকসমাজে 'গাজনের নাচ', অনুচরসহ 'শিব-গৌরীর নাচ', 'কালিনাচ', 'কীর্তন', 'কথকতা', 'পাঁচালী গান', 'কবিগান', 'ধামালী', 'ঝুমুর', 'আলকাপ গান', 'বিষহরির পালা', 'গম্ভীরা গান', 'রঙ পাঁচালী', 'ভাসান গান', 'সোনাবিবির পালা' প্রভৃতি রীতির অভিনয়ে লোকনাট্যের বিভিন্ন অভিনয় উপাদান বর্তমান। আবার, কথোপকথন আলকাপ, ডুয়েট আলকাপ ও খ্যামটা আলকাপ, এই তিন রকম আলকাপেই বিভিন্ন চরিত্রের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁদের সংলাপে, গানে ও বোল কাটাকাটিতে লোকনাট্যের বিভিন্ন অভিনয় উপাদানের রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।[১৩] পালাগানগুলির মধ্যে সাধারণত একটি কাহিনী থাকে। তাছাড়া বাদ্যযন্ত্র ও সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে আসরে নাচ-গানের সাহায্যে ঐ কাহিনী পরিবেশিত হয়। আমাদের দেশে সং এরও একটি ভূমিকা রয়েছে। এ দেশের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সং বের হত। পথ ঘোরানো সং ও আসর ঘোরানো সং -এই দুই রূপ ছিল এর। মানুষ এবং মাটির মূর্তি, দুই-ই সং এর বাহন। ছড়া ও নাচ-গানের মধ্য দিয়ে লোক সমাজের অভাব অভিযোগ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি তথ্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়াও পুতুলনাচ বাংলার লোকনাট্যের অন্তর্গত একটি অন্যতম নাট্য উপাদান। দণ্ড-পুতুল, হস্ত-পুতুল ও সূত্র-পুতুল-এই তিন রকমের পুতুল নাচে পুতুলগুলি সহজভাবে কৌশলে নাড়াচাড়া করে নাচানো হয় এবং নেপথ্য থেকে কথক ও গায়কের সংলাপ ও গান পরিবেশনার দ্বারা চমৎকার অভিনয় জগৎ সৃষ্টি করে থাকে।

ভারতীয় নাটকের ন্যায় গ্রীক নাটকও লোক উৎসব থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। ডায়ানোসিস্ ছিলেন কৃষক দেবতা, অর্থাৎ সর্বসাধারণের দেবতা। তাঁর পূজার সঙ্গে শস্যোৎপাদন কামনা মিশ্রিত হয়েছিল। ডায়োনিসাসের উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার দর্শক সিটি ডায়োনিসাসে এসে সমবেত হত। ডায়োনিসাস দেবতাকে শোভাযাত্রা করে সিটি ডায়োনিসিয়ায় নিয়ে যাওয়া হতো, সঙ্গে চলত নাচ, গান আমোদ-প্রমোদ। অর্কেস্ট্রা অথবা অভিনয় মঞ্চের নিকটে ডায়োনিসাস মূর্তি স্থাপন করা হতো। দুদিন ধরে "ডিথাইর‍্যাম্ব" অনুষ্ঠান চলত। একদিন কমেডি এবং তিন দিন ধরে ট্রাজেডি নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হতো। Goat Song অথবা ছাগ-সঙ্গীত থেকে যেমন ট্রাজেডির উদ্ভব, তেমনি Phallic Song অথবা লিঙ্গ-সঙ্গীত থেকে কমেডির উৎপত্তি। উদ্দাম আমোদ-প্রমোদ ও অবাধ যৌন উল্লাস 'কমাস' উৎসবে দেখা যেত। উৎসবে মত্ত লোকেরা একটি বিরাটাকার লিঙ্গ-মূর্তি বহন করে নিয়ে যেত এবং নিজেরা ঘোড়া, ছাগল, পাখী প্রভৃতির ছদ্মবেশ ধারন করে নৃত্যগীত ও অর্থসূচক ভাবভঙ্গি দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলত। এই কমিক উৎসব থেকে ট্রাজেডি ও কমেডির উদ্ভব হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ট্রাজেডি ও কমেডি প্রাথমিক স্তরে নৃত্যগীত বহুল লোকনাট্য

---

[১৩] পূর্বোক্ত, ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

রূপেই ছিল। কালক্রমে নাটকের বিধিনিষেধগুলি কঠোরভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং এর ভাষা ও সঙ্গীত সুমার্জিত ও সুউন্নত রূপ ধারন করে। যার ফলে গ্রীকে সেখানকার লোকনাট্যকে ক্লাসিক-নাট্যের উৎপত্তি রূপে গণ্য করা হয়।[১৪]

চীনের নাটক নিয়ে আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, ওসব দেশেও ভারত ও গ্রীসের ন্যায় নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল লৌকিক ধর্মোৎসব থেকে। এর লৌকিক অভিনয় ধারাই সুসংস্কৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে ক্লাসিক নাটকে পরিণত হয়েছিল। তবে ক্লাসিক নাটকের পাশে একটি লৌকিক নাট্যধারাও প্রচলিত ছিল। যেমন- চীনের ক্লাসিক থিয়েটারের পাশে লৌকিক অভিনয় ধারা 'ইয়াংকো', থিয়েটারের মধ্যে এখনও বর্তমান রয়েছে। 'ইয়াংকো' হল একপ্রকার সঙ্গীত মিশ্রিত নৃত্য। তরুণ তরুণীরা মাঠে কাজ করার সময় 'ইয়াংকো' নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে থাকে। পুরুষ ও নারী নর্তক দল মুখোমুখি দুই সারিতে দাঁড়ায়। গানগুলি সাধারণত নারী ও পুরুষদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের আকারে গীত হয়। নৃত্যগীত হয়, নৃত্যগীতের সঙ্গে ঢোল, ঘন্টা, বেহালা, বাঁশী প্রভৃতি বাজতে থাকে।[১৫]

জাপানী নাটকেরও উদ্ভব হয়েছিল, ধর্মীয় সঙ্গীত মিশ্রিত নৃত্য থেকে। কালক্রমে জাপানী নাটক কঠোর নিয়ম নিয়ন্ত্রিত ক্লাসিক 'নো' এবং লৌকিক নাটক 'কাবুকি'তে পরিণত হয়। 'নো' নাটকে ধর্মীয় উপাদান এবং 'কাবুকি' নাটকে আদিরসাত্মক উপাদানই প্রাধান্য পেয়েছে। এ বিষয়ে ড. অজিতকুমার ঘোষ এর "বাংলার লোকনাট্য" প্রবন্ধে আরও বিস্তারিত জানা যায়, "ষোড়শ শতাব্দীতে 'কাবু' নামে একটি চীনা শব্দ প্রচলিত ছিল। তার অর্থ হল 'কা'-সঙ্গীত, 'বু'-নৃত্য, জাপানীরা এর সঙ্গে 'সু' অর্থাৎ 'করা', এই ক্রিয়াপদ যুক্ত করল। 'কাবুসু'র অর্থ হল, 'সঙ্গীত' ও 'নৃত্য' করা। আরও একটি শব্দ প্রচলিত ছিল, তার নাম হল 'কাবুকু'। এর অর্থ হল, কৌতুক-তামাসা করা। বর্তমানে 'কাবুকি' বলতে সঙ্গীত-নৃত্য বিষয়ের নৈপুণ্যতাকে বুঝিয়ে থাকে।[১৬]

বিভিন্ন দেশের নাটকের উদ্ভব সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, নাটকের উদ্ভব সর্বত্র হয়েছে ধর্মীয় লোক উৎসব থেকে। নাটক প্রাথমিক স্তরে নৃত্যগীত বহুল লোকনাট্য রূপে বর্তমান ছিল। কালক্রমে নৃত্যগীতের স্থলে সংলাপই প্রাধান্য লাভ করে এবং নাটকও পরিবর্তনশীল, শিথিলবদ্ধ লৌকিক রূপ থেকে দৃঢ়বদ্ধ, অপরিবর্তনীয় ক্লাসিক রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু ক্লাসিক নাটকের প্রবর্তন সত্ত্বেও তার পাশাপাশি সব দেশে একটি লোকনাট্যের ধারা প্রচলিত রয়েছে। ক্লাসিক নাটক বিদগ্ধ ও উচ্চ শ্রেণীর দর্শকের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তার লেখ্যরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু জনপ্রিয় লোকনাট্য সর্ব সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত, তবে তার কোন লেখ্যরূপ থাকে না বলে তা স্থায়িত্ব লাভ করে না। ড. অজিতকুমার ঘোষ তাঁর "নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ" গ্রন্থের 'বাংলার লোকনাট্য' প্রবন্ধে লোকনাট্যের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন, যেগুলি আলোচনা করা যেতে পারে-

১) লোকনাট্য সাধারণ লোকেদের দ্বারা সাধারণ লোকদের কাছেই পরিবেশিত হয়। এর রচয়িতা, শিল্পীগোষ্ঠী ও দর্শক সকলেই লোকায়ত স্তরের মানুষ।
২) শহর এবং বিদগ্ধ ও অভিজাত সমাজ থেকে দূরে গ্রামের মাটিতে মাঠ, ঘাট ও বারোয়ারীতলায় এই নাটকের উদ্ভব ও অভিনয় দেখা যায়।
৩) সুগঠিত ও শিল্পসম্মত নাটকের নিয়মকানুন ধরাবাধা, কিন্তু লোকনাট্য নির্দিষ্ট শিল্পশাসনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তার আকার ও আয়তন নিত্য পরিবর্তনশীল।
৪) লোকনাট্যের মধ্যে সাধারণত সংলাপ অপেক্ষা সঙ্গীতেরই প্রাধান্য বেশি। খোলা জায়গায় দূরের দর্শক বৃন্দকে ধরে রাখতে হলে সঙ্গীতের প্রয়োগ বেশি হওয়া প্রয়োজন। শুধু কথা সেখানে অচল।

লোকনাট্য নিরূপণ প্রসঙ্গে ড. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য বলেন, "লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রযোজনা বিশ্লেষণ করে লোকনাট্য গঠনের মোটামুটি ছয়টি উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়।" সেগুলি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ্য করা গেল : ১) সংগীত, ২) সংলাপ সংযোজন, ৩) কাহিনী ও ঘটনার উপস্থাপনা, ৪) চরিত্র সন্নিবেশ, ৫) লোকশিক্ষা ও ৬) রস সৃষ্টির ব্যবস্থা।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটক ধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য।"[১৭] লোক সাহিত্যের অন্যান্য সকল বিষয়ের মতোই তা বিষয় এবং রচনাগত পরিবর্তনের ধারা স্বীকার করে; কোনো কিছুই সম্পূর্ণ অবিচল হয়ে সমাজের

---

[১৪] ড. অজিতকুমার ঘোষ, নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৬৪
[১৫] ঐ
[১৬] পবিত্র সরকার, নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরূপ, কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ১৬৫
[১৭] শ্রীসনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, কলিকাতা, ২০০০, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

সামনে কোনো অপরিবর্তনীয় আদর্শের সৃষ্টি করে না। লোকনাট্যের বিষয়বস্তু জীবন ভিত্তিক হওয়া আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, কোন পৌরাণিক কিংবা ধর্মীয় বা ধর্ম প্রচারমূলক বিষয়বস্তু হলেও তা লোকনাট্য বলে গণ্য হতে পারে না। তার প্রধান কারণ, প্রত্যেকটি পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে এবং তাদের নিয়ে যে সব কাহিনী রচিত হয়; সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে একটি অবিচল এবং একটি অপরিবর্তনীয় সংস্কার কাজ করে। তা বিসর্জন দিয়ে কিংবা তাকে যুগধারার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত করে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাহিনী কিংবা চরিত্রকে নতুন নতুনভাবে রূপায়িত করা যায় না। বিষয়বস্তু তার মধ্যে অবিচল থাকে, চরিত্রগুলোর আচার-আচরণ অপরিবর্তিত থাকে এবং কাহিনীও তার অগ্রগতির ধারায় নতুন কোনো পথ সন্ধান করে নিতে পারে না। একই পথে চলতে থাকে, ফলে তার মধ্যের প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে।

লোকনাট্য লোকের মুখে মুখে রচিত এবং পরিবর্তনশীল অর্থাৎ বাস্তব জীবনের মতোই 'পরিবর্তনশীল'কে ধ্রুব হিসেবে ধরে নিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'রামযাত্রা', 'ভাসানযাত্রা', 'চণ্ডীযাত্রাকে', 'লোকনাট্য' বলে স্বীকার করতে চান না। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "এসব 'যাত্রা' বলে পরিচিত রচনাগুলো লোকনাট্যের গুণান্বিত না হবার প্রধান কারণ, কালক্রমে এদের চরিত্রগুলো লৌকিক স্তরে নেমে এলেও এদের প্রত্যেকেরই কাহিনীগত এক একটি পৌরাণিক আদর্শ ছিল। অবশ্য তাদের মধ্যে দুটির কাহিনী সংস্কৃত পুরাণ থেকে না এলেও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বাঁধা ধরা এক একটি সুনির্দিষ্ট রূপ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। চরিত্রগুলো সাধারণ মানুষের জীবন থেকে এলেও এর একটি সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি আছে। তাদের যথেচ্ছা আচরণ করবার কোনো অধিকার নেই। সুতরাং চরিত্রগুলোর ক্রমবিবর্তন কিংবা পরিবর্তনেরও কোন উপায় নেই। আদর্শ মঙ্গলকাব্যগুলোতে তাদের যা রূপ প্রকাশ পায়, তাদের লৌকিক নাট্যরূপের মধ্যেও তার আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখার একটি দায়িত্ব আছে। সুতরাং তাদের কাহিনী কিংবা চরিত্রগুলো কোনো সংস্কৃত পুরাণ থেকে না এলেও বাঙালীর পুরাণ যে মঙ্গলকাব্য, তার একটি সুনির্দিষ্ট ধারা থেকে এসেছে। এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্য উভয়ের ক্ষেত্রেই কাহিনী এবং চরিত্রগত এক একটি অবিচল আদর্শ রক্ষা করবার দায়িত্ব আছে।" তাহলে এসব কাহিনী নিয়ে যে 'রামযাত্রা', 'ভাসানযাত্রা', কিংবা 'চণ্ডীযাত্রা' রচিত হয়েছে, সেগুলিকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের হিসেবে যথার্থ লোকনাট্য বলা যেতে পারে না।

তদুপরি, লোকনাট্যের সংজ্ঞা নিরূপণে অন্যান্যের তুলনায় আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য কিছুটা শিথিল। তিনি লোকনাট্যকে শুধুমাত্র যাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তবে তিনি লোকনাট্যের উপাদান হিসেবে 'কাহিনী'কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, "গম্ভীরা কোন আনুপূর্বিক ঘটনা theme নিয়ে রচিত নয়। একমাত্র একারণেই তাকে লোকনাট্যের অঙ্গীভূত করা যায় না।"[১৮] বাংলার গ্রামীণ লোকনাটক 'লোকনাট্য' হওয়ার বিপক্ষে তিনি যে সকল শর্তের কথা উল্লেখ সেগুলি নিম্নরূপ-

১) নায়ক-নায়িকা এবং সকল চরিত্রই গ্রাম্য নর-নারীর প্রতিনিধি।
২) গ্রামেই সংঘটিত কোন নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা তাঁদের বিষয়বস্তু।
৩) প্রয়োগ পদ্ধতি বা উপস্থাপনার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই।
৪) কোন সাজসজ্জা নেই। কেবল যেখানে ছেলেরা মেয়ের চরিত্রের সাজে, আর যখন যার যা পোশাক তাই অভিনয়ের ও পোশাক হয়ে থাকে।
৫) তাঁদের সাজঘর বলে কিছু নেই।
৬) সব চরিত্রই উন্মুক্ত মঞ্চের চারদিকে ঘিরে বসে। যখন যার অভিনয় করার প্রয়োজন তখন সে সেখান থেকে উঠে এসে অভিনয় করে আবার গিয়ে সেখানেই বসে।
৭) নাটকের বিষয়বস্তু গ্রাম জীবন ভিত্তিক। সেই বৎসর, সেই গ্রামে যে সব প্রণয়মূলক ঘটনা সংঘটিত হয় নাট্যকাহিনীতে, সংলাপে ও নৃত্যে তারই রূপায়ণ দেখা যায়। সত্যমূলক ঘটনাই তাঁদের ভিত্তি হয়ে থাকে।
৮) এগুলি সত্যমূলক ঘটনাকে লক্ষ্য রেখে আসরে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক (extempore) সংলাপ রচিত হয়।
৯) এদের কাহিনীর সূচনা আছে। ক্রমোন্নয়ন আছে এবং তার একটি স্পষ্ট পরিণতি আছে।
১০) সব চাইতে লক্ষযোগ্য বিষয় হল; এক বছরের গান কিংবা কাহিনী পরের বছরে অনুরূপভাবে আর শুনতে পাওয়া যায় না। সেই বছরের জন্য গ্রাম্য কবিরা সমসাময়িক কিংবা বাৎসারিক নতুন কাহিনীর সন্ধান করে এবং গ্রাম্য জীবনে তাঁর সন্ধান ব্যর্থ হয় না। এবং অভিনয়ের দিক থেকে বিশেষ করে পালাগানের ক্ষেত্রে মূলগায়েন নিত্যনতুনভাবে প্রতিনিয়তই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর পরিবেশনাকে সমৃদ্ধ করা চেষ্টা করে। যার ফলে তাঁর অভিনয়ের পরিবর্তনগুলি সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়েই ধাবিত হয়।
১১) এদের মধ্যে আনুপূর্বিক কোন কাহিনী নেই।

---

[১৮] পূর্বোক্ত, পৃ.৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মাত্র তিনটি পালা 'খন', 'পালাটিয়া', ও 'রং পাঁচালী'কে প্রকৃত গ্রামীণ লোকনাটক হিসেবে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। কিন্তু গ্রামীণ লোকনাট্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশই সাধারণভাবে প্রায় সকল গ্রামীণ লোকনাট্যের মধ্যে বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে শ্রীসনৎকুমার মিত্র বলেন, "অধিকন্তু আদ্যন্ত কাহিনী না থাকলে নাটক (drama) না হতে পারে কিন্তু গ্রামীণ লোকনাটক হতে বাধা 'লোক' সমাজের হয় না। ঐ সব পালার কোনো কোনোটায় খণ্ড জীবন চিত্র বা সাময়িক ঘটনার খণ্ড কাহিনী বর্ণিত হলেও সর্বস্তরের 'লোক' সাধারণ তারমধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে থাকে। 'আলকাপ', 'বনবিবির পালা' ইত্যাদির নাটকীয়তা কোন অংশেই কম নয়। তা থেকে গ্রামীণ আপামর দর্শকের নাট্যরস আস্বাদনে কোন রকম ঘাটতি হয় না।"[১৯]

পুরাণ বিষয়ক 'লোকনাটক' সম্বন্ধে শ্রীসনৎকুমার মিত্র বলেন, "কুশান বা বিষহরা ইত্যাদি পুরাণ বিষয়ক পালা কিন্তু পুরাণ কাহিনী হলেই যে সত্যমূলক হবে না 'কৃত্রিম' হবে, তাতে জীবনের উত্তপ্ত আবেগের ছোঁয়াচ আদৌ থাকবে না তাই বা কেমন করে হয়। পুরাণ-কাহিনীর মধ্য থেকেই 'লোক'-সাধারণ আপন জীবন-সংসার ও সমাজের সত্যকে অন্বেষণ করে, সেখান থেকে আহৃত সত্যকে নিজেদের জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায়। অতএব এই সত্য দৈনন্দিনতার ধুলা-মালিন্যযুক্ত না হলেও তা সত্যমূলক। অতএব তাদেরও গ্রামীণ লোকনাটক হতে বাঁধা কোথায়?"[২০]

গ্রামীণ লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য বিচারে শ্রীসনৎকুমার মিত্র আরও যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ-

১) লোকনাটক মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হয়। এর চারদিকই খোলা। বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে দর্শকেরা আসরের চারদিকে গোল হয়ে বসে কোন প্রসেনিয়ামের বাঁধা থাকে না।

২) কোন কোন পালায় দেখা যায়, বাদ্যকরেরা আসরের মাঝখানে বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে (প্রধানত 'কুশান' এবং 'বিষহরা' পালায় বাদ্যকরদের দাঁড়িয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দেখা যায়) সাধারণ বাজনা বাজিয়ে যায়, আর অভিনেতারা তাঁদের ঘিরে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে যায়।

৩) পালার সংলাপ প্রায় সর্বাংশেই আঞ্চলিক ভাষায় রচিত।

৪) গ্রামীণ লোকনাট্য সঙ্গীত নির্ভর। এদিক থেকে এদের অপেরা ধর্ম প্রায় অক্ষুণ্ন। কোন কোনটিতে নৃত্যও অনেকখানি জায়গা করে নেয়।

৫) লোকনাট্যের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, এরা একান্তভাবেই অসাম্প্রদায়িক; কোন ধর্মসম্প্রদায়কে কোনভাবেই আঘাত বা ব্যঙ্গ করে না।

৬) আঞ্চলিক এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রই সুর সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন- দোতারা, বাশি, মৃদঙ্গ, ঢোল-কাসি, ঢাক, হারমোনিয়াম, বাঁশি, করতাল, ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৭) গ্রামীণ লোকনাটকের প্রায় অনেকগুলিতে একটি ভাঁড় চরিত্র উপস্থিত থাকে।

এ প্রসঙ্গে লোকনাট্য বিষয়ে ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ এর বক্তব্য অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, "যে কোন ত্রিমাত্রিক আয়তন (space) এ এক বা একাধিক মানুষ যখন অপর এক বা একাধিক মানুষের সম্মুখে যে কোন ক্রিয়া উপস্থাপন করে তাকেই 'নাট্য' বলা হয়। উল্লিখিত উপস্থাপনাটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবে পূর্ব নির্দিষ্ট একটি লিখিত পাঠের মাধ্যমে অথবা হতে পারে তাৎক্ষণিক উপায়ে মৌখিকভাবে সৃষ্ট। এমনকি এ দুয়ের মাঝে থাকতে পারে অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি প্রকরণ। আর যে কোন নাট্যের লিখিত পাঠই হল, 'নাটলিপি'।"[২১]

লোকনাট্য বিষয়ে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ এর বক্তব্যটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সেই অর্থে গ্রাম বাংলার সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডকে (ধর্ম/ ধর্মনিরপেক্ষ হোক) লোকনাট্য রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্যকে বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য বলে অভিহিত করেছেন। বাংলার এই স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্যে কথানাট্য রীতিসহ নাটগীত, মিশ্রনাট্য বহুল পরিমাণে বিকশিত হয়েছিল।

এখানে 'কথানাট্য' এমন এক ধরনের নাট্য যেখানে একজন মাত্র কুশীলব (গায়েন অথবা কথক) গদ্যে, পদ্য-ছন্দ অথবা গীতের মাধ্যমে কোন কাহিনী পরিবেশন করেন। কখনো তাঁর হাতে থাকে একটি চামর এবং পায়ে ঘুঙুর।

---

[১৯] পূর্বোক্ত, পৃ- ৩

[২০] ঐ

[২১] ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, হাজার বছর; বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ- ১

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রের ক্রিয়াকর্ম তিনি বর্ণনাত্মক অভিনয় দ্বারা উপস্থাপন করেন এবং কখনো তাঁর পরিবেশনে নৃত্য যুক্ত হয়। পরিবেশন স্থলের এক অংশে (মধ্যে অথবা এক পাশে) উপবিষ্ট দোহার ও যন্ত্রীদল পরিবেশনার গীত অংশে কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গায়েনকে সহায়তা দান করেন। স্থানীয় জনপদ নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্য দ্বারা ধ্রুপদী নাট্যকলা যে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন উপরূপক বিশেষ করে 'নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ'গুলোর মধ্যে। মধ্যযুগের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সমূহের প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা এবং মন্দিরগাত্র অলংকরণ 'কথানাট্য' রীতির নাট্য প্রদর্শনী সম্পর্কে ধারনা লাভে আমাদের সাহায্য করে।[২২] তখন সাধারণত বাড়ির বহিরাঙ্গণ, উপাসনালয়-প্রাঙ্গণ, নাট মন্দির, রাজবাড়ির কোন কক্ষ অথবা মেলা-উৎসবাদির জন্য নির্ধারিত উন্মুক্ত মাঠই ছিল এসবের অনুষ্ঠানস্থল। তিনদিক অথবা চতুর্দিক ঘিরে বিন্যস্ত থাকতো দর্শকের সারি এবং এর মাঝখানে মাটিতে মাদুর বিছানো স্থানে চলতো নাট্য প্রদর্শনী। অধিক দর্শক সমাগম হলে উচুঁ ঢিবি বা বাঁশের খুটির উপর কাঠের টুকরা স্থাপন করে অভিনয়স্থল তৈরী করা হতো।

ধারনা করা হয়, প্রায় হাজার বছর কাল আগে থেকেই বাংলায় এই কথানাট্যের প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলে জনপ্রিয় "চর্যাগীতির" প্রচলন ছিল। যার রচয়িতা ছিলেন বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, 'চর্যাপদ'গুলো নবম শতকেরও পূর্বকালের রচনা এবং কমপক্ষে সপ্তম শতক থেকে এসব গান রচিত হতে থাকে। একটি চর্যাপদে বুদ্ধ নাটকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥

অনুবাদ:
বজ্রাচর্য নাচেন, দেবীগান করেন।
বুদ্ধ নাটক হয় বিষম (শক্ত) ॥[২৩]

"কথানাট্য মূলত বর্ণনাত্মক অভিনয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এর লিখিত পাঠের জন্য অভিনেতাগণ বরাবর এক প্রকার বর্ণনাধর্মী কাব্যের উপর নির্ভর করেন। সম্ভবত এসব কাব্য প্রথমাবস্থায় মুখে মুখে রচিত এবং প্রচারিত হত এবং তেরো শতকের দিকেই কেবল তা লিপিবদ্ধ হতে শুরু করে।[২৪] এধরনের বর্ণনামূলক কাব্যের বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বিচার করলে আমরা এগুলিকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। যেমন-

ক) রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত আর্যদেবতা ও অবতারগণের কাহিনী ভিত্তিক;
খ) মঙ্গলকাব্য সমূহে বর্ণিত স্থানীয় অনার্য দেবদেবীর কাহিনী ভিত্তিক;
গ) মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বীর ও সাধুগণের কাহিনী ভিত্তিক;
ঘ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও ধর্মনিরপেক্ষ লোককাহিনী ভিত্তিক।

ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী শেষোক্ত শ্রেণীর উপাদান আমাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় সে কারণে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে-

খ্রীষ্টীয় পনেরো শতকের গোঁড়া থেকেই ধর্মভাব মুক্ত 'কথানাট্য' রীতির চতুর্থ ধারাটির উদ্ভব ঘটে প্রধানত রাজাকূল্য প্রাপ্ত মুসলমান কবিদের মাধ্যমে। তাঁরা পারস্য দেশীয় রচনাসমূহ সরাসরি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন অথবা সে সবের ছায়া অবলম্বনে কাহিনী কাব্য রচনা করেন। সচরাচর পুঁথি নামে অভিহিত এসব রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'প্রেম' এবং তা উদার মানবতাবাদ প্রচার করে। এতে উপস্থাপিত হয়েছে জীবনের সহজ আনন্দোচ্ছ্বাস, মানবিক সৌন্দর্য, নিসর্গপ্রীতি এবং শারীরিক কামনানুভূতির এক উজ্জ্বল প্রকাশরূপ। এই ধারার আবির্ভাবের ফলেই বাংলায় প্রথমবারের মতো সাহিত্য ও শিল্পকলা, ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে দূরে সরে গেল এবং এতে প্রাধান্য পেল ও মূর্ত হয়ে উঠল দেবতা নয়, রক্ত-মাংসে গড়া লৌকিক মানুষ। এই ধারার কয়েকটি উজ্জ্বল রচনা কর্ম হচ্ছে : দৌলত উজির বহরম খানের 'লাইলী মজনু', এবং দোনাগাজীর 'সয়ফুল মুল্‌ক বদিউজ্জামাল'; সতেরো শতক রচিত আলাওলের 'হপ্তপয়কর' ও 'সয়ফুল মুল্‌ক বদিউজ্জামাল', আঠারো শতকে মোহাম্মদ মুকিম প্রণীত 'গুলে বকাওলী' এবং উনিশ শতকীয় রচনার মধ্যে মোহাম্মদ খানের 'আলেফ লায়লা' উল্লেখযোগ্য। এসবের বর্ণনাকারী কুশীলব তাঁর পায়ে ঘুঙুর

---

[২২] Zulekha Haque, Terracotta Decorations Late Medieval Bengal, Dhaka, 1980, Pg. 14

[২৩] মহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), চর্যাগীতিকা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১০৭-১০৮

[২৪] পূর্বোক্ত, ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

পড়তেন কিন্তু হাতে চামড় পড়া থেকে বিরত থাকতেন। বাংলার সর্বত্র অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে এসব পুথি প্রদর্শনীও সমান জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কথানাট্যরীতির মতো নাটগীত রীতির পরিবেশনায়ও কথক গীতের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা ও প্রাত্যহিক গদ্যে ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং একদল উপবিষ্ট দোহার ও যন্ত্রী নৃত্য ও গীত অংশে সহযোগিতা দান করেন।

মধ্যযুগের অভিনয়কলাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল ত্রি-চরিত্র বিশিষ্ট গীতগোবিন্দের সাঙ্গীতিক আদর্শটি এবং এর কাঠামো থেকেই বিকাশ লাভ করে 'নাটগীত রীতি'। যেমন: বড়ু চণ্ডীদাসের (১৩৭০-১৪৩৩) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। সমগ্র কাহিনীটি পরিবেশন করা হত ত্রি-চরিত্রে। যেমন- কৃষ্ণ, রাধা এবং একজন বৃদ্ধা মহিলা বড়াই (ব্রজের বৃদ্ধা বিশেষ-যশোদার মা পাটলার সহচরী, যশোদার ধাই, কৃষ্ণের আই) এর গীতিধর্মী সংলাপের মধ্য দিয়ে। এই চরিত্রগুলোর নাটকীয় গঠন-কৌশলের জন্য এটি মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও নাট্য প্রদর্শনীর আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি (বিশেষত বিবাহোৎসব) এবং ধর্মীয় উৎসবে 'নাটগীত' প্রদর্শিত হত, কখনো বাড়ির উঠানে, মেলা-উৎসবাদির জন্য নির্ধারিত উন্মুক্ত মাঠে, নাট মন্দিরে অথবা মন্দির সংলগ্ন কোন ময়দানে। এই নাটগীত রীতির পরিবেশনায় হাস্যরসাত্মক উপাদান ও তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট গদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হয়। চরিত্রগতভাবে 'নাটগীত' রীতি নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত বর্জিত। তবে ষোল শতক হতে 'নাটগীত' রীতিতে কৃষ্ণকাহিনী অধিক মাত্রায় প্রাধান্য লাভ করে এবং ষোল শতকে বঙ্গীয় জনসমাজে ক্রমবর্ধমান 'কৃষ্ণ' ধারনার বিস্তৃতির দরুণ এটি মূলত 'প্রেম' বিষয়ের মাঝেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মঙ্গলকাব্য ভিত্তিক 'কথানাট্যে' উপস্থাপিত বৃহত্তম সমাজ জীবনের অভিব্যক্তির বিপরীতে কৃষ্ণকাহিনী ভিত্তিক নাটগীতে ব্যক্তি মানুষের কামনা বাসনা গুরুত্ব লাভ করে।

ষোল শতকের কৃষ্ণযাত্রায় পাত্র-পাত্রীগণ সংলাপ, নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গি সহযোগে অভিনয় করতেন এবং নৃত্য ও গীতাংশে তাঁদের সহযোগিতা করতেন একজন অধিকারী কর্তৃক পরিচালিত বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ। অধিকারী প্রয়োজন অনুসারে কাহিনী বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতেন। গান ও নাচ ছাড়াও কৃষ্ণযাত্রায় যে সব উপাদান সমূহের সমাবেশ লক্ষণীয় ছিল সেগুলি নিম্নরূপ-

ক) তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গদ্য সংলাপ ও পূর্ব রচিত গানের ব্যবহার;
খ) কেবল পুরুষ অভিনেতা দ্বারা সকল চরিত্র উপস্থাপন;
গ) হাস্য রসের উপস্থিতি;
ঘ) 'কৃষ্ণ' বিষয়ক কাহিনীর উপস্থিতি;
ঙ) ধ্রুপদী রাগ ভিত্তিক সঙ্গীতের উপস্থিতি;
চ) অঙ্গ সজ্জা ও পোশাকের বিশিষ্ট ব্যবহার;
ছ) প্রলম্বিত অনুষ্ঠান প্রদর্শনী,
জ) দর্শক ও কলাকুশলীদের মধ্যে সংলাপ বিনিময়;
ঝ) কোন উঁচু মঞ্চ ও পর্দা ছাড়াই উন্মুক্ত স্থানে দর্শক পরিবেষ্টিত আসরে প্রদর্শনীর আয়োজন।

বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যায় নির্দিষ্টভাবে 'কৃষ্ণযাত্রা' ও সাধারণভাবে 'নাটগীত' রীতি নিজস্ব নাট্য কাঠামো থেকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করে শাস্ত্রোক্ত নয়টি প্রধান রসের অন্যতম 'শৃঙ্গার' রসের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে এবং ভক্তিমূলক প্রেমকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। মঙ্গলকাব্যের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় 'কৃষ্ণযাত্রা' পরমাত্মা তথা কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের বিবিধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ রূপকে ফুটিয়ে তুলতেই আগ্রহী ছিল।[২৫] কেননা একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শ্রী চৈতন্যদেবের অনেক আগেই রাধা-কৃষ্ণের জবানীতে প্রণয়মূলক গীতিকাব্য (উমাপতি ধর), 'শ্রীগীতগোবিন্দম্' (জয়দেব), 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (বড়ু চণ্ডীদাস) এবং বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক শৃঙ্গার-রসাত্মক পদগুলি রচিত এবং বহুল প্রচারিত হয়েছিল। এগুলির অধিকাংশই নর-নারীর প্রাকৃত প্রেমলীলার আদর্শে রচিত এবং এগুলিতে রক্ত মাংসে গড়া মানুষের প্রেমের ও সম্ভোগের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হতে দেখা যায়। এর পদগুলি আধ্যাত্মিকভাবে অনেকটা উন্নীত হলেও এগুলির মধ্যেও আমরা যে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ পাই, তারা রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ। কাব্যের মূল বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের 'প্রেমলীলা'কে অনেকে আধ্যাত্মিক সম্পদরূপে বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে, "শ্রীকৃষ্ণ চিরসুন্দর রসস্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীভগবান এবং শ্রীরাধা সেই ভগবানের হ্লাদিনী পরাশক্তি বা মহাভাবময়ী পরমাকৃতি-তিনি জীবাত্মার প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধার অভিসার, পরমাত্মার উদ্দেশ্যে জীবাত্মার অভিসারের রূপক মাত্র।[২৬] মঙ্গলকাব্য হল মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা। খ্রীষ্টোত্তর দ্বাদশ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক সাহিত্য প্রচলিত

---

[২৫] পূর্বোক্ত, ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, পৃ. ১৯

[২৬] তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ১৯৪-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ছলে কবিরা মূলত মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই বলেছেন। জনসাধারণের মধ্যে পাঁচালী আকারে লিখিত এই কাব্যগুলি পুরাণ ও শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি লৌকিক সাহিত্য।[২৭]

আমাদের দেশের ধর্ম বা প্রথাচালিত কোন উৎসব উপলক্ষে অথবা অবসর সময়ে আনন্দ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই হাজার বছর ধরে এই লোকনাট্য সাধারণ মানুষের দ্বারা লালিত হয়ে এসেছে। আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী বিশেষ করে পূজা-পার্বণে, চৈত্র সংক্রান্তিতে, বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত কোন মেলায় (যেমন- বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা ইত্যাদিতে) এই লোকনাট্য অভিনীত হয়ে থাকে। বিভিন্ন উপলক্ষে-উদ্দেশ্যে পরিবেশিত এই লোকনাট্য তার দর্শক শ্রোতার মনে বিভিন্ন রসের সঞ্চার ঘটাত। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই লোকনাট্য পরিবেশিত হতো বলে এর কাঠামোগত আঙ্গিক দিকটাও বিভিন্ন। তাই লোকনাট্য রূপ নিয়েছে বিভিন্ন রীতির, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। লোকনাট্যের পরিবেশনার মধ্যে আমরা যে সব উপদানের ব্যবহার দেখি সেগুলি নিম্নরূপ-

- ক) নৃত্য
- খ) সংগীত
  - গীত
  - যন্ত্র সংগীত
- গ) কথা বা বচন।

উপরোক্ত উপাদানগুলির মধ্যে কথা বা বচন হল তিনটি বৈশিষ্ট্যের। যেমন - ক) গদ্য, খ) কাব্য, গ) গীত। এই তিনটি নিয়েই হল লোকনাট্য। আর এগুলি সব মিলিয়েই হলো লোকনাট্যের অভিনয় উপস্থাপন। অভিনয় উপস্থাপনে লোকনাট্যের মধ্যে যে যে উপাদানগুলি লক্ষণীয় সেগুলি নিম্নরূপ-

অভিনয় উপস্থাপন (বর্ণনাত্মক)
- বর্ণনাত্মক গদ্য বা গদ্যে বর্ণন
- বর্ণনাত্মক কাব্য বা কাব্যে বর্ণন
- বর্ণনাত্মক গীত বা গীত বর্ণন

অভিনয় উপস্থাপন (সংলাপাত্মক)
- সংলাপাত্মক গদ্য
- সংলাপাত্মক কাব্য
- সংলাপাত্মক গীত

অভিনয় উপস্থাপন (অন্যান্য)
- মূক (Mymetic)
- কথন (Recitative)

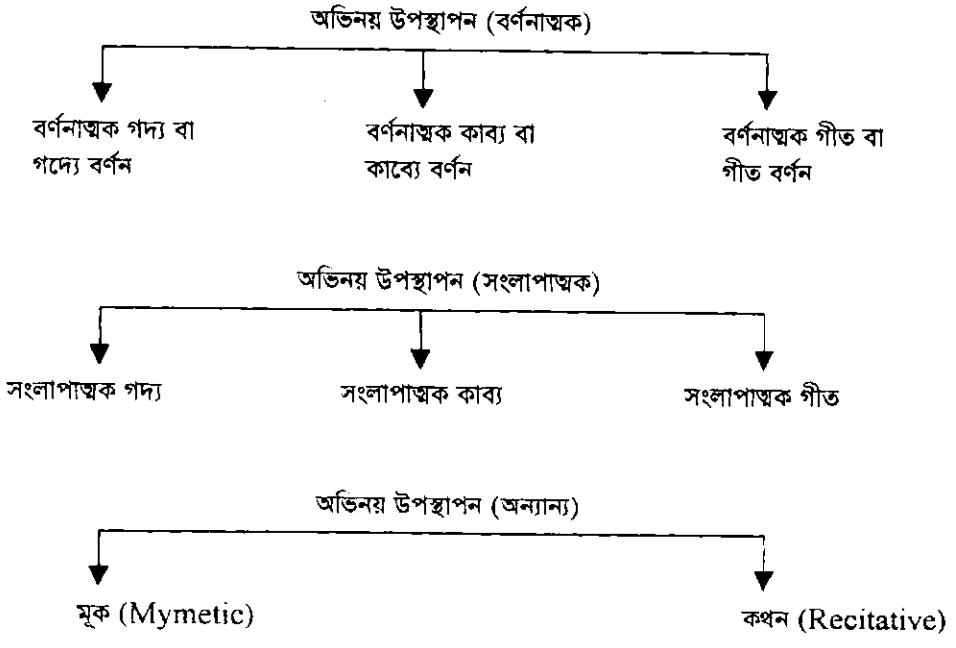

লোকনাট্যে কখনও গল্পের মত গদ্যে বর্ণনার মাধ্যমে, কখনও বর্ণনাত্মক গীতের মাধ্যমে আবার কখনও কাব্য বর্ণনের দ্বারা অভিনয় দেখা যেত। কখনও কোন চরিত্র তাঁর সংলাপ গানের মাধ্যমে প্রকাশ করত অথবা সাধারণ গদ্যের মতো অথবা হয়ত কাব্যের মত বলে যেত। আবার কখনও বর্ণনা এবং সংলাপ এর কোনটাই ব্যবহার না করে শুধু বসে বসে পুথি পাঠ করত এবং তা তাঁর পাশের সবাই আগ্রহ ভরে শুনত। আবার হয়ত বা কোন পুথি পাঠও না করে, কোন কথা ব্যবহার না করে ঢোলের বাদ্যের তালে তালে মুখোশ পরে বিভিন্ন অভিনয় করত।

উপরোক্ত অভিনয় উপাদানগুলির সংমিশ্রণের এক অপূর্ব সম্ভার হল আমাদের লোকনাট্য। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যখন এ লোকনাট্যগুলি অভিনীত হত, তখন যারা লোকনাট্যে অভিনয় করতেন তাঁরা লোকনাট্যের এসব উপাদানগুলিকে পৃথক করে ব্যবহার করতেন না। অভিনয় উপাদানগুলি তাঁদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে প্রচলিত রীতি বা প্রথা অনুযায়ী লোকনাট্যে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অভিনয় উপস্থাপনের এই আটটি উপাদানের সবগুলোই যে সব

[২৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

লোকনাট্যে পাওয়া যাবে তা নয়। কোনও লোকনাট্যে হয়ত বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক উপাদানের ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায় আবার কোন লোকনাট্য হয়ত সংলাপ এবং মাইমেটিক উপাদান দ্বারা গঠিত। লোকনাট্যে অভিনয় উপাদানগুলির এরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের ফলে, অঞ্চল ও সংস্কৃতির ভেদের কারণে উদ্ভব হয় বিভিন্ন প্রকারের নাট্যরীতি। যেমন- ১) বর্ণনাত্মক রীতি, ২) সংলাপাত্মক রীতি, ৩) মিশ্র রীতি, ৪) নাটগীত রীতি, ৫) শোভাযাত্রা রীতি, ৬) অধিব্যক্তিক রীতি, ৭) প্রতিযোগিতামূলক রীতি, ৮) কথন রীতি। এসব রীতি নির্ধারিত হয় লোকনাট্যের মধ্যে অভিনেয় উপাদানগুলির ব্যবহারের উপর। যেমন- মনসা বিষয়ক লোকনাট্য বাগেরহাট অঞ্চলে পরিবেশিত হয় 'রয়ানী গান' নামে, যা বর্ণনাত্মক রীতির অন্তর্ভুক্ত।

বর্ণনাত্মক রীতি

বর্ণনাত্মক রীতিতে মূল অভিনয় বর্ণনাধর্মী। রয়ানী গানে একজন মূল গায়েন থাকেন, যিনি কাহিনী বর্ণনা করে যান। মূল গায়েনের সাহায্যকারী হিসেবে যন্ত্রীদল এবং দোহার বা জুড়ি থাকে। সাধারণত গীত, আবৃতি ও গদ্যের দ্বারা গায়েন কাহিনীর বর্ণনা করে থাকেন। বর্ণনাত্মক রীতির মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ক 'লীলাকীর্তন', নরসিংদী অঞ্চলের রামচন্দ্র বিষয়ক 'রামায়ণ গান', দিনাজপুরে শিবকালী বিষয়ক 'গম্ভীরা নাচ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সংলাপাত্মক রীতি

এই রীতিতে গায়েনের বর্ণনা ছাড়াও উত্তম পুরুষের সংলাপ বর্তমান। যেমন- সংলাপাত্মক 'আলকাপ গানে' অল্প পোষাক পরিবর্তন করে। 'কুষান গানে', 'আলাকাপ গানে' ছেলেরা মেয়েদের চরিত্রে যখন অভিনয় করে, তখন কাপড় পরিবর্তন করে। বিশেষ করে বৃদ্ধ রমণীরা। অনেক সময়ে দোহার থেকে উঠে বা সাজঘর থেকে পোশাক হালকা পরিবর্তন করে। সংলাপাত্মক রীতির মধ্যে গীত সংলাপ, গদ্য সংলাপ, কাব্য সংলাপ থাকতে পারে। যেমন- মনসা বিষয়ক একই কাহিনী বরিশাল অঞ্চলে 'ভাসানযাত্রা' নামে পরিচিত, যা সংলাপাত্মক রীতির অন্তর্গত। বাগেরহাট অঞ্চলে কৃষ্ণ বিষয়ক 'সাঁঝ কীর্তন', নড়াইল অঞ্চলে শিবকালী বিষয়ক 'অষ্টকযাত্রা' ইত্যাদি।

মিশ্র রীতি

মিশ্ররীতিতে সংলাপাত্মক ও বর্ণনাত্মক রীতি একই সাথে সমান পরিমাণে অভিনীত হতে দেখা যায়। রংপুরে মনসা বিষয়ক 'পদ্মাপুরাণ গান', রাজশাহী অঞ্চলে রামচন্দ্র বিষয়ক 'লক্ষ্মীর গান', পীর বা ধর্ম বিষয়ক 'জংগজারী', 'পালাগান' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নাটগীত

নাটগীতে সংলাপাত্মক রীতির প্রায় সবগুলোই নাচের এবং গানের হয়ে থাকে। মনসা বিষয়ক 'বেইল্যা নাচানী', কৃষ্ণ বিষয়ক 'মণিপুরী রাশনৃত্য', পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে শিবকালী বিষয়ক 'শিবনাচ', নাটোর অঞ্চলের নাথ বিষয়ক 'যোগীর গান' উল্লেখযোগ্য।

শোভাযাত্রা

শোভাযাত্রাই এই রীতির মূল বৈশিষ্ট্য। মূল উপাদান প্রথমত: যারা দেব-দেবীদের বিশ্বাস করেন, ঐসব দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে মিছিল, সাথে থাকে নৃত্য-গীত। দ্বিতীয়ত: বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে নীরব নিশ্চল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা দৃশ্য বিশেষের অভিনয় সৃষ্টি করা। যা সবাইকে তাঁদের যাত্রা সম্পর্কে জানান দেয়। ধর্মের বিষয়কে জানানোর জন্যই এই শোভাযাত্রা। এখানে নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বেশি। যেমন- কৃষ্ণ বিষয়ক শোভাযাত্রা 'জন্মাষ্টমীর মিছিল', বরিশাল অঞ্চলে শিবকালী বিষয়ক শোভাযাত্রা 'নীলের গাজন', পীর বা ধর্ম বিষয়ক মহররমের মিছিল ইত্যাদি।

অধিব্যক্তিক

এর উদাহরণ হল পুতুল নাচ, মুখোনাচা। এখানে পুতুলের দ্বারা মঞ্চে অভিনয় করালেও তার পেছনে একজন জীবন্ত অভিনেতা কাজ করেন, যিনি পুতুলগুলিকে আড়ালে থেকে চালনা করেন। ফলে দর্শকদের চিন্তায় পুতুল চালনাকারী অদৃশ্যব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- নাটোর অঞ্চলে শিবকালি বিষয়ক 'মুখোনাচা', রাজশাহী অঞ্চলে রামচন্দ্র বিষয়ক 'মহেশা খেলা', নরসিংদী অঞ্চলে 'গাজীর পট' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রতিযোগিতামূলক

মূল বৈশিষ্ট্য হল একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনীর ছোঁয়া থাকতে পারে। যেখানে কাহিনী তুলে ধরা হয় সেখানে প্রতিযোগিতা সাজানো থাকে। বগুড়া অঞ্চলে 'পাইল্যা যাত্রা' এ একই দলের দু'জন লড়াই করে কাহিনী উপস্থাপন করে থাকে। কাহিনী উপস্থাপন করার উপায় হল- একজন আরেকজনকে যাবার বেলায় প্রশ্ন করে যাবে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের জারীগান প্রতিযোগিতামূলক। আর কাহিনী ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতামূলক রীতি হল; 'কবিগান'। এর মধ্যে কোন কাহিনী নেই। আগেই ঠিক করা থাকে-কে কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করবে। যেমন- বগুড়ার 'পাইল্যা যাত্রা', নড়াইল অঞ্চলের 'ভাসান-পালাগান'। এরকম প্রতিযোগিতায় বিষয় হিসেবে সাধারণত দেখা যায় একজন 'শাকার' আরেকজন 'নিরাকারে'র কথা বলে।

কথন

এর মূল বৈশিষ্ট্য হল; এটি বর্ণনাত্মক এবং কুশীলবদের সবাই বসে পরিবেশন করে। কখনও উঠে দাঁড়ায় না। আঙ্গিক অভিনয় নেই বললেই চলে। বাচিকের ব্যবহার বেশি। যেমন- মনসা বিষয়ক 'মনসার পাঁচালী', 'পুথি পাঠ' ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা লোকনাট্যের উপাদানগত বিশ্লেষণ ও বিষয়ভেদে অঞ্চলগত পরিবেশনার পার্থক্যের কারণে, যে বিভিন্ন রীতি ও বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়েছে, তার একটি বিন্যাসগত পার্থক্য প্রদত্ত ছকে দেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

মনসা বিষয়কে কেন্দ্র করে

বিষয়	বর্ণনাত্মক	মিশ্র	সংলাপাত্মক	নাটগীত	শোভাযাত্রা	প্রতিযোগিতামূলক	অধিব্যক্তিক	কথন
মনসা	১) রয়ানী গান ২) মনসার পাঁচালী ৩) পদ্মাপুরাণ গান (নাটোর) ৪) বিষহরির গান (রংপুর)	১) পদ্মাপুরাণগান (রংপুর) ২) ভাসান গান (পাইকগাছা)	১)ভাসান যাত্রা (বরিশাল অঞ্চল আষাঢ় মাসে)	১) বেইল্যা নাচানী	১) ঝাপানগান	১) ভাসান পালাগান (নড়াইল অঞ্চল) ২) ঝাপান খেলা (প্রতিযোগিতা নয় কিন্তু প্রতিযোগিতার মত)	১) পুতুল নাচ ২) পশ্চিম বাংলার মনসার পট	১) মনসার পাঁচালী বসে বসে বলে।

ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়কে কেন্দ্র করে

বিষয়	বর্ণনাত্মক	মিশ্র	সংলাপাত্মক	নাটগীত	শোভাযাত্রা	প্রতিযোগিতামূলক	অধিব্যক্তিক	কথন
ধর্ম নিরপেক্ষ	১) কেচ্ছা কাহিনী (রংপুর) ২) ঢক যাত্রা (নড়াইল) ৩) ঢং যাত্রা (কুমিল্লা)	১) পালাগান (পূর্ব ময়মনসিং)	১) রং পাঁচালী ও ২) শাস্ত্রীয় পাঁচালী (ঠাকুরগাঁও) ৩) মাইট্টা তামাসা (পশ্চিম ময়মনসিং)	১) ঘাটুগান (ময়মনসিং)	×	১) আলকাপ (রাজশাহী)	×	১) কেচ্ছাগান (পূর্ব ময়মনসিং)

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণ ও চৈতন্য প্রকারভেদ

বিষয়	বর্ণনাত্মক	মিশ্র	সংলাপাত্মক	নাটগীত	শোভাযাত্রা	প্রতিযোগিতামূলক	অধিব্যক্তিক	কথন
কৃষ্ণ	১) লীলা কীর্তন পদাবলী	×	১) কৃষ্ণ যাত্রা ২) সাজ কীর্তন (বাগেরহাট অঞ্চল)	১) পালা কীর্তন ২) মণিপুরী রাশ নৃত্য	১) জন্মাষ্টমীর মিছিল ২) নৌকা বিলাস এথেকে যাত্রার উদ্ভব সূত্র পাওয়া যায়।	×	×	১) কেচ্ছাগান (পূর্ব ময়মনসিং)

রামচন্দ্র বিষয়ক

বিষয়	বর্ণনাত্মক	মিশ্র	সংলাপাত্মক	নাটগীত	শোভাযাত্রা	প্রতিযোগিতামূলক	অধিব্যক্তিক	কথন
রামচন্দ্র	১) রামায়ণ গান (নরসিংদীর খুকুমনি)	১) কুশান গান (রংপুর অঞ্চল) ২) লক্ষীর গান (রংপুর অঞ্চল)	১) রাম যাত্রা	×	×	×	১) মহেশা খেলা রাজশাহী অঞ্চলে (যাত্রার মত, মুখোশের ব্যবহারআছে, যন্ত্রসংগীতের তালে তালে নাচ-গান আছে)	×

Dhaka University Institutional Repository

শিবকালী বিষয়কে কেন্দ্র করে

বিষয়	বর্ণনাত্মক	সংলাপাত্মক	মিশ্র	নাটগীত	শোভাযাত্রা	প্রতিযোগিতামূলক	অধিব্যক্তিক	কথন
শিবকালী তান্ত্রিক আচার লক্ষ্য করা যায় অত্যন্ত প্রাচীন	১) গম্ভীরা নাচ চৈত্র সংক্রান্তির আগে (দিনাজপুর অঞ্চল)	১) অষ্টক যাত্রা (নড়াইল অঞ্চল) ২) সং যাত্রা (টাঙ্গাইল অঞ্চল)	×	১) শিবগৌড়ি নাচ (পূর্ব ময়মনসিং) ২) অষ্টক গান (নড়াইল অঞ্চল)	১) নীলের গাজন (মঠবাড়িয়া)	১) ঝাপান গান, অষ্টক গানের মতোই (নড়াইল অঞ্চল)	১) মুখোনাচ (নাটোর-রাজশাহী অঞ্চল) ২) কালিকাচ্	×

বৌদ্ধনাথ সম্প্রদায় বিষয়ক (গৌতম বুদ্ধের জীবনকে কেন্দ্র করে)

বিষয়	বর্ণনাত্মক	সংলাপাত্মক	মিশ্র	নাটগীত	শোভাযাত্রা	প্রতিযোগিতামূলক	অধিব্যক্তিক	কথন
বৌদ্ধনাথ সম্প্রদায়	১) বৌদ্ধ কীর্তন	১) জ্যা- 'মারামা'রা করে।	×	১) যোগীর গান ২) যোগীর পর্ব (রাজশাহী অঞ্চলে)	×	১) পালাগান (জাতকের কাহিনী / গৌতম বুদ্ধের জীবন সম্পর্কিত বিষয়)	১) বুলু - পার্বত্য অঞ্চলে মুখোশের ব্যবহার আছে।	×

Dhaka University Institutional Repository

পীর বা ধর্মীয় বিষয়ক

বিষয়	বর্ণনাত্মক	সংলাপাত্মক	মিশ্র	নাটগীত	শোভাযাত্রা	প্রতিযোগিতামূলক	অধিব্যক্তিক	কথন
ধর্মীয় (মুসলমান বীরদেরকে নিয়ে)	১) জারীগান (পূর্ব ময়মনসিং অঞ্চল) ২) নাইচের জারী (ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া -কুমিল্লা অঞ্চল) কাদা নিয়ে হলি খেলার মতো। বাংলা জারী যেকোন সময়ে উত্তর বাংলার জারীগানে দোহার গোল হয়ে হাটু গেড়ে বসে, মাথা দোলায়, হাতে তালি দেয়। এবং মূল গায়েন ঘুরে ঘুরে গান করে। ৩) গাজীর গান (মানিকগঞ্জ -খুলনা অঞ্চল - গাজীর ঘর ছেড়ে যাওয়া থেকে শুরু হয়) ৪) মামাই চম্পার কিচ্ছা কাহিনী - জারী, লবশা : সাতক্ষীরা অঞ্চল - মেয়েকে নিয়ে ধর্মীয় কিচ্ছা কাহিনী - সবাই পুরুষ। ৫) বন বিবির পালা অলৌকিক কোন মহিলার কাহিনী নিয়ে	১) ইমাম যাত্রা ২) গাজীর যাত্রা আল্লাহ ও জীবরাইলের কথোপকথনের মধ্যে অশ্লীল নাচও আছে। ৩) সত্য পীরে যাত্রা (খুলনা অঞ্চল)	১) মাদার পীরের গান (তার মতো করে আল্লাহ-নবীকে মানে) - এখানে মূল গায়েন মুসলমান এবং তার সহযোগী - বৈষ্ণব। (রাজশাহী অঞ্চল - নাটোরে) ২) সত্যপীরের গান (উত্তর বঙ্গ, ঠাকুর গাও, দিনাজপুর অঞ্চলে) ৩) মানিক পীরের জারী (এ গানে এদের পূজা হয় বাড়ির ভেতরে গোয়াল ঘরের সামনে)	১) শিবগৌড়ি নাচ (পূর্ব ময়মনসিং) ২) অষ্টক গান (নড়াইল অঞ্চল)	১) মহরমের মিছিল ২) মাদার বাশের গান ৩) মাদারিয়া মিছিল (মাঘ মাসের পূর্ণিমার আগে বাশ কেটে লাল সালু দিয়ে পেঁচিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে নাচবে এবং গাইবে) ৪) বেড়া ভাসান (একটি কলা পাতার বেজন সংখ্যক দিয়ে ভেলা করে মসজিদের মতো করে। ওরসের মতো করে শিরনি দেয় খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে)	১) জারী গান (দঃ-পঃ বঙ্গে) ২) পাইল্যা যাত্রা (বগুড়া অঞ্চল) ৩) পাতিলা গান (সব কিছু আগে ঠিক করা থাকে) ৪) ছওয়াল জবাব (নড়াইল অঞ্চলে অনেকটা কবি গানের মত)।	১) পটুয়া গান (বিভিন্ন নাচ থাকতে পারে)-গাজীর একটি টুকরো গান এবং এর মাধ্যমে বিশেষ করে মেয়েদের বিধি নিষেধের আরোপ করে গাজীর সাথে মিলিয়ে গায়। ২) গাজীর পট (নরসিংদী অঞ্চল)	১) পুথি পাঠ ২) জারী গজল (সবাই গোল হয়ে বসে ইমাম হোসেনের কাহিনী গাওয়া হয়)

Dhaka University Institutional Repository

২.৩. লোকনাট্য হিসেবে পালাগান

সতেরো শতকে প্রধাণত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্থানীয় লোক কাহিনী অবলম্বনে ধর্মভাব মুক্ত এক ধরনের বর্ণনামূলক সাহিত্য রচিত হতে থাকে, যা এখন আমাদের কাছে ময়মনসিংহ গীতিকা নামে পরিচিত। আকারে মঙ্গল কাব্যের চেয়ে ছোট এই গীতিকাগুলি নশ্বর মানুষের বিয়োগাত্মক প্রেমের করুণ পরিণতি সম্পর্কে উচ্ছ্বাসিত ধারণায় পূর্ণ। মৌখিকভাবে সৃষ্ট ও প্রচারিত এ সব গীতিকা সর্বপ্রথম ১৯২৩ সনে সংগৃহীত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গীতকাগুলিতে মানবতাবাদ মানবীয় কামনা, বাসনা বলিষ্ঠ নারী চরিত্রের উপস্থিতি এবং ধর্মীয় নৈতিক বিধি বিধানের বিরূদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদ স্পৃহা পরিলক্ষিত হয়, তা একে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করে। সতেরো শতক থেকে এসব গীতিকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে জনসমক্ষে কথানাট্যের রীতিতেই উপস্থাপিত হয়ে এসেছে এবং সবার কাছে পালাগান নামে খ্যাতি লাভ করেছে।[২৮] এখানে বলে রাখা ভাল যে, অষ্টাদশ শতকে এসে সাহিত্যে প্রণয় কাহিনীর (ধর্ম নিরপেক্ষ) ধারা আরোও বিস্তার লাভ করেছিল। মুসলমান কবিরা বিশেষ করে এ ধরনের কাব্য রচনায় উৎসাহী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে যে সব কাহিনী প্রণয় কাহিনীর ধারাকে পুষ্ট করে, তার মধ্যে 'মনোহর মধুমালতী'র কথা উল্লেখযোগ্য। 'আলাওল'ও এ কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন। হিন্দীতে এ কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল। অন্য কাহিনীর মধ্যে বেশি পরিচিত ছিল বিক্রমাদিত্য-কাহিনী মালার 'বেতাল পচিশী' উপাখ্যান।

কিন্তু এ সব অপেক্ষা লোক-গাঁথায় যেসব প্রণয় কাহিনী গড়ে ওঠে সেগুলি বেশি লক্ষণীয়। ধারনা করা হয় মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে 'মানুষের লৌকিক জীবন' সাহিত্যের উপাদান রূপে গৃহীত হয়েছিল। এ প্রসংগে পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে কাহিনীগুলির অন্যতম আকর্ষণ হল বাস্তব মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। কাব্য সৌন্দর্য তাঁদেরও অনেক সময় অসামান্য, বিশেষ করে অধিকাংশ লোকগাথা কখনো লিখিত হয়নি। তাঁদের ভাষা এতো পরিবর্তিত হয়েছে যে, সেগুলিকে উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর রচনা বললেও ভুল হবে না। অধিকাংশ লোক-প্রিয় গাঁথা মানুষের মুখে মুখে চলেছিল এবং মুখে মুখেই তার বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে। সে সব গাথার মধ্যে রয়েছে মানুষের কথা, রূপকথা, ভক্তিমূলক গল্প ইত্যাদি। কিন্তু আসল কথাটা প্রায়ই প্রণয়ের গীত। যেমন- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র (চন্দ্রকুমার দে' সঙ্কলিত) গাথা সমূহ। এ সময় নাট্যকলার মূলধারা রূপে 'লৌকিক জীবনের প্রণয়' বিষয় হওয়াতে এটাকে অনেকে ভারতীয় নাট্যকলার অবনতির সময় বলে মনে করেন।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য যেখানে একান্তভাবেই ঈশ্বর কেন্দ্রিক, গীতিকাগুলিতে সেক্ষেত্রে রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষেরই রাজকীয় আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষত যখন আমাদের সমাজে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না একেবারেই, পরিণামে সকল বিষয়েই পুরুষের অনুশাসন মেনে চলতে গিয়ে আমাদের নারীরা পুরুষের হাতের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছিল। তদুপরি সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-বেহুলার দৃষ্টান্তে স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে গ্রহণ করায় অন্য একটি আদর্শ গড়ে উঠেছিল। সেই প্রেক্ষিতে ভারতীয় নারী যখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একান্তভাবে পরভূতিকায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তখন বিস্ময়কররভাবে গীতিকার নারী চরিত্রগুলি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল হয়ে ওঠে। যার ফলে, তা সহজেই একান্তভাবে অসচেতন পাঠকের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে। আমরা জানি, গীতিকাগুলির রচয়িতারা সকলেই পুরুষ, অথচ অকপটে তাঁরা নারীর মহিমাকে বড় করে তুলেছেন। নায়িকা চরিত্রগুলির তুলনায় নায়ক চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ, ম্রিয়মান, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, আদর্শ ভ্রষ্ট এবং অকৃতজ্ঞরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিপরীতে গীতিকার নায়িকা চরিত্রগুলি ত্যাগে, তিতিক্ষায়, বিরল কর্তব্য পরায়নতায়, কৃচ্ছসাধনে, অসাধারণ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় ক্রমে তারা গীতিকাগুলির মুখ্য আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। নারী চরিত্রগুলির বিবিধ বিরল গুণের মূলে তাঁদের অন্তরের অমোঘ প্রেম শক্তিকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অধিকাংশ গীতকাগুলিতেই ঈশ্বর অনুল্লেখিত থেকে গেছেন বিস্ময়করভাবেই। যেখানে উল্লিখিত হয়েছেন সেখানেও বন্দনা গানে যান্ত্রিকভাবে, অথবা বিভিন্ন সময়ের পূজার্চনা, সামাজিক রীতির বিবরণ দান প্রসঙ্গে দু-একজন দেব-দেবী উল্লিখিত হয়েছেন।[২৯]

আঠারো শতকে এসে ভারতীয় নাট্যকলা সাধারণভাবে উন্নতির পথ থেকে সরে গিয়ে কেন অবনতির পথে বাঁক নিলো? এই প্রশ্নের উত্তরে কবিয়ান বাওয়ার মনে করেন, "মানবীয় আবেগ-অভিজ্ঞতার বিশাল পরিসরকে উপেক্ষা করে কেবল প্রেম সম্পর্কের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আত্মমগ্ন থাকাই এই অধোগামিতার কারণ।[৩০] এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, অধিকাংশ গীতিকা বা পালাগুলি প্রণয়ের, তাও আবার প্রাক্‌বিবাহ, পূর্বের প্রণয় কেন্দ্রিক রচনা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের

---

[২৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭

[২৯] বরুণ কুমার চক্রবর্তী, গীতিকাঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪

[৩০] পূর্বোক্ত, ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

লোককবিরা যে অসাধারণ সংযম ও শালীনতাবোধ রক্ষা করে এইসব বিবরণ দান করেছেন, তাতে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনা। উল্লেখ্য যে, তাঁদের কেউই সহজলভ্য জনপ্রিয়তার পথ অবলম্বন করেননি। বলা হয় গীতিকা রচয়িতারা নাকি সব নিরক্ষর কবি ছিলেন।[৩১] সেক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তবে এসব কবি গীতিকাগুলি রচনার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় শিল্পগুণের পরিচয় দিলেন কিরূপে? এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমরা সাহিত্য কাকে বলব? এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ভালোবাসার প্রবলতা জানাবার চেষ্টায় মন যখন আঁকুবাঁকু করে তখন প্রকৃতপক্ষে যে-কথাটা অসত্য, ভাবের পক্ষে সেটাই সত্য হয়ে ওঠে। তখন বলবার কথাকে বাঁকিয়ে বাড়িয়ে, সাজিয়ে তার সহজ অর্থকে অস্পষ্ট করে দিয়ে সাহিত্য আপন কাজ চালায়। ঠিকমত এ কাজটি করতে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার দরকার পড়ে। মুখ্যত ভাব প্রকাশের এই ভাষাবাহন হচ্ছে সাহিত্য।[৩২] আর এই সাহিত্য যদি হয় 'লোক' সৃষ্টি তাহলে তা অবশ্যই 'লোকসাহিত্য'। 'লোকসাহিত্য' রূপে পালা বা গীতিকার শিল্পমান বিচারে প্রথমেই দেখতে হয় তার শিল্পসম্মত প্রকাশ ভঙ্গী। গীতকাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যায়; এগুলির রচয়িতারা নিরক্ষর হলেও অশিক্ষিত ছিলেন না, ছিলেন না শিল্প সম্মত প্রকাশভঙ্গীর ব্যাপারে অসচেতন। বস্তুতপক্ষে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য গীতিকাগুলিতে অনুসৃত হয়েছে যাতে রচনাগুলি যেমন আকর্ষণীয়, বৃদ্ধি পেয়েছে এর শিল্পোৎকর্ষ, তেমনই সঞ্চারিত হয়েছে এগুলির বিচিত্রতা, যা পাঠক তথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে তৃপ্তিদান করতে পারে। গীতিকাগুলিতে রচয়িতারা তাঁদের সংযম শক্তির প্রমাণ রেখেছেন বিশেষত দীর্ঘ সময়ের জন্য আবশ্যক নয় এরূপ বিবরণকে তারা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। যেমন-

মহুয়া পালায়-

এক দুই তিন করি মাস গুয়াইল
বামনকান্দা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল॥[৩৩]

কমলা পালায়-

এক দুই করি দেখ তের বছর যায়
আমার বিয়ার কথা কয় বাপ মায়॥[৩৪]

অবলীলাক্রমে দীর্ঘ এক বছর, তের বছর বা ষোল বছরের ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে-অল্প কথায় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানকে হ্রাস করার এ কৌশল গীতিকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

গীতিকার নিরক্ষর কবিরা কালিদাসের মত আলোকসম্ভবা কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না ঠিকই, তথাপি তাঁদেরও দেখা গেছে পশু-পাখী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছপালা, এমনকি বনের 'কুড়া'কে (বিশেষ ধরনের পাখী) দূত রূপে নিযুক্ত করতে। কখনও নায়ক নায়িকার সন্ধান লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে তাঁর জ্ঞাতব্য সংবাদাদির জন্য 'কুড়া'কে দূত রূপে নিয়োগ করেছে, কখনও বা নায়িকা তাঁর দয়িতের সন্ধান লাভের জন্য শরণাপন্ন হয়েছে পাখী, তরুলতা, বাঘ, ভাল্লুকের মত হিংস্র প্রাণীর। যেমন : মহুয়া পালায়-

উইরা যাওরে পশুপক্ষী নজর বহুদূর।
এই না পন্থে বাইদ্যার দল গেছে কতকদূর॥[৩৫]

আমরা এখানে সর্বপ্রাণবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করি। সর্বপ্রাণবাদের প্রতিফলন লভ্য অন্যত্রও; গীতিকার নায়ক এবং নায়িকা তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, সংকল্প ইত্যাদির কথা 'চন্দ্র-সূর্য' কিংবা 'দিবস-রজনী', ইজল গাছকে উদ্দেশ্য করে :

মহুয়া পালায়-

চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী॥[৩৬]

---

[৩১] পূর্বোক্ত, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৪

[৩২] নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, বাংলাসাহিত্যের কথা, কলিকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ২৬

[৩৩] সৈয়দ আক্তিজুল হক, মৈমনসিংহ গীতিকা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩

[৩৪] ঐ, পৃ. ১২৬

[৩৫] ঐ, পৃ. ২৩

[৩৬] ঐ, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকা পাঠযোগ্য বলে দর্শকগণ তা থেকে রসস্বাদনে সক্ষম হন। উপস্থাপিত চরিত্রগুলির বর্ণনা ও প্রশ্নোত্তরমূলক কথোপকথনে এর কাহিনীর সম্প্রসারণ ঘটে থাকে। গীতিকাগুলি গেয় বলে এর রচয়িতারা খণ্ড খন্ড পালারূপে কাহিনীর ভেতরের চরিত্রগুলিকে একের পর এক দর্শকের সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। দর্শক কাহিনীর ভেতরের অনুসৃত ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। পাশ্চাত্য সমালোচক গীতিকায় অনুসৃত এই রীতিকে কাহিনীর অপ্রাসাঙ্গিকতা দোষ থেকে মুক্ত হয়ে উপস্থাপিত হয় বলে মত প্রকাশ করেন-

> 'A large proportion of popular ballads tell their stories almost entirely through questions and answers. As in the opistolary novel, our information about events is limited to what we are told by the participants. Because the story is stripped of irrelevancies, the result can be highly dramatic.'[৩৭]

মনীষী রোমারোলা, কিংবা জর্জ গ্রীয়ারসন, উইলিয়াম রোদেন স্টাইন মদিনা, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও নীলা ইত্যাদির কাহিনীর রসাস্বদনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মার্কিন লেখক নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম ডি. এ্যালেন বলেছেন, "গীতিকাব্যগুলি পড়িয়া মনে হইল বঙ্গদেশ এখনও তাঁহার যৌবন হারায় নাই।"[৩৮] শিল্পাচার্য রদেনস্টাইন বলেন, "এই পালাগানের নায়িকাগুলির চরিত্র পাঠ করে মনে হচ্ছে যেন অজন্তা গুহার চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ইহাদের লীলায়িত ভঙ্গি ও লাস্যের মনোহারিত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে"। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ ময়মনসিংহের পল্লীকবি মনসুর বয়াতীর রচনা 'দেওয়ানা মদিনা'র ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে বলেন, মদিনার চরিত্র-চিত্রণে যে অপূর্ব গ্রাম্যশ্রী ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে, তা কোন কৃষক কবির নিকট হতে আমি প্রত্যাশা করিনি।"[৩৯] হগম্যান বলেছেন, "নায়িকাগুলি শেক্সপীয়র ও রেইনীর স্ত্রী চরিত্রের মত ইউরোপের ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। আমি এবং ম্যাতামসিলা এভিলইন রোলাঁ (রোমাঁ রোলাঁর ভগিনী) পল্লীগীতিকাগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিতে চাই। প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ আমি ভারতবর্ষের সাহিত্য পড়িয়া আসিতেছি, কিন্তু হঠাৎ যে এমন অপূর্ব জিনিস পাইব, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না।"[৪০] তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, "মেটারলিঙ্ক ও ফরাসীর সর্ব প্রধান লেখক বা নায়ক-নায়িকা অপেক্ষা বাংলা পল্লীগীতির নায়ক-নায়িকারা শ্রেষ্ঠ, ইহাদের সৌন্দর্য সর্বকাল স্থায়ী, বরং যুগে যুগে সমালোচকগণ ইহাদের নূতন নূতন সৌন্দর্য আবিষ্কার করিবেন।"[৪১]

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হল 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বা 'পালা' সম্বন্ধে কয়েকজন বিদেশী বিশেষজ্ঞের অভিমত, যারা গীতিকাগুলির কাহিনী পাঠ করে এর রসস্বাদনে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এগুলি যখন আমাদের সামনে পালাগান আকারে গায়েন বা বয়াতী পরিবেশন করেন অথবা যখন আমরা গায়েন বা বয়াতীর পালা পরিবেশনার সময় তাঁদের সামনে উপস্থিত হই তখন আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশিত পালাগানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে : জানুয়ারী ১৯৯৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগে এম. এ শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস-প্রোডাকশন হিসেবে 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালা বেছে নেয়া হয়। এর অভিনয় উপস্থাপন পদ্ধতি সম্পর্কে কিশোরগঞ্জের নবীন পালাকার ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর কাছ থেকে সরাসরি হাতে-কলমে শিখে রপ্ত করে নেয়া হয়। শিক্ষানবিশ ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের নবলব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে মঞ্চে তার (কমলারানীর সাগরদীঘি) প্রয়োগ ঘটায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার বিভিন্ন মঞ্চে পালাগানটির কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার পরে, ঐ বছরই (জানুয়ারী ১৯৯৮) কলকাতার নান্দীকার নাট্যোৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পালাগান প্রদর্শনের ডাক পরে। সেখানে পালাগান মঞ্চস্থ হবার পরে কলকাতার নামকরা বাংলা পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় যে সকল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রিকা সানন্দার রিপোর্টটি এরূপ-

> "আঙ্গিক ও সৌষ্ঠবের দিক থেকে দেখলে নান্দীকার নাট্যোৎসবের দুটি প্রযোজনা অবিস্মরণীয়। তুল্যমূল্য বিচারে এই প্রতিবেদকের কাছে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও সঙ্গীত বিভাগের প্রযোজনা 'কমলারানীর সাগরদীঘি'। মৈমনসিংহের পুরাণ লোককথা বাঁধা হয়েছে পালাগান ফর্মে। বাংলাদেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের পাঠ্যক্রমে এই পালাটি রেখেছে নাটকের বিভাগে। প্রাচীন

---

[৩৭] বরুণ কুমার চক্রবর্তী, গীতিকা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য,কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫

[৩৮] ড. আশরাফ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড, মুক্তধারা, ঢাকা পৃ. ৮৩

[৩৯] রওশন ইজদানী, মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৪, পৃ. ৫৭

[৪০] পূর্বোক্ত, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, পৃ. ৮২-৮৩

[৪১] ঐ, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পালাকারদের সঙ্গে কর্মশালার ভিত্তিতে প্রথম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রযোজনা বানিয়েছেন (যিনি রিপোর্টটি করেছেন তিনি সম্ভবত ভুলবশত প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা এম.এ ক্লাশের ছিল)। ছাত্র-ছাত্রীদের নিষ্ঠা তো আছেই, উপরন্তু খোলা মাঠের বা অঙ্গনমঞ্চের সম্পদকে প্রোসেনিয়ামে নিয়ে আসার জন্য জামিল আহমেদের মতো পাকা মাথার মঞ্চ নির্দেশকের অভিভাবকত্ব সেই নিষ্ঠায় এনেছে গ্ল্যামার, সরলতার সঙ্গে আধুনিকতার সমীকরণ। মঞ্চ জুড়ে চারটি বাঁশের ছকবন্দি চতুষ্কোণ, তাতে শঙ্খশুভ্র নকশার ঢেউ তোলা। ডানদিকে বাঁদিকে বসে ছাত্র-ছাত্রীর দল-ঠিক যেমন করে দর্শক বসতেন প্রাচীন বাংলার পালাগানে। মঞ্চের পিছন দিকে সামান্য উঁচু চবুতরা, সেখানে দোহারের দল বসে। প্রথম বর্ষের সাইদুর রহমান এ নাটকের একক পালাকার। কত বয়স ওঁর? বছর কুড়ি-বাইশ...কী চমৎকার তাঁর অভিনয়! কী সাবলীল অভিব্যক্তি! কী দুরন্ত শিক্ষানবিশী! বাংলাদেশের এক স্বার্থপর বাতিকগ্রস্ত স্বামীর খামখেয়ালে নিগৃহীত এক দুঃখিনী রাজকন্যার জীবননাট্য অভিনয় করেন সাইদুর। ক্ষণে ক্ষণে চরিত্র থেকে চরিত্রান্তরে চলে যান তিনি। বদলে যায় গলার কারুকাজ, অঙ্গভঙ্গি, মায় গোটা ব্যক্তিটাই। অসামান্য পরিশ্রমঋদ্ধ এই ডকুমেন্টেড থিয়েটার!"[৪২]

এছাড়াও 'দ্য এস্টেটম্যান ফ্রাইডে' (ইংরেজী পত্রিকা), 'দ্য টেলিগ্রাফ ফ্রাইডে' (ইংরেজী পত্রিকা), 'দ্য এশিয়ান এজ' (ইংরেজী পত্রিকা), 'নাট্য মুখপত্র' পত্রিকা, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'সহ ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় সুপ্রশংসা জড়িত মনোমুগ্ধকর রিপোর্ট প্রকাশ করে। ইংরেজী 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার এখানে উল্লেখ করা হলো-

> "Most remarkably, however, Mohammaed Sydur Rahman's virtuosic and androgynous two hour one man show (as the typical Palagan actor-singer-dancer seguing in and out of all the roles, simultaneously gripping the viewers' attention with his strategic breaks in storytelling) is absolutely unforgattable, all the more so because he is still just a student. Shourav makes an equaly fine foil as his call and response partner seated with the musicians. And Rashedul Huda's setting, with audience sitting cross-legged on the stage itself, gives the genre a perfect aura of metadrama in the context of the modern auditorium which after all, is an imported theatre space."[৪৩]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, পাঠ্য হিসেবে গীতিকা রসাস্বাদনে যতটা কার্যকরী, তার পালাগান রূপ পরিবেশনা রসাস্বাদনে আরোও বেশি কার্যকরী। কেননা পালাগান পরিবেশনার মধ্যে আমরা পাচ্ছি দৃশ্য ও সঙ্গীত ব্যবহারের প্রয়োগ। সেক্ষেত্রে ময়মনসিংহ গীতিকা বিশেষজ্ঞ 'হগম্যান' ময়মনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার সূত্র ধরেই বলা যেতে পারে যে, গীতিকা যেমন পাঠ্য হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হওয়ার যোগ্য তেমনি পালাগানের পরিবেশনা আধুনিক আন্তর্জাতিক প্রযোজনায় তদ্রূপ বা তদূর্ধ সমাদৃত হওয়ার যোগ্য।

---

[৪২] সানন্দা, ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৮ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৫৪

[৪৩] THE TELEGRAPH FRIDAY, 26 December, 1997

Dhaka University Institutional Repository

৩. পালাগানের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, রীতি ও শ্রেণীবিভাগ

বাংলা লোকনাট্যে 'পালাগান' একটি স্বতন্ত্র রীতি হিসেবে চিহ্নিত। পালাগানের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, রীতি ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনার এ অংশে নিম্নোক্ত উপায়ে আলোচ্য বিষয়গুলিকে ভাগ করা যেতে পারে :

১. পালাগানের সংজ্ঞা, ২. স্বতন্ত্র রীতি হিসেবে পালাগান।

৩.১. পালাগানের সংজ্ঞা

পালাগান বলতে সাধারণভাবে পল্লীগীতিকাকেই বোঝানো হয় অর্থাৎ পল্লীগল্পকথার বৈঠকী গান। ইংরেজীতে যাকে Cante Fable বলা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে 'কাঞ্চনমালা', 'কাজলরেখা' ও 'মধুমালা' প্রভৃতি গীতিকা পালারূপে গাওয়া হত। ইংরেজীতে যেমন- জুডাস, বারবারা, এলেন, দি জিপসী লেডী ইত্যাদি। জনজীবনে প্রচলিত লোকনাট্যের আসরে পরিবেশিত বা আখ্যানধর্মী যেকোন লোকসংগীতের উপস্থাপনাকেই 'পালা'রূপে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন- 'যাত্রা পালা', 'মৈষালবন্ধুর পালা', 'পদ্মাপুরাণ পালা', 'ঝাপান পালা', 'বিষহরির পালা', 'পালা কীর্তন' বা 'কীর্তন পালা', 'ভাসান পালাগান', 'পালাগান' ইত্যাদি। উপরিউক্ত বিভিন্ন লোকনাট্যের পরিবেশনা রীতি ভিন্ন রকম হলেও এসব বিভিন্ন লোকনাট্যের সাথে 'পালা' শব্দটির যথেচ্ছা ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে 'পালা' শব্দের আভিধানিক অর্থ নিরূপণের চেষ্টা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'পালা' বলতে; [{সং পর্যায়> প্রা পল্লাঅ> বা (পল্লা) পালী; অস পালী}, পালা শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্যায়ানুসারে রচিত মঙ্গলকাব্যের গেয় বিষয় বা গান (মঙ্গল বারের পালা আরম্ভ কবি কঙ্কন-চণ্ডী। বঙ্গবাসী; স্থাপনা পালা সমাপ্ত ২৮; দিবাপালা; নিশাপালা ৭৩। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। বঙ্গবাসী][৪৪]

'পালা' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ড. অজিতকুমার ঘোষ অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, আসামের 'পালি' শব্দ থেকে 'পালা' শব্দের উৎপত্তি। তিনি বলেন, 'পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ নাটকের উদ্ভবের আগে 'ওঝা পালি' নামে এক প্রকার সম্মিলিত সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। এই সঙ্গীত মিশ্রিত নৃত্যে 'ওঝা' অথবা দলনেতা নানারকম অঙ্গভঙ্গিসহ কিছু ছড়া আবৃত্তি করে এবং 'পালি' অথবা 'সহযোগীবৃন্দ' করতাল বাজিয়ে পদচারণাসহ গান গাইতে থাকে এবং 'ডায়েনা পালি' অথবা 'প্রধান সহযোগী' দলনেতার সঙ্গে কথোপকথনের রীতিতে কবিতাগুলি ব্যাখ্যা করে দেয়। ঢুলিয়া অথবা ঢোল বাজনদারদের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেও লোকনাট্যের উপাদান সন্ধান করে পাওয়া যায়। উৎসব উপলক্ষে তারা নানারকম শারীরিক কসরত দেখাত এবং স্থূল নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করত'।[৪৫] 'পালা' বিষয়ের উপরিউক্ত আলোচনায় প্রচলিত পালাগান রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্ট হয়েছে। তদুপরি 'পালা' বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের মতামত আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে, 'পালা' শব্দের তাৎপর্য নিরূপন করতে গিয়ে ড. সেলিম আল দীন বলেন, "পালা : সাধারণ অর্থে পরিবেশন যোগ্য কাহিনী, কোন বিস্তৃত কাহিনীর বিশেষ অংশ। মঙ্গলকাব্যে দিনে পরিবেশিত কাহিনী পর্ব দিবাপালা ও রাত্রে পরিবেশিত কাহিনী নিশাপালারূপে অভিহিত হয়। পালার অন্য নাম 'পাট', যেমন-ধোবার পাট।"[৪৬] প্রসঙ্গক্রমে আরো জানা যায়, পালি : দোহার, অসমীয় ভাষায় সর্বত্র এবং কখনো কখনো বাংলায় দোহার অর্থে 'পালির' ব্যবহার দেখা যায়। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, প্রভৃতি জেলায় পালি অর্থে 'পাইল' উক্ত হতে দেখা যায়, যেমন- পাইলের গান (দোহারের গান)। এবং পালি গান : পালি অর্থাৎ দোহরদের দ্বারা পরিবেশিত গান। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পালি গানের উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে 'দোহার' শব্দের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তাহলো; দোহার : সমবেত কণ্ঠে গানের নিমিত্তে আসরে অবতীর্ণ গায়কবৃন্দ। পাঁচালি, কথকতা, লীলানাট্য, লীলাকীর্তন, যাত্রা, ঘাটুগান, গাজীর গান, জারী, আলকাপ, প্রভৃতি নাট্যে গায়েনের পিছনে অথবা মঞ্চের মধ্যস্থলে উপবেশনকারী দলীয় গায়কগণ।

দোহারের দুটি ভাগ : (১) আগ দোহার এবং (২) পাছ দোহার। দোহারের মধ্যে যিনি চরিত্র, গায়েন, কথকের গানের অংশে যিনি দোহারদের পাইল ধরার গানে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তিনি আগ দোহার, আর বাকিরা পেছনে বসে গানের পাইল ধরে বলে তারা পাছ দোহার।

---

[৪৪] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড প-হ, পৃ. ১৩২২

[৪৫] পূর্বোক্ত, ড. অজিতকুমার ঘোষ, পৃ. ১৩২

[৪৬] ড. সেলিম আল দীন, বাঙলা নাট্যকোষ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ২১৮-২১৯

Dhaka University Institutional Repository

কৃত্য শ্রেণীর পাঁচালি-নাটে দোহারগণ সমান্তরাল বা অর্ধবৃত্ত আকারে গায়েনের পেছনে অবস্থান নেয়। জারি, কুশান যাত্রা, প্রভৃতি নাট্যে দোহারদল পরস্পর সংলগ্ন, বৃত্তাকারে মঞ্চের মধ্যস্থলে বসে। দোহারদের মধ্যে প্রায় সকলেই গান ছাড়া অল্পবিস্তর কোন না কোন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকে। তবে প্রতিদলে ঢোল বাদনকারীর ভূমিকা সুনির্দিষ্ট। মন্দিরা, করতাল ইত্যাদি এ হাত থেকে সে হাত ঘুরে থাকে।

দোহারের মধ্যে, কৃত্য শ্রেণীর পাঁচালিতে আগ দোহারের সঙ্গে, 'ঠ্যাটা' নামে একটি চরিত্র থাকে। এখানে 'ঠ্যাটা' বলতে; তর্কপটু, তর্কবাগীশ অর্থ বোঝায়। পালা বা পাঁচালিতে দোহারদলে অবস্থানকারী 'ঠ্যাটা' ব্যক্তি গায়েনের সঙ্গে নাট্যের প্রাসঙ্গিক অথবা প্রসঙ্গ বহির্ভূত বিষয় নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই তর্ক বহুস্থলে অনাবিল হাস্যরসের অবতারণা করে এবং মূল কাহিনী থেকে দর্শককে সরিয়ে এনে খানিকক্ষণের জন্য অবসর দান সাহায্য করে। ঠ্যাটা ঠিক কাহিনীর কোন অংশে বা প্রসঙ্গে গায়েনকে খানিক অবসর দিয়ে নিজেই তাঁর তর্কের পক্ষে দৃষ্টান্ত রূপে ভিন্ন একটি কৌতুকাবহ মিশ্রিত গল্পের অবতারণা করে। অনেক সময় গায়েন কোন অংশ ভুলবশত এড়িয়ে গেলে ঠেটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দ্বারা তার খেই বা বচন সূত্র ধরিয়ে দেয়। সে কখনো কখনো নানা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দ্বারা কাহিনীকে এগিয়ে নিতেও সাহায্য করে। জামাল-কামালের পালা থেকে ঠেটার যৌক্তিক প্রশ্নের একটি অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

গায়েন	:	আচ্ছা তা হলে কি একরাত্রে মাতৃগর্ভে একটি সন্তান সৃষ্টি হয়?
ঠেটা	:	তা গায়েন সাব, কোন কোন দিনে কি গঠিত হইতাছে।
গায়েন	:	সোমবারেতে নিতি, মঙ্গলবারেতে নাভি, বুধবারেতে বত্রিশ নাড়ী, বসাইছে সারি সারি। বিষ্যুদবারে দিছে আল্লা মুখেরই গঠন, শুক্রবারে দান করেছে আল্লা চক্ষু নিরাঞ্জন। শনিবারেতে...রবিবারেতে মাথা।

এই সাত দিবসে জনম হইল, জন্মের নাই আর কথা। তাহলে সাতদিনে শিশুর দেহ গঠন হয়, দশদিন মাতৃগর্ভে রয়। কিভাবে রয়-

ঠেটা	:	কি ভাবে রয়?
গায়েন ও দোহার	:	প্রথম মাসের কালেতে উত্তম রহে নীর। ...ইত্যাদি।"[৪৭]

দোহার বাংলা লোকনাট্যে অপরিহার্য অঙ্গরূপে সহস্র বৎসরের ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান। এর উৎপত্তির বীজ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কম্যুনিটি বা গোষ্ঠীগত সঙ্গীত চেতনার ধারায় সুপ্ত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে দোহার 'পালি' রূপে এবং পালাগান 'পালিগান' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) নামে পরিচিত ছিল। মানিকদত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলে'ও 'পালি'র উল্লেখ পাওয়া যায়-

: তম্বুর বায়ন তথা দিল দরশন।
রঘুরাঘব পালী আইল দুইজন।
তিন চারিজনে তবে সম্প্রদা করিল।
কলিঙ্গ নগরে দত্ত আসি উত্তরিল॥[৪৮]

পালি (পালী) অসমীয় ভাষায় দোহার অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মনে হয় বাঙলা থেকেই 'পালি' শব্দটি উত্তরকালে আসামে গৃহীত হয়েছিল।

নাট্য-গীতের কৌশল হিসেবে মধ্যযুগীয় নাট্যে 'দোহার পদ্ধতি'কে একান্ত আঙ্গিকরূপে গৃহীত হতে দেখি। নাট্যের আসরে সমবেত কণ্ঠ বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছায়। দোহারের কারণে মূল গায়েন নৃত্য ও অভিনয়ের একটানা ভার থেকে মুহূর্তের জন্য খানিকটা অবসর নেবার সুযোগ পায়। আবার অন্যদিকে অনেকগুলি গান গেয়ে অভিনয় করা মূল গায়েনের একার পক্ষে কষ্টকর হওয়াতে সমবেত কণ্ঠে জোরালো রূপে প্রকাশের জন্য দোহারেরও প্রয়োজন হয়।

পালাগানের সংজ্ঞা নিরূপণে উপরিউক্ত আলোচনায় এর যে সার্বিক চিত্র পেয়ে থাকি তাতে দেখা যায়, এর মধ্যে একজন মূল গায়েন থাকেন, যিনি সমস্ত অংশটি একাই নেচে-গেয়ে পরিবেশন করেন। সংলাপাত্মক অংশে সাহায্যের জন্য দোহারদের মধ্যে একজন প্রধান সহযোগী ('ডায়েনা পালি' বা ঠ্যাটা) থাকেন এবং গানের সমস্ত অংশে দোহারবৃন্দ বাদ্যযন্ত্র সহকারে গানের পাইল ধরে থাকে।

---

[৪৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

[৪৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৩.২. স্বতন্ত্র রীতি হিসেবে পালাগান

বহু আগে থেকেই বাংলা লোকনাট্য পালাগান রূপে বিভিন্ন রীতির অভিনয় প্রচলিত হয়ে এসেছে। অভিনয় কাঠামো ও উপস্থাপনা রীতির দিক থেকে এদের সবার বৈশিষ্ট্য একই রকম নয়। পালাগানের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, রীতি ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় বর্তমানে পালাগান নামে যেসব অভিনয় রীতি প্রচলিত রয়েছে সে সম্পর্কে এবং এর সাথে বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক থেকে মিল রয়েছে এরূপ কয়েকটি নাট্যরীতির আলোচনা এ অংশে তুলে ধরা হলো।

৩.২.১. পালাগান (পূর্ব ময়মনসিং অঞ্চল)

পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে 'পালাগান' নামে একটি স্বতন্ত্র নাট্যরীতির অভিনয় লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র আনন্দ বিনোদনের উদ্দেশ্যে এই রীতির অভিনয় পরিবেশিত হয়ে থাকে।

পৃষ্ঠপোষকতা : পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ মিলে চাঁদা তুলে সমষ্টিগতভাবে এই পরিবেশনার আয়োজন করে। সাধারণত শুকনো মৌসুমে গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে কোন উপলক্ষ যেমন- ঈদ, দূর্গাপূজা, কালী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, চৈত্র সংক্রান্তি এবং পৌষ মেলাতে এই গানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও শহুরে এলাকায় যেমন- ঢাকা শহরে বিভিন্ন বিশেষ দিবস (বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস, শুভ নববর্ষ, ১লা বৈশাখ ইত্যাদি) উদ্‌যাপন উপলক্ষে পালাগানের দলকে বায়না করে থাকে।

দল পরিচিতি : দল পরিচালনার জন্য পালাগানের দলে একজন দলপতি থাকেন। প্রতি দলে কমপক্ষে প্রায় পাঁচজন করে দোহার থাকে এবং এরা একই সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রও বাজিয়ে থাকে। পালাগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে হারমোনিয়াম, ঢোল-তবলা অথবা দুটোই, চটি, করতাল, দোতারা এবং বাশের বাশীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। খুব কমক্ষেত্রেই বয়াতী সার্বক্ষণিক অভিনেতা হিসেবে কাজ করে থাকেন। এদের দলের বেশিরভাগ অভিনেতারা ছোট বেলা থেকেই পেশা হিসেবে চাষাবাদ, রিক্সাচালনা অথবা দিনমজুরসহ অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত। পালাগানের এরূপ একটি দলের দলনেতা ও মূল গায়েন হলেন ইসলাম উদ্দিন বয়াতি, বয়স-৩৫ বছর, গ্রাম-নোয়াবাদ, থানা-করিমগঞ্জ, জেলা-কিশোগঞ্জ। ইসলাম উদ্দিন বয়াতির ওস্তাদ : কুদ্দুস বয়াতি (কেন্দুয়া, নেত্রকোনা)। তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন : মোহাম্মদ আলীম (ডায়না ও বংশী বাদক-বাশের আড় বাশী), মো: মোসলেম উদ্দিন (হারমোনিয়াম মাষ্টার), মো: জর্জ মিয়া (ঢোল বাদক), মো: আব্দুল কাদের (করতাল) ও মোহাম্মদ জব্বার (চটি)। এদের প্রত্যেকেই একইসাথে দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীর কাজ করে থাকে।[৪৯] এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সংগঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার 'কমলারানীর সাগরদীঘি' নামে একটি পালা পরিবেশন করে থাকে। তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ জামিল আহমেদের তত্ত্বাবধানে কিশোরগঞ্জের তরুণ পালাকার ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর দ্বারা সরাসরিভাবে চৌদ্দদিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার ভিত্তিতে এই পালাভিনয় রপ্ত করা হয়েছিল। এখনও শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালাগানটি পরিবেশিত হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটারের 'কমলারানীর সাগরদীঘি'তে অংশগ্রহণকারী কলাকুশলীরা হলেন, মূল গায়েন-সাইদুর রহমান, ডায়না-সাজাহান সিরাজী সৌরভ, হারমোনিয়াম-ইভাসাহা/কমল

পালাগান, চিত্র নং ১

[৪৯] সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ইসলাম উদ্দিন বয়াতী ও তাঁর দল, টিএসসি সেমিনার (৩য় তলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

পালাগান, চিত্র নং ২

খালিদ, ঢোল- আলীম আল রাজী, মন্দিরা-ক্ষীতিশ পাল, চটি-রোকসানা পারভীন রুমা, করতাল-গোলাম ফরিদা ছন্দা, বাঁশী-রনি (চিত্র নং ৩)।[৫০]

ইসলাম উদ্দিনের কাছ থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণে 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পরিবেশনায় সাইদুর রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার) ও ইসলাম উদ্দিনের গানের সুর ও অভিনয়ের প্রায়োগিক দিক প্রায় একই রকম। সে কারণে ইসলাম উদ্দিন বয়াতি পরিবেশিত 'কমলারানীর সাগরদীঘি'র আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এর পরিবেশনার ছবি দেয়া হল। এছাড়াও মোজাম্মেল হক বয়াতী (গ্রাম-কাশেরচর, ইউনিয়ন- মহানন্দ, থানা+ জেলা- কিশোরগঞ্জ), কুদ্দুস বয়াতী (কেন্দুয়া, নেত্রকোনা অঞ্চল), আলাউদ্দিন বয়াতী পালাগান পরিবেশন করে থাকেন।

পালাগানের আসর ও অভিনয় উপস্থাপন : পালাগান সাধারণত ১৮" থেকে ২৪" উঁচু এবং ১২'×১৬' আয়তাকৃতির মঞ্চরূপ আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে (লেখচিত্র নং ১)। আসরের চার কোনায় চারটি বাঁশ বা খুটি মাটির উপরে উলম্বভাবে স্থাপন করা হয় যার সাহায্যে মাথার উপরে চাঁদোয়া বা সামিয়ানা টাঙানো থাকে। অনেক সময় আসরের চার কোণে বা যেকোন বিপরীত দুই পার্শ্বে এবং উপরে আড়াআড়িভাবে রাখা বাঁশের সাথে হ্যাজাক লাইট অথবা বৈদ্যুতিক বাল্ব ঝোলানো থাকে। দোহার বা যন্ত্রীদল আয়তাকৃতির আসরের অপেক্ষাকৃত অধিক লম্বা দিকের যেকোন এক পার্শ্বে আসরে উপবেশন করেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দর্শকগণ আসরের তিন দিকে ঘিরে মাটির উপরে খড় বিছিয়ে বসে থাকেন। তবে কখনও কখনও দর্শকদেরকে আসরের চতুর্দিকে ঘিরে বসতে দেখা যায়।

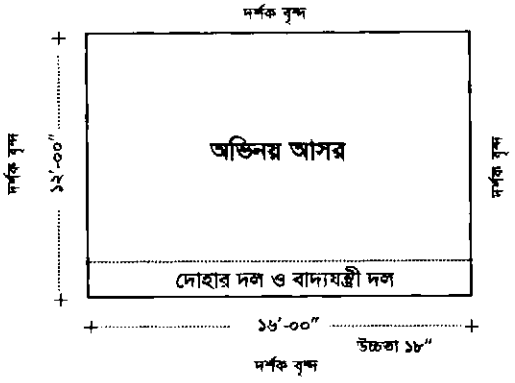

পালাগান (পূর্ব ময়মনসিং অঞ্চল)
লেখচিত্র নং ১

কুদ্দুস বয়াতীর ক্ষেত্রে (কেন্দুয়া, নেত্রকোনা); তিনি গাঢ় কমলা রঙের (একরঙা) একটি লুঙ্গি, একটি পাঞ্জাবী (এক তৃতীয়াংশ জামার আস্তিন) এবং কোমড়ে একটি শাড়ী পেঁচিয়ে অভিনয় করে থাকেন (চিত্র নং ২)।

আলউদ্দিন বয়াতীর দোহারেরা আসরের পূর্ব অথবা দক্ষিণ দিকে বসে থাকে। আলাউদ্দিন বয়াতী তাঁর অভিনয় আসরের উত্তর অথবা পশ্চিম পার্শ্বে একটি অতিরিক্ত বাঁশ নির্দিষ্টভাবে স্থাপন করে রাখেন। অভিনয়ের সময় এই বাঁশটিকে তিনি কখনও উপরের তলায় ওঠার সিড়ি, কখনও গাছ, কখনও জানালা রূপে ব্যবহার করে থাকেন। পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে তাঁর দোহারদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বাধাধরা নিয়মের বালাই নেই। দোহারেরা লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, পায়জামা ও শার্ট ইচ্ছে মতো পরিধান করে মঞ্চে উপবেশন করে থাকেন।[৫১]

কিন্তু কিশোরগঞ্জের ইসলাম উদ্দিন বয়াতির (কুদ্দুস বয়াতীর শিষ্য) দলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ভিন্ন রকম। তিনি রূপালী নক্সা করা আকর্ষণীয় নীল রঙের কামিজ, মেরুন রঙের ঘাঘরী এবং সবুজ পায়জামাসহ কোমড়ে একটি শাড়ী পেঁচিয়ে অভিনয় করেন (চিত্র নং ১, ৪, ৫)। কোমড়ে পেঁচানো শাড়ীর ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন কম্বিনেশন তৈরী করেন- কখনও রাজা, রানী, পরী (চিত্র নং ৫), পাখি, গণক (চিত্র নং ৬) ইত্যাদি। অভিনয়ের সময় আসরের মধ্যে দোহারদের সামনের পুরো জায়গাটিই তিনি ব্যবহার করেন (চিত্র নং ৪)। চরিত্র থেকে চরিত্রান্তরে যেতে কোমড়ে জড়ানো শাড়ীর পাশাপাশি তিনি একটি বালিশ ব্যবহার করেন (চিত্র নং ১, ৩)। প্রপস্ হিসেবে ব্যবহৃত এই বালিশকে তিনি কখনও ঘোড়া, পাখি, কলস, নৌকা, ঝাড়ু, চিঠি (চিত্র নং ৩), মাটি কাটার কোদাল, ঝুড়িসহ আরও নানারকমের

[৫০] সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সাইদুর রহমান, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারী ২০০২

[৫১] সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আলাউদ্দিন বয়াতী, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

পালাগান, চিত্র নং ৩

বহুমুখী ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর দলের দোহারেরা সবাই একরঙা লুঙ্গি এবং ফতুয়া বিশেষ পরিধান করে থাকে। এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল; পালাগানে উপরোল্লিখিত বয়াতীদের প্রত্যেকেই পায়ে ঘুঙুর ব্যবহার করে থাকেন এবং পালাগানের সমস্ত অংশ পুরুষ কুশীলব দ্বারা পরিবেশিত হয়ে থাকে।

পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটারের 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পরিবেশনায় ব্যবহৃত পোশাক ইসলাম উদ্দিনের মতোই তবে রঙের ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা। সোনালী নক্সা করা আকর্ষণীয় ফিরোজা রঙের কামিজ-পায়জামা, সোনালী ও ফিরোজা রঙের ছাপ বিশিষ্ট ঘাঘরী এবং কোমড়ে একটি সোনালী পাড়ের লাল বেনারসী শাড়ী থাকে (চিত্র নং ১)। তবে তাঁদের দোহার দলের ব্যবহৃত কষ্টিউম এবং মঞ্চ সজ্জায় ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের দোহার দলের সবাই কালো হাফ হাতা গেঞ্জি ও কালো রঙের ট্রাউজার পরিধান করে থাকেন (চিত্র নং ৩)। আর মঞ্চ সজ্জার ক্ষেত্রে তারা উপরোল্লিখিত আয়তনে মঞ্চের আয়োজন করে থাকেন ঠিকই, কিন্তু মঞ্চ সাজানোর ক্ষেত্রে তাঁদের রয়েছে শৈল্পিক নিপুণতার পরিচয়। এক্ষেত্রে দোহারদের বসার স্থান মূল গায়েনের অভিনয় স্থানের তুলনায় প্রায় ৬"-১০" (ইঞ্চি) বেশি উঁচু হয়ে থাকে। মঞ্চের চারকোণে চারটি বাঁশের সাথে উপরের দিকে আড়াআড়ি ভাবে চারটি বাঁশ বাধা থাকে। মঞ্চের উপরের দিকে আড়াআড়িভাবে বাধা বাঁশগুলির সাথে চতুর্দিক থেকেই নক্সাকাটা সাদা কাগজের ঝালর আঠা দিয়ে (নীচের দিকে ঝুলিয়ে) লাগানো থাকে। আর মঞ্চের উপরে বাঁশের চারকোণ বরাবর ঐ একই রকমের নক্সাকাটা সাদা কাগজের ঝালর আঠা দিয়ে লাগানো থাকে। এছাড়াও অভিনয় মঞ্চের চারকোণে (বাইরের দিকে) থাকে চারটি সাদা রঙ করা কাঠের বাক্সের উপর চারটি এবং মঞ্চের ঠিক সামনেই থাকে সাদা রঙের একটি জল চৌকির উপরে একটি পিতলের তেলের জলন্ত প্রদীপ। প্রদীপগুলির মধ্যে জল চৌকির উপরের প্রদীপটি সর্বাপেক্ষা বড়। অভিনয় শুরু হবার কিছু সময় আগে এগুলি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আর সাদা চৌকিসহ বড় প্রদীপের সামনে থাকে গোলাপ ফুলের পাপড়ি ভর্তি (থালার উপরে ছড়ানো) পিতলের একটি বড় থালা। অভিনয় শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীদল মঞ্চের বাম পার্শ্ব থেকে অভিনয় মঞ্চে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করে থাকে। এসময় তাঁদের একজনের হাতে সদ্য জ্বলন্ত ধূপদানী থাকে। তিনি ধূপদানীসহ দোহার দলের প্রথমেই থাকেন এবং মঞ্চে প্রবেশ করে ধূপদানীটি মঞ্চের সামনের ফুলের পাপড়ি ভর্তি পিতলের থালার উপরে রেখে আসেন। দর্শকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটারের পালাগান পরিবেশনা উপভোগ করতে এসে প্রথমেই অভিভূত হয়ে পড়েন ধূপের সোঁদা গন্ধ আর শ্বেতশুভ্র মঞ্চ উপস্থাপনা দেখে। তারপর দর্শকের আসনে বসে পালা পরিবেশনার জন্য উপস্থাপিত সামগ্রিক আবহে তারা যেন আমাদের রক্তে মিশে থাকা হাজার বছরের গ্রাম্য জীবন ধারার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মহামায়ার অতলে হারিয়ে যান।

পালাগান, চিত্র নং ৪

যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটারের পরিবেশিত 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালাগানটি ইসলাম উদ্দিনের কাছ থেকে সংগৃহীত। তাই, ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর পরিবেশনা সম্পর্কিত আলোচনা এক্ষেত্রে যথার্থ ও ফলপ্রসূ হবে। নীচে পালার কাহিনী সংক্ষেপ উদ্ধৃত করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মরাজ নামে সুসংদূর্গাপুরে একজন রাজা ছিলেন। মায়ের অনুরোধে তিনি রাজকীয়ভাবে এবং মহাধুম-ধামের সাথে কমলা নামের এক অপরূপা সুন্দরীকে বিয়ে করেন। পাশা খেলার প্রতি ধর্মরাজের ছিল প্রচণ্ড রকম নেশা। তাই বাসর রাতে তিনি কমলার সাথে পাশা খেলতে বসেন। পাশা খেলায় ধর্মরাজ হেরে গিয়ে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, যখনই সম্ভব হবে তখনই তিনি পাশা খেলায় কমলাকে পরাজিত করে বাসর রাতের পাশা খেলায় পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নেবেন। এরই মধ্যে কমলা সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে। এমনি এক রাতে কমলা ধর্মরাজের ফুলের বাগানের মন্দিরে কমলা ঘুমিয়ে থাকে। তখন পরীরা কমলাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পাতালে ফিরে গিয়ে তাঁর রূপের কথা পাতাল নগরের রাজা 'কালরাজ'কে খুলে বলে। কালরাজ তখন পরীদের বর্ণনা শুনেই কমলার জন্য পাগলের মতো ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং তাকে পাবার জন্য পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। এদিকে কমলা যথাসময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে এবং তাঁর নাম রাখা হয় রঘুনাথ। কালরাজ রঘুনাথের জন্ম হবার খবর জানতে পেরে ধর্ম রাজকে স্বপ্ন দেখায়-"যদি সে এই সময় কমলার সাথে পাশা খেলে তাহলে কমলা পাশা খেলায় হেরে যাবে। কারণ কমলা মাতৃজঠরজনিত শারীরিক অসুস্থতা থেকে এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি।" পাশা খেলায় কমলাকে হারানোর এটাই মোক্ষম সময়। ধর্মরাজ পাশা খেলায় কমলাকে হারিয়ে তাঁর প্রতিশোধ চরিতার্থ করার সুযোগ নেয়। ধর্মরাজ কমলাকে পাশা খেলতে বাধ্য করে এবং বাজী ধরে; যদি পাশা খেলায় কমলা জিতে যায় তাহলে সুসংদূর্গাপুরে নব্বইপুরা জমির উপরে তাঁর নামে দীঘি খনন করবে আর যদি হেরে যায় তাহলে তাকে বনবাসে যেতে হবে। পাশা খেলায় ধর্মরাজ পরাজিত হয় এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো কমলার নামে সাগরদীঘি খনন করার জন্য কাজ শুরু করে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে দীঘি খননের কাজে নয় দিন অতিবাহিত হলেও দীঘিতে পানির কোন চিহ্নও দেখা গেলনা। এমন সময় কালরাজ আবার ধর্মরাজকে স্বপ্ন দেখায়-"যদি কমলা ভরা এক কলসী পানি নিয়ে সাগরদীঘিতে নেমে নিজে কলসীর পানি তাঁর মাথার উপর ঢেলে দেয় তাহলেই পাতাল নগরের কালরাজ সাগরদীঘিতে পানি ওঠার বন্ধ নলগুলি খুলে দেবেন।" আবারও কমলা ধর্মরাজের কথায় সাগর দীঘিতে ভরাকলসী নিয়ে নামতে রাজী হতে বাধ্য হয়। কিন্তু কমলা তাঁর বিপদের পূর্বাভাস অনুমান করতে পেরে একটি পাখির (পরিবেশনের ভাষায় "পাহাড়ী কাউয়া ময়না পাখি") দ্বারা মুক্তাগাছায় তাঁর সাতভাইয়ের কাছে বিপদের কথা জানিয়ে খবর পাঠায়। জরুরীভাবে তারা তাঁদের বোনকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য রওয়ানা দেয় কিন্তু সুসংদূর্গাপুরের পৌঁছুতে তারা খুবই দেরী করে ফেলে। ফলে তারা তাঁদের বোনকে সাগরদীঘির পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে সাগরদীঘির পানিতে কমলা ডুবে গেলে পরীগণ তাঁকে পাতাল নগরে কালরাজের কাছে নিয়ে যায়। কালরাজ কমলাকে বিয়ে করতে চাইলে কমলার অনুরোধে সে (কালরাজ) কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে বারো বছরের জন্য অপেক্ষা করতে রাজী হয়। শর্তগুলি হল: ১) কমলা তাঁর ছোট্ট শিশুকে লালন-পালন করার জন্য প্রতি রাতে পাতাল নগর থেকে মাটির উপরে উঠে এসে শিশুকে দেখে যেতে পারবে কিন্তু তাঁর (কমলা) গায়ে ধর্মরাজের ছোঁয়া লাগলে তাকে বারো বছরের জন্য বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হবে, ২) আর শিশুর বয়স বার বছর হলে সে (কমলা) কালরাজকে বিয়ে করতে রাজী হবে"। শর্ত অনুযায়ী কমলা প্রতি রাতে তাঁর সন্তানের যত্ন নিতে পাতালনগর থেকে মাটির উপরে সুসংদূর্গাপুরে চলে আসে। এদিকে সুস্বাস্থ্য নিয়ে রঘুনাথের বেড়ে ওঠা দেখে ধর্মরাজের মনে সন্দেহ জাগে এবং তাঁর শিশুর পেছনে একজন চর নিয়োগ করে। একদিন ভোর রাতে সে লক্ষ্য করল কমলা তাঁর ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে ধর্মরাজ কমলাকে ধরতে গেলে পাতালনগরে কালরাজ কমলাকে পাতালনগরে নিয়ে এসে বুকে পাথর চাপা দিয়ে আটকে রাখে। এদিকে ধর্মরাজের প্রাসাদে রঘুনাথ মায়ের বুকের দুধ খেতে না পেরে দিন দিন শুকিয়ে যায়। ধর্মরাজ তাঁর পুত্রকে লালন পালনের জন্য ভালো কোন দাই-মা না পেয়ে মুক্তগাছা শহরে চলে যায়। সেখানে কমলার বোন সমলা, তাঁর বোনের ছেলেকে কোলে তুলে নেয় এবং তাকে লালন-পালন করতে থাকে। আল্লাহর আশীর্বাদে তাঁর বুকে মাতৃদুগ্ধ চলে আসে এবং রঘুনাথ পরাণ ভরে সেই দুধ পান করে। এর ফলে রঘুনাথকে সমলার অবৈধ সন্তান ভেবে ভুল বুঝে সাতভাই সমলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁকে বনবাসে পাঠিয়ে দেয়। সমলা বনের মধ্যে দুঃসহ কষ্ট আর যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে রঘুনাথকে বড় করে তোলে। রঘুনাথ স্কুলে যাওয়া শুরু করে একই সাথে দৈহিকভাবে খুবই শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। একদিন স্কুলের অন্যান্য শিশুরা তাঁকে অবৈধ সন্তান বলে পরিহাস করলে সে প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। বাড়ী এসে সমলাকে তাঁর পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং মুক্তগাছা শহরে তাঁর মামা'রা রয়েছে জানতে পেরে সেদিকে যাত্রা আরম্ভ করে। সেখানে তাঁর মামাতোবোন ফেরদৌসীর সাথে পরিচয় হয় এবং তারা একে-অপরকে ভালোবেসে ফেলে। তাঁর মামারা ফেরদৌসীকে এক অপরিচিত লোকের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে তাকে গুলি করে। পরে তারা রঘুনাথের পরিচয় জানতে পেরে সমলার উপর থেকে তাঁদের রাগ, ক্ষোভ ও অভিমান ঝেড়ে ফেলে। রঘুনাথ সমলার কাছে চলে আসে। সেখানে সমলা রঘুনাথের সেবা শুশ্রুষা করে এবং রঘুনাথ ভালো হয়ে গেলে সমলা এবার তাঁর পরিচয়ের কথা এবং তাঁর মা কমলার দুরাবস্থার কথা জানিয়ে দেয়। এই খবর জানতে পেরে সাথে সাথেই রঘুনাথ সুসংদূর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানে তাঁর বাবার সাথে দেখা হয় যে দীর্ঘদিন ধরে দীঘির পাড়ে বসে কমলার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। রঘুনাথ কোন কালক্ষেপণ না করে দীঘির পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে পাতালনগরে চলে যায়। সে কালরাজের পাতালনগরে প্রবেশের জন্য কৌশল খাটায়। কালরাজের রাক্ষস-পরীদের সাথে বীরের মতো যুদ্ধ করে কালরাজকে বন্দী করে, আর শীর্ণ, ক্লান্ত, রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মা'কে উদ্ধার করে সুসংদূর্গাপুরে নিয়ে আসে। সেখানে তাঁদের পরিবার পুনরায় সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। সমলার স্পর্শে ধর্মরাজ তাঁর চোখের দৃষ্টি ফিরে পায়। রঘুনাথের সাথে ফেরদৌসীর বিয়ে হয়ে যায় এবং রঘুনাথ সুসংদূর্গাপুরের রাজা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়, 'পালা'র কাহিনী বা গল্প মৌখিকভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় পাওয়া। কুদ্দুস বয়াতির কাছ থেকে শিষ্য ইসলাম উদ্দিন কাহিনী পেলেও কাহিনীর বিভিন্ন পরিবর্তনে তিনি তাঁর নিজস্ব কিছু সংযোজনা রেখেছেন। কিশোরগঞ্জের মোজাম্মেল হক বয়াতী 'কমলা রানীর সাগরদীঘি'র পালাগানে ভিন্ন রকমভাবে অভিনয় করে থাকেন।[৫২] ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর 'কমলা রানীর সাগরদীঘি' পরিবেশনার সাথে মোজাম্মেল হকের পরিবেশনার মধ্যে যে পার্থক্যগুলি পাওয়া যায়, তা নীচে উল্লেখ করা হলো :

পালাগান, চিত্র নং ৫

১) পাশা খেলায় ধর্মরাজের সাথে কমলার বাজী : যদি ধর্মরাজ জয়ী হয় তাহলে সাগরদীঘি খনন করবে আর হেরে গেলে সে বনবাসে চলে যাবে। পাশাখেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে কমলা হেরে যায়।

২) কমলা যখন তার সহচরী ও অনুচরদের নিয়ে ধর্মরাজের ফুলের বাগানে ভ্রমণ করছিল তখন পাতাল নগরের পরীগণ তাকে দেখে ফেলে।

৩) জঙ্গলে বনবাসে থাকা অবস্থায় লাল বাদশা নামের এক রাজা তাকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে এবং রঘুনাথ তার আশ্রয়ে (প্রাসাদে) বড় হয়।

৪) রঘুনাথ লাল বাদশার সাথে থেকে যেতে সিদ্ধান্ত নেয়। দীনেশচন্দ্র সেন এর পূর্ববঙ্গ গীতিকা-২য় ভাগে ইসলাম উদ্দিন বয়াতী ও কুদ্দুস বয়াতীর পরিবেশনগত বিষয়বস্তুর সাথে কমলার গানের তুলনামূলক আলোচনা থেকে জানা যায় যে, গীতিকায় বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে উপরোক্ত দুই বয়াতীর পরিবেশনাগত বিষয়বস্তুর কিছুটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, তাহল- দীঘি খনন করার সময় কমলার অদৃশ্য হয়ে গেলে ধর্মরাজ (জানকী নাথ) কমলাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে।

৫) পরীদের দ্বারা ধর্মরাজ তাঁর হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়। দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়ে সমলাকে বনবাস থেকে উদ্ধারের জন্য সাতভাইয়ের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীতে তাদের পুনর্মিলন হয়।

৬) রঘুনাথ তাঁর মামাতো বোন কেশবতীর প্রেমে পড়ে। রঘুনাথকে পাবার জন্য মনোরমা (অনুচর) বিশ্বাস ভঙ্গ করে সাতভাইকে রঘুনাথ ও কেশবতীর সম্পর্কের খবর জানিয়ে দেয়। যার ফলে পরবর্তীতে রঘুনাথ ও সাতভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরে তারা রণে ক্ষান্ত দেয় এবং কেশবতীকে রঘুনাথের সাথে বিয়ে দিতে রাজী হয়। যদিও তখনও রঘুনাথের প্রকৃত পরিচয় তাঁদের জানা ছিল না। মনোরমা রঘুনাথকে খাবারের সাথে বিষ খাওয়ায়। সমূহ বিপদকে এড়িয়ে যাবার জন্য সাতভাই যথাদ্রুত সম্ভব তাকে কবর দিয়ে দেয়। এ সময় একটি পরী এসে তাকে উদ্ধার করে এবং সুস্থ করে তোলে। এই পরীই তাকে তাঁর আসল পরিচয় জানিয়ে দেয় এবং তাঁর মাকে উদ্ধার করার জন্য প্রেরণা দেয়।

অন্যদিকে আলাউদ্দিন বয়াতী তাঁর পরিবেশিত পালার কাহিনী দীনেশ চন্দ্র সেনের একটি সংস্করণ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই আলাউদ্দিন বয়াতীর পরিবেশিত 'কমলা রানী' পালাগানের বিষয়বস্তু বা কাহিনীর সাথে পূর্ববঙ্গ গীতিকার (২) এর যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ পর্বে 'রাজা রঘুর পালা'র কাহিনীর সাথে ইসলাম উদ্দিন ও কুদ্দুস বয়াতীর পরিবেশিত কাহিনীর সামাঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। রাজা রঘুর পালার মধ্যে-

> প্রিয় রানী কমলার মৃত্যু শোকে রাজা রঘু বিলাপ করছিলেন। কমলা স্বপ্নে রাজা রঘুর সাথে দেখা দিলেন এবং দীঘির পাড়ে একটি ছোট্ট ঘর তৈরী করে দিতে বললেন যাতে করে সে গোপনে এসে তাঁর ছোট্ট শিশুকে দেখে যেতে পারে এবং দুধ পান করাতে পারে। একরাতে রাজা তাঁকে ধরার চেষ্টা করতেই সে পানির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আর কোনদিনই ফিরে আসেনি। আখ্যায়িকার বাকী অংশ বিভিন্ন পর্যায়ে এসে শেষ হয়।[৫৩]

---

[৫২] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity; Indigenous Theatre of Bangladesh, Pg. 260

[৫৩] পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত রাত নয়টার দিকে পালাগান শুরু হয়ে থাকে। পালাগানের শুরুতে বা প্রস্তাবনায় মূল গায়েন আসরে প্রবেশের পূর্বে কিছু সময় ধরে দোহারেরা যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। গ্রাম বাংলার জনসাধারণের অতি পরিচিত এবং অধিক প্রচলিত কোন গানের সুরকে নিয়ে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই যন্ত্রসংগীত পরিবেশনের ছন্দে ছন্দে নাচের মাধ্যমে তিনি মঞ্চে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ নাচের মাধ্যমে শরীরকে ওয়ার্ম-আপ করে নিয়ে দোহারবৃন্দকে একটি ইশারায় একযোগে থামিয়ে দিয়ে বন্দনা শুরু করেন। পুরো পালাটি বয়াতী নিজেই পরিবেশন করে থাকেন। তাই বন্দনা গানের সময় মূল গায়েন প্রথমে দোহারদেরকে বন্দনার ধুয়া ধরিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে ঐ একই চরণ গানের সুরে গাইতে থাকেন। তখন দোহারেরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে একযোগে সুর দিয়ে মূল গায়েন পরিবেশিত গানের ধুয়া ধরে থাকে। নীচে 'কমলারানীর সাগরদীঘি'র বন্দনা গানের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো :

(হারমোনিয়াম-ঢোল-মন্দিরা-বাঁশি ও ঝুম -এ আবহ বাদন)

আমি আর কারে ডাকিবো গো এসোগো মা সরেস্বতী (সরস্বতী)
প্রথমে আল্লাজির নামে লেখা করলাম শুরু।
দ্বিতীয় বন্দনা করলাম রাসুলে হুজুরেগো॥
পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের বানুশ্বর (ভানুশ্বর)।
একদিকে উদয়গো বানু (ভানু) চৌদিকে পসর॥
উত্তরে বন্দনা করলাম হিমাল (হিমালয়) পর্বত।
সেই জাগাতে নিলো জরমো (জন্ম) মালোমের পাতর (পাথর)॥
হাত উঠায়া মারেগো গাতরে বুক পাতিয়া লয়।
বুকেতে পরিয়া পাথর খন্ড খন্ড হয় গো॥

তারপরে বন্দনা করলাম ছিলটো (সিলেট) শহর।
শাজালালের চরণ বানলাম বসি আসরে॥
পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা বরস্তান (বড় স্থান)।
যেই খানেতে হয়গো সিষ্টি (সৃষ্টি) কিতাব আর কুরান (কোরআন)॥
তারপর বন্দনা করলাম নবীজির চরণে।
যিনি আমায় করিবেন পার হাশর ময়দান॥
দক্কিনে (দক্ষিণে) বন্দনা করলাম কালিদর (কালিধর) সাগর।
সে সাগরে বাইতো ডিঙ্গা চান্দো সদাগর (চাঁদ সওদাগর)॥

চাইর (চার) কোনা বন্দনা করে মন করিলাম স্তির (স্থির)।
তীরের আগায় বানদে (বেঁধে) গাইলাম আশি হাজার পীর॥
আশি হাজার পীর বান্দিলাম নয় লাক (লাখ) পেগাম্বর।
গাজী-কালুর চরণ বানলাম সুন্দরবন জঙ্গল॥
পিতামাতার চরণ বানলাম বসিয়া আসরে।
যেও মায়ে দশমাস দশ দিন রাখিল উদরে গো॥
মায়ে জানে সন্তানের ব্যতা (ব্যাথা) আর জানিবে কে।
যেও মায়ে দশমাস দশদিন রাখছিলো উদরে॥
ইসলাম ভাইও বিনয় করে বাংলার বাইদের (ভাইদের) কাছে।
পিতামাতার খেজমত (খেদমত) করো তাকিয়া (থাকিয়া) সংসারে॥
এই যে শিক্ষা গুরু ইসলাম উদ্দিন জানাইলাম আসরে।
হাজার হাজার ছালাম রইল ওস্তাদের চরণে গো॥
বন্দনা গাইলে লোকজন বন্দনার নাই সীমা।
থাক বন্দনা ছেড়ে দিয়ে কিস্‌সায় যাই চলিয়া॥

ধুয়া : এসোগো মা স্বরস্বতী, আমি আর কারে ডাকিবো গো...। এবং
মূল গায়েন কর্তৃক পরিবেশিত প্রতি চরণের শেষ শব্দটি যে প্রত্যয় যুক্ত (স্বরবর্ণের) হয় তা দীর্ঘায়িত করে সুর দিয়ে গানের ধুয়া ধরে থাকে। যেমন : কে-এ-এ-এ, স্ব-অ-অ-র ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

সমাপ্তি গান :

এই পর্যন্ত রইলো গো কান্ত (ক্ষান্ত),
ইতি দিয়া যাই।
ভুলো ব্রান্তি (ভ্রান্তি) কতই হইলো গো লোকজন,
মাপ করিবেন তাই ও গো ॥
সবার কাছে আদাব ছালাম
রইলো গো আসরে
ছেলে বইলে করবেন মার্জন গো লোকজন,
আসরের সকলে গো ॥

ধুয়া : যাইগো আল্লা তোমায় না চিনিয়া
জীবনে কি করলাম আল্লাগো ॥

বন্দনা গানের পরপরই পালাগানের মূল অংশ অভিনীত হয়ে থাকে। মূল গায়েন বা বয়াতী নিজেই নেচে গেয়ে-বর্ণনা করে পালার সমস্ত অংশ অভিনয় করে থাকেন আর দোহারেরা তাঁদের নির্ধারিত আসনে বসে ধুয়া ধরে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মূল গায়েনকে সাহায্য করে থাকে। পালাগানের অভিনয় উপাদান সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো :

১) বর্ণনাত্মক গীত : এখানে বয়াতী গীতের মাধ্যমে আখ্যায়িকার ঘটনাগুলি বর্ণনা করে যান। কখনও তাঁর সাথে যুক্ত হয় দোহারদের গানে ধুয়া ও বাদ্যযন্ত্রীদের পরিবেশিত বাদ্য। সাধারণত বয়াতীর প্রধান সহযোগী হিসেবে ডায়না কোরাস গানের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। যেমন- গানের একটি পয়ারের কিছু অংশ গেয়ে মূল গায়েন ছেড়ে দিয়ে তাঁর গানে পরিবেশিত কথাগুলি নৃত্যসহ বিভিন্ন ক্রিয়ার (action) মাধ্যমে প্রকাশ করেন। আর এ সময় মূল গায়েন যেখান থেকে গানের অংশ দোহারদেরকে ছেড়ে দেন, দোহারেরা সেই অংশ থেকে আরও জোরালো রূপে ধুয়া ধরে থাকে। অর্থাৎ গানের মধ্যে যেসব কথা বর্ণনা করা হয় মূল গায়েন সেগুলিকেই (দোহারদের গানের সময়) নৃত্যসহ বিভিন্নরূপ অংগভঙ্গির দ্বারা প্রকাশ করেন। চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে পরিবর্তনের সময় মূল গায়েন চরিত্রকে ভালোভাবে দর্শকদের সামনে ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁর পোশাকের ব্যবহারে পরিবর্তন আনেন্। মূল গায়েনের বর্ণনাত্মকগীতের মধ্যেও অভিনয়ের প্রয়োগ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনার চরণ প্রয়োগে যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ-

ক) একপদী চরণের বর্ণনাত্মক গীত : এই ধরণের বর্ণনাত্মক গীতের প্রতি পয়ারের একক চরণ শেষে ধুয়া পরিবেশিত হয়। প্রতিটি স্বতন্ত্র ঘটনাংশ বর্ণনার শুরুতে কুশীলব বৃন্দের বসা অবস্থানে থেকে এই ধুয়া পরিবেশনা একটি সাধারণ নিয়ম। যিনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে থাকেন অর্থাৎ হারমোনিয়াম মাষ্টার গানের ধুয়া ধরার ব্যাপারে দোহারদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। একপদী চরণের বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশনায় আবার দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ১) বর্ণনাত্মক গীতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত ধুয়ার চরণ এবং ২) বর্ণনাত্মক গীতের সম্পর্ক মুক্ত ধুয়ার চরণ। এরূপ গীতের পরিবেশনায় পালার কাহিনী খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। কাহিনীর বর্ণনায় মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনা হাজার হাজার বছর পেরিয়ে যায়। যার ফলে পালাগানের এই অংশটুকু কাহিনী নির্ভর হয়ে পড়ে। সেখানে অভিনয়ের তুলনায় কাহিনীর বর্ণনা বা ঘটনা প্রধান্য পেয়ে থাকে। কাহিনীর গতিময়তা এ রীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ স্বরূপ উপরোক্ত দুটি ধারার বর্ণনাত্মক গীত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

১) ধুয়ার সাথে সম্পর্ক যুক্ত বর্ণনাত্মক গীত :

ধুয়া : কামলাগণে কাটেগো মাটি আনন্দিত মনে রে।
গীত :
কামলা গণে কাটেগো মাটি আনন্দিত মনেরে। (ধুয়া)
সাগর দীঘি তৈরী করবো সুসংদূর্গাপুরে গো। "
হাজার হাজার কামলা খাটে সাগর দীঘির পাড়ে গো। "
কেহ কাটে মাটি গো আর কেহ টানে ঝুড়ি গো। "

Dhaka University Institutional Repository

একদিন করে গণার (গণনার) দিনও যাইতাছে চলিয়া গো। "
সাড়ে নয়দিন মাটি কাটে শুনেন বইয়া বইয়া গো। "

২) ধুয়ার সাথে সম্পর্ক নেই এরূপ বর্ণনাত্মক গীত :

ধুয়া : আন্ পানি মিন্দী লাগাই রে, দাসীরে।
গীত :
দাসীরে, আন্ পানি মিন্দী লাগাইরে।
ওরে আছিল না উজির ব্যাটা কোন কামও করিল রে।
আন্ পানি মিন্দী লাগাই রে।
পাগলা ঘোড়া লইয়া উজির বৈদ্যাশেতে গেল রে।
আন্ পানি মিন্দী লাগাই রে।
কতই দ্যাশ বা কতই মুল্লুক লাগল ছাড়াইবারে রে।
আন্ পানি মিন্দী লাগাই রে।
মুক্তাছা শহরে গিয়া হাজির হইয়া গেছে রে।
আন্ পানি মিন্দী লাগাই রে।
সামনেতে ফুলের বাগান গেল যে পড়িয়া রে।
আন্ পানি মিন্দী লাগাই রে।
মনে মনে ভাবে উজির বিশ্রাম যাই করিয়া রে।
আন্ পানি মিন্দী লাগাই রে।

খ) দ্বি-পদীচরণের বর্ণনাত্মক গীত : পালাগানের বেশির ভাগ গানই দ্বি-পদীচরণে গাওয়া হয়ে থাকে। গান পরিবেশনের কৌশলগুলি একপদীচরণের মতোই। শুধু গানের চরণগুলি দ্বি-পদী হয়ে থাকে। নিম্নে কমলারানীর সাগরদীঘি পালায় বিয়ের জন্য কমলাকে বৌ-সাজানোর জন্য দ্বি-পদীচরণে গাওয়া গানের কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো :

ধুয়া : কন্যা সাজে-সাজেগো কন্যা, বইসা নিরালায়।
গীত :
কন্যা সাজে সাজেগো কন্যা, বইসা নিরালায়। (ধুয়া)
মুরগ মার্কা নারকেল তেল লয়ে হাতের মাঝে,
ঘষিয়া ঘষিয়া কন্যা লাগায় কেশের মাঝে॥ "
তারপরে আনিল খোপা খোপার নামটি আর,
সেই খোঁপা বান্ধিলে হয় গো শাশুড়ি বেজার॥ "
খোঁপাটি পরিয়া কন্যা আয়নার দিকে চায়,
মন পছন্দ হয়না খোঁপা টানিয়া খসায়॥ "
তারপরে আনিলো খোঁপা নামে গোলাপ ফুল,
সেই খোঁপা পরিয়া কন্যা হইল যে আকুল॥ "
খোঁপার বেদন কইলে লোকজন খোঁপার সীমা নাই,
খোঁপার বেদন ছাইড়া দিয়া শাড়িটা পরাই॥ "
প্রথমে আনিল শাড়ি কিন্যা পাঁচশ আশি,
সেই শাড়ি পরিয়া কন্যা হয়ে গেলো খুশি॥ "
সাজিয়া পরিয়া কন্যা মুখে দিল পান,
ঘর থাইক্যা বাহির হইল পূর্ণিমারই চাঁদ॥ "
হাতে দিল হাতো বালা কানে দিল দুল,
পায়ে দিল সোনার নুপুর বাজে ঝুমুর ঝুম॥ "

গ) পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাত্মক গীত : বর্ণনাত্মকগীতের এই পরিবেশনায় গায়েন পয়ারের প্রথম চরণ গেয়ে দোহারদের ধুয়া ধরিয়ে দেন। এরপর অন্যান্য কুশীলব পুনরায় উক্ত চরণেরই পুনরাবৃত্তি করে থাকে। এইভাবে মূল গায়েন এবং দোহারদের দ্বারা পুনরাবৃত্তি মূলক বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশিত হয়। ধর্মরাজ পাশা

Dhaka University Institutional Repository

খেলায় হেরে গিয়ে পূর্বশর্ত মোতাবেক তিন দিনের জন্য কুঞ্জতখানার ঘরে যেতে উদ্যত হলে মূল গায়েন কমলার চরিত্রে নিম্নোক্ত গানটি পরিবেশন করেন :

গীত :
আর যেয়োনা যে-য়োনা স্বামীগো কুঞ্জত খানার ঘরে... ।
ধুয়া... ।
অভাগিনী কেমনে থাকবোগো ছাড়িয়া তোমারে স্বামীগো ছাড়িয়া তোমারে... ।
ধুয়া... ।
তুমি আমার আকাশেরও চাঁদ থাকিয়ো সামনে ।
ধুয়া... ।
তোমায় নিয়া থাকবো স্বামীগো সুসংদূর্গাপুরে ।
ধুয়া... ।

উদ্ধৃত গীতটি মূল গায়েন কমলার চরিত্র হয়ে পরিবেশন করেন। গানের মধ্যে স্বামীকে স্বেচ্ছায় হাজত বাস থেকে ফেরানোর জন্য কমলার হৃদয়ের প্রবল আকুতি-মিনতি ফুটে উঠেছে উপরে উদ্ধৃত গীতের অভিনয়ের মধ্যে। সে কারণে উদ্ধৃত গীত অংশটিকে সংলাপাত্মক গীতও বলা যেতে পারে।

ঘ) বহুপদীচরণের বর্ণনাত্মক গীত : পালাগানে মূল গায়েনের বর্ণনাত্মক গীতের পরিবেশনাটাই অবাক হবার মতো, রীতিমতো বিস্ময়কর। বর্ণনাত্মক গীতের মধ্যে বহুপদী চরণের ব্যবহারও পালাগানকে বিশিষ্টমাত্রা দান করেছে। যেমন- পাখীর তীরবিদ্ধ হবার অংশে গানটি প্রথমত: দ্বি-পদীচরণে শুরু হতে দেখা যায়। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল দ্বি-পদী চরণে শুরু হয়ে কিছু দূর যাবার পর বয়াতী তাঁর গানকে আর দ্বি-চরণের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না। বয়াতী তাঁর সুরের যাদুতে কিছুক্ষণের জন্য দোহার পরিহার করে (এসময়ে বাদ্যযন্ত্র বাজতে থাকে এবং বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম বাদন প্রধান বা লীড হিসেবে কাজ করে। কেননা গানের সুরের আবেগ তখন হারমোনিয়াম ও বাঁশির সাহায্যে বয়াতী তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে খুবই জোরালো রূপে প্রকাশ করেন) এককভাবে পয়ারের সমস্ত অংশটাই পরিবেশন করেন। উল্লিখিত তীরবিদ্ধ অংশটি করুণ রসাত্মক বলে এ সময়ে দর্শক বয়াতীর উপস্থাপনার সাথে একেবারেই একাত্ম হয়ে যায়। তখন অনেকেরই চোখের পানি ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এখানে আরেকটি ব্যতিক্রম ধর্মী বৈশিষ্ট্য হল, গানের শুরুতে গায়েন দোহারদেরকে কোন ধুয়া ধরিয়ে দেন্ না। কিন্তু দোহারেরা ধুয়া হিসেবে 'হায়গো আল্লাহ্ মুরশীদ না চিনিয়া' চরণটি গেয়ে থাকে। পাশাপাশি অন্য যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তাহল, একই বর্ণনাত্মক গীতের মধ্যে সংলাপাত্মক গীত ব্যবহারের (গানের শেষের দিকে বাঁকা অক্ষরে চিহ্নিত) দ্বারা চরিত্রের পরিবর্তন করে থাকেন। নীচে 'পাহাড়ীয়া ময়না পাখী'র গীত অংশটুকু উদ্ধৃত করা হলো :

গীত :
পাহাড়িয়া কাউয়া ময়না যাইতাছে উড়িয়া। (এসময় খুবই জোরালোভাবে বাদ্যযন্ত্র বাজতে থাকে)
কমলারই কান্দন শুইনা গো পাখি উঠিল চমকিয়া গো॥
হায়গো আল্লাহ্ মুরশীদ না চিনিয়া, জীবনে কী করলাম আল্লাহগো... । (ধুয়া)
কেমন মায়ে কান্তেগো আছে মন্দিরের ভেতরে,
তাহার কাছে যাবো আমিগো আল্লাহ জিজ্ঞাস করবার জন্যে গো॥
হায়গো আল্লাহ্ মুরশীদ না চিনিয়া, জীবনে কী করলাম আল্লাহগো... । (ধুয়া)
এই কথা বলিয়া পাখি কোন কামও করিল,
জানালাদা টুইকা গেল গো আল্লাহ্ মায়েরই দরবারে গো॥
হায়গো আল্লাহ্ মুরশীদ না চিনিয়া, জীবনে কী করলাম আল্লাহগো... । (ধুয়া)
মা-মা বলে পাখি বসিল তাঁর কাছে,
কি কারণে কান্দ মাগো বল না আমারে,
ছোট কালে পিতাগো মরল দেখলাম না নয়নে,
তিনো মাসের বাচচাগো রাইখা মায়ও মারা গ্যাছে...
মা - য়া গো...
শুন শুন ওরে পাখি বলি যে তোমারে,
আমায় তুমি মা ডাকিলে কইলজায় আগুন ধরে,
সাতও দিনের রঘুনাথও অভাগিনীর কোলে,

Dhaka University Institutional Repository

সেতো আমায় মা ডাকেনা গো আল্লাহ্ সুসংদূর্গাপুরে॥
হায়গো আল্লাহ্ মুরশীদ না চিনিয়া, জীবনে কী করলাম আল্লাহগো... । (ধুয়া)

২) গদ্য বর্ণন বা বর্ণনাত্মক গদ্য : গীতের মাধ্যমে বর্ণনাত্মক অভিনয় ছাড়াও তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট এবং প্রসঙ্গক্রমে এসে যাওয়া ঘটনাগুলি গীতের পাশাপাশি গদ্যেই বেশির ভাগ বর্ণনা করে থাকেন। এছাড়াও তিনি যে সকল নাট্য ক্রিয়া করেন সেগুলিও নানারকম অঙ্গভঙ্গিমা সহকারে বর্ণনা করে থাকেন। এ সময়ও তিনি চরিত্র চিত্রণের প্রয়োজনে তাঁর কোমড়ে পেঁচানো শাড়ি ও কিছু সংখ্যক প্রপসের ব্যবহার করেন।

৩) সংলাপাত্মক গদ্য বা গদ্য সংলাপ : গান পরিবেশনায় বয়াতী মাঝে মাঝে দোহারদের মধ্যকার প্রধান সহযোগী ডায়নার সাথে সংলাপে অবতীর্ণ হন। এসময় ডায়না তাঁর নির্ধারিত স্থানে বসেই পোশাকের কোন পরিবর্তন না করে (মাঝে মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রপস্ ব্যবহার করে যেমন- চাবুক, বাঁশি-কলম, বিছানা-গামছা ইত্যাদি) সংলাপের দ্বারা মূল গায়েনকে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু চরিত্র থেকে চরিত্রে পরিবর্তনের সময় বয়াতী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কষ্টিউম, প্রপস্ ব্যবহার করেন এবং চরিত্র অনুযায়ী কথা বলার সময়, চাল-চলনে, দেহের মধ্যেও পরিবর্তন এনে থাকেন। তাঁর ব্যবহৃত প্রপস্গুলির মধ্যে দড়ি, রুদ্রাক্ষীর মালা, পিস্তল, বালিশ, চশমা, ঘড়ি, আংটি, ব্যাগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের নিয়ম অনুযায়ী বয়াতী পালাগানের কাহিনীকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার জন্য সবসময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির অভিনয় করেন এবং ভাব প্রকাশক অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সংলাপের মাধ্যমে ডায়না মূল গায়েনকে সাহায্য করে থাকে। এখানে যে ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য তাহলো, পালাগান পরিবেশনায় কাহিনীর সূত্রানুসারে বয়াতী ও ডায়নার মধ্যকার সংলাপ আদান প্রদানের বিষয় কখনওই পূর্ব নির্ধারিত করা থাকে না। পালাগান পরিবেশনার সময় তাঁদের মধ্যকার আদান প্রদানকৃত সমস্ত সংলাপই তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট।

৪) সমাপ্তি গান : পালাগান শেষ করার পূর্বে মূল গায়েন গানের মাধ্যমে পরিবেশনা শেষ করার কথা দর্শকদেরকে জানিয়ে দেন। এ সময় দোহারেরাও বাদ্যযন্ত্রের তাল বা লয়ের গতি বাড়িয়ে তাকে বিশেষ করে তোলার চেষ্টা করে থাকেন।

পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের ইসলাম উদ্দিন বয়াতী, কুদ্দুস বয়াতী, আলাউদ্দিন বয়াতী ও কিশোরগঞ্জের মোজাম্মেল হক বয়াতীর পরিবেশিত পালাগানে যে বিষয়টি সর্বপ্রথমে লক্ষণীয় তাহলো, কাহিনীর প্রসারতা বা কাহিনীর বিস্তার। পালাকারের রুচি ও কল্পনা অনুযায়ী সমাজ ও প্রচলিত রীতির অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পালাগানগুলির কাহিনী মূল-কাহিনীকেও ছাড়িয়ে ইতিহাস-বাস্তবতা আর কল্পনার মিশ্রণের এক অপরূপ মহিমা লাভ করেছে। মূল গায়েন গানের আসরে বসেই কাহিনীকে কখনও সম্প্রসারিত করেন আবার কখনও সংকুচিত করেন। পালা পরিবেশনায় মূল গায়েনের কাহিনী নিয়ন্ত্রণ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। পালাগানের এরূপ পরিবেশনাকে আদর্শরূপে বিবেচনা করে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এদেরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যার সূত্র ধরে পরবর্তীতে পালাগানের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত লোকনাট্যের অন্যান্য রীতির তুলনামূলক আলোচনা সমৃদ্ধশালী হবে। এক্ষেত্রে পালাগানের পরিবেশনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নরূপ-

পালাগান, চিত্র নং ৬

১) পালাগানে একজন মাত্র মূল গায়েন থাকেন যাকে পালাগানের বয়াতী বলা হয়ে থাকে। তিনিই মূলত এককভাবে সমস্ত পালা পরিবেশন করে থাকেন। পালা পরিবেশনের সময় তিনি কখনও আসর ত্যাগ করেন না।
২) দোহারেরা আসরের মধ্যে অবস্থান করেন।
৩) দোহারদের মধ্যে শুধুমাত্র ডায়না তাঁর আসনে বসে মাঝে মধ্যে সংলাপের দ্বারা পালা পরিবেশনে মূল

Dhaka University Institutional Repository

৪) পালা পরিবেশনের সময় দোহারদের কেউই তাঁদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান না।
৫) মূল গায়েন ব্যতীত পালাগানের অন্যান্য সদস্যরা একই সাথে দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীর কাজ করে থাকে।
৬) দোহারদের আসনের সম্মুখভাগের সমস্ত অংশই মূল গায়েন পালাভিনয়ের সময় ব্যবহার করে থাকেন।
৭) পালা পরিবেশনে বর্ণনাত্মক গীতের ব্যবহার বেশি। সংলাপের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বর্ণনাত্মক গীতের তুলনায় কম।
৮) মূল গায়েন তাঁর পরিবেশিত কাহিনীর ইচ্ছেমত সংকোচন ও প্রসারণ করে থাকেন।
৯) মূল গায়েন একাই চরিত্র থেকে চরিত্রান্তরে যান এবং প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় করে থাকেন। চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর পরিধেয় কাপড় ও অন্যান্য জিনিসের সামান্য ব্যবহারের দ্বারা প্রতিটি অভিনেয় চরিত্রের আঙ্গিক বাচিক ও স্বাত্ত্বিক পরিবর্তন এনে থাকেন।
১০) বন্দনা গান ও সমাপ্তি মূলক গান পরিবেশিত হয়। বন্দনা গানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই দেব-দেবী, নবী-রাসুল ও পবিত্র স্থানের উপরে ভক্তি প্রদর্শিত হয়ে থাকে।
১১) পালাগানের অভিনয়ে ব্যবহৃত একই জিনিস (প্রপস্) ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন- অভিনয়ের মধ্যে বয়াতী বালিশ দিয়ে কখনও ঘোড়া, কখনও পাখী, কখনও চিঠি, নৌকা, ঝাড়ু, তীর, মাটি কাটার কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি দেখিয়ে থাকেন।
১২) পালাগানের কাহিনীর বিষয় হিসেবে রাজা-বাদশা, পরী, রাক্ষস-ক্ষোক্কস এবং অলৌকিক বা আধিজাগতিক শক্তির সাথে মানুষের প্রধান্য বিস্তারের ও অস্তিত্বের লড়াই স্থান পেয়ে থাকে। অবশেষে মানুষের জয় দেখান হয়।
১৩) পালাগানের আসর সাময়িক ভাবে তৈরী করা হয়ে থাকে। গানের দোহার দল কখনও আসরের কেন্দ্রে বৃত্তাকারে, কখনও আসরের পরিধিতে কেন্দ্রমূখী হয়ে বৃত্তাকারে আবার কখনও আসরের পেছনের দিকে দর্শকের দিকে মুখ করে এক লাইনে সারিবদ্ধ ভাবে অথবা আসরের দর্শকের দিকে মুখ করে লম্বালম্বি ভাবে দুই পার্শ্বে মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করেন।
১৪) পালাগানের শুরুতে যেমন বন্দনা গীত পরিবেশন করা হয় ঠিক তেমনি পালাগান শেষ করার পূর্ব মুহূর্তে কখনও বাদ্যযন্ত্রের লয় দ্রুত করে অথবা গানের মাধ্যমেই পালাগানের পরিবেশনা শেষ হওয়ার কথা জানিয়ে পালাগানের সমাপ্তি সূচক গীত পরিবেশন করে থাকে।

পালাগানের আসর, দোহার ও মূল গায়েনের ভূমিকা, অভিনয় উপাদানের ব্যবহার বিষয়ে উপরের আলোচনা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু নির্দিষ্ট অভিনয় রীতির পরিবেশনা সম্পর্কিত আলোচনা নীচে তুলে ধরা হলো :

৩.২.২. মণিপুরীদের পালাগান

প্রায় আড়াইশ বছর আগে মণিপুরীদের প্রথম অভিবাসন শুরু হয় বাংলাদেশে। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার কারণে এবং স্বাভাবিক আন্তঃসাম্প্রদায়িক ভাব বিনিময়ের ফলে মণিপুর থেকে অভিবাসিত মণিপুরীদের আদি-সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর সঙ্গে এদেশের সমাজ-রাষ্ট্রের নানা অনুষঙ্গ সংযোজিত হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মণিপুরীরা তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচার-পার্বণাদির সঙ্গে এক করে নিতে থাকে বাঙালীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পার্বণ। একটি রাষ্ট্রে বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর প্রভাব অপর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ওপর পড়তে বাধ্য। তারপরও মণিপুরীরা তাঁদের স্বকীয়তা বিসর্জন দেয়নি খুব বেশি। আর যতটুকু দিতে হয়েছে তা সাংস্কৃতায়নের সাবলীল স্বার্থে। এখনও যেসব প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ও শিল্প সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মণিপুরী সম্প্রদায়ের বাৎসরিক ও পার্বণিক ভিত্তিতে নিয়মিত পালিত হয়, সংকীর্তন বা পালাগান তাঁদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের গায়েন-দোহারভিত্তিক গীতনাট বা নাট-গীতমূলক পরিবেশনাগুলোর সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও মণিপুরীদের সংকীর্তন পালাগান একটি স্বতন্ত্র রীতি ও বৈশিষ্ট্যের।[৫৪]

অভিনয় কাঠামো : মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্তন মূলক পালাগান বিকাশ লাভ করলেও তা লৌকিক ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধি লাভ করে। সংকীর্তনের প্রধান পালাকে নটপালা বলা হয়ে থাকে। এতে কঠোর নিয়ম-কানুন পালন করা হয়। নৃত্য, গীত, বাদ্য অভিনয় পরিবেশনার সর্ব উপাদানের সঙ্গে এতে যুক্ত থাকে কৃত্য তথা মাঙ্গলিক আচার। পালায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিল্পীকে প্রথমে ফুল ও চন্দন প্রদানের মাধ্যমে সংকীর্তণের আরম্ভ হয়, পর্বটির নাম 'লৈ-চন্দন'। এরপর মণ্ডপ-মপু (অনুষ্ঠানের সভাপতি) মাঙ্গলিক শ্লোক পাঠ করেন। এরপর শুরু হয়

[৫৪] শুভাশিস সমীর, 'মণিপুরীদের পালাগান', দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারী-শুক্রবার, ঢাকা, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

মূল পরিবেশনা। শুরু বন্দনা, সভা বন্দনা ও চৈতন্যদেবকে প্রণাম করার পর কাহিনীক্রমিক গীতিনাট্য শুরু হয়ে থাকে। পালার গানগুলো বৈষ্ণব কবিদের রচিত রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী সংকলিত ভক্তি রচনাদি বা পদাবলী থেকে নির্বাচিত, অনুদিত, নিজ সম্প্রদায়ের কবিদের কাছ থেকে সংকলিত বা গায়েনের নিজের রচনাও হতে পারে। অনেক সময় গায়েন বা 'ইশালপা' তাৎক্ষণিকভাবে পদ রচনা করে থাকেন। নটপালায় একজন মূল গায়েন (ইশালপা), একজন মূখ্য দোহার (দুয়ার) এবং আরও অনেক দোহার গান, বর্ণনা ও আবৃত্তি সংমিশ্রিত অভিনয় অংশে এবং যন্ত্রী হিসেবে দুজন মৃদঙ্গ বাদক অংশগ্রহণ করে (চিত্র নং ৭)। গায়েন দোহারদের হাতে করতাল থাকে। গায়েনের সহকারীরাই 'দোহার' হিসেবে পরিচিত। পালার মধ্যে দুরকমের নাচ থাকে; নটপালায় পুংচোলাম বা মৃদঙ্গ সহযোগে নাচ ও করতাল চোলেম বা 'করতাল' সহযোগে নাচ। দল মধ্যস্থিত গায়ক ও বাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে যার নাম 'ফাঙনবা'। এর পরিবেশনা রীতিতে চরিত্র রূপায়নে অন্য কোন পাত্র-পাত্রীর অংশগ্রহণ থাকে না। গায়েন ও মূখ্য দোহারই রাধা, কৃষ্ণ, চৈতন্য...বিবিধ চরিত্রের রূপ নিয়ে থাকে আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতায়। যেমন- গায়েন বা 'ইশালপা' 'কৃষ্ণ' হয়ে গান ধরার সঙ্গে সঙ্গে মূলদোহার রাধারূপ নিয়ে গানে-গানে কাহিনীকে উক্তি-প্রত্যুক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় শরীক হয়ে থাকে। অন্যান্য দোহারেরা গানের বিশেষ কিছু অংশ (ধুয়া) পুনরাবৃত্তি করে। এ পালার গায়ক-বাদক সবাইকে একই সঙ্গে নাচ, গান, অভিনয়, বাদন ইত্যাদিতে দক্ষ হতে হয়। সম্পূর্ণ পালাটিতে অসংখ্য রাগ-রাগিনীর ব্যবহার থাকে। আর মণিপুরী গানের টেনে টেনে ও গা কাঁপিয়ে গাওয়ার কারুকাজপূর্ণ বিচিত্র ভঙ্গি নটপালার স্বতন্ত্র আকর্ষণ। শিল্পীদের পরনে থাকে ধুতি, মাথায় পাগড়ী, গায়ে শার্ট জাতীয় কিছুই থাকে না। মণিপুরীদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ থেকে শুরু করে নানা পূজা-পার্বণেও সং-কীর্তনমূলক পালা অবশ্যম্ভাবী। এর পরিবেশনার বৈচিত্র্য ও নান্দনিকতা এখনও অটুট্। সময়ের পরিবর্তনেও মণিপুরীদের এই পালাগান তার গুরুত্ব হারায়নি। মণিপুরী পাড়াগুলোতে সপ্তাহে একটি দুটি পালা না হওয়া অকল্পণীয় বিষয় এখনও।

মনিপুরীদের পালাগান, চিত্র নং ৭

কলাকুশলী সম্পর্কিত তথ্য : পালার 'ইশালপা' আর 'ডাকুলা' (মৃদঙ্গ বাদক)-রা খুব জনপ্রিয় হয়ে থাকেন। গ্রামে গ্রামে তাঁরা সুনামও লাভ করেন। বয়সে প্রবীণ, অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং গুণী দুজন ইশালপার নাম গোপীচান সিংহ ও হরিনারায়ণ সিংহ। দুজনেরই বাস কমলগঞ্জের ভানুবিল গ্রামে। বয়স ষাটের কাছাকাছি। বাংলাদেশের মণিপুরী সম্প্রদায়ের এমন কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে এদের নাম জানে না। ইশালপার পরিশ্রম আর সাধনাও অনুকরণীয়। উক্ত দু-শিল্পীই ষোল-সতের বছর বয়স থেকে একটানা পনের-বিশ বছর একনিষ্ঠ সাধনা করেছেন গান ও সার্বিক পরিবেশনা নিয়ে। তাঁদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। দুজনেই ছোটবেলায় দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে সেখানকার মণিপুরী অজা (গুরু)'দের কাছে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেছেন- তাঁদের বাড়িতে নানা-কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে। পালা কীর্তনের প্রায় সব ইশালপাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া নেই বললেই চলে।

পালাগানের পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে জনাব ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক বলেন, 'ময়মনসিংহ গীতিকার সংগৃহীত পালাগানগুলি গায়েন ও বয়াতীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে ময়মনসিংহ গীতিকাগুলিকে পালাগান বলা যেতে পারে। কেননা এই গীতিকাগুলি পালার গায়েন বা বয়াতীরা আগেও গেয়ে থাকতেন এবং এখনও গেয়ে থাকেন।'[৫৫] ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের এই উক্তির দ্বারা এই কথাও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে, উপরে আলোচ্য বিভিন্ন নাট্যরীতির প্রতিটিই এক একটি পালাগান; এদের প্রতিটিরই রয়েছেন একজন করে মূল গায়েন।

গল্পের গাঁথুনি ও চরিত্রের বাস্তবতায় এগুলি খুব আধুনিক মনে হয়, যদিও সংগ্রাহকরা এগুলিকে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে প্রচার করেছেন।... বগুড়া অঞ্চলেও পালাগান নামে এক ধরনের অভিনয়রীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

---

[৫৫] উদ্ধৃতি : ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, ময়মনসিংহ গীতিকা চর্চা, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, ময়মনসিংহ গীতিকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪২৪

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৩. পালাগান (বগুড়া অঞ্চল)

পৃষ্ঠপোষকতা ও দর্শক : শুধুমাত্র শুকনো মৌসুমে ধর্ম নিরপেক্ষ বিনোদনের উদ্দেশ্যে এই ধরনের অভিনয়ের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই গানের কলা-কুশলীরা ধর্ম-বিশ্বাসে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর হয়ে থাকে এবং পেশার দিক থেকে কেউ কেউ কৃষিজীবী, দিনমজুর এবং শিক্ষকতা পেশায়ও নিযুক্ত রয়েছে। কখনও ব্যক্তিগত উদ্যোগে আবার কখনও গ্রাম্য সমাজের অপেক্ষাকৃত ধনবান বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় (যেমন- কোন ক্লাবের সমষ্টিগত আয়োজনে বা পূজার সময় পূজা উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে বা গ্রাম্য মেলা বা উৎসবাদিতে) এই গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। গানের দর্শক হিসেবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটে থাকে।

পালাগান (বগুড়া), চিত্র নং ৮

দল পরিচিতি : এরকম একটি পালাগানের দলের দলনেতা হলেন মুহম্মদ গফ্‌ফার, গ্রাম-কর্ণপুরা, থানা ও জেলা-বগুড়া। মাট আটজন পুরুষ সদস্য নিয়ে মুহম্মদ গফ্‌ফারের পালাগানের দল গঠিত। মুহম্মদ গফ্‌ফার নিজেই মূল গায়েন হিসেবে পালাগানে অভিনয় করে থাকেন। অন্যান্যদের মধ্যে চার জন বাদ্যযন্ত্রী হিসেবে পালাগানে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। তাঁদের ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে খোল, জুড়ি, খঞ্জরী এবং সরাজ। আর দুজন ছুকরী সেজে মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। আর বাকীরা সবাই পুরুষদের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন (চিত্র নং ৮)। এই পালাগানে বাদ্যযন্ত্রীদের জন্য বিশেষ কোন পোষাকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। ছুকরীদের ব্যবহৃত পোশাকের মধ্যে একজন শাড়ী এবং অন্যজন স্যালোয়ার কমিজ পরিধান করে। অভিনেতাদের অন্যান্যরা ঐতিহাসিক যাত্রাভিনয়ের মতো বিভিন্ন বাহারী রঙের পোশাক পরিধান করে থাকে। পালাগান সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা হলে বাড়ির উঠানে আর সম্মিলিত উদ্যোগে হলে হাটে বা স্কুলের মাঠে অপেক্ষাকৃত বড় কোন খোলা জায়গায় পরিবেশনের আয়োজন করা হয়।

আসর : সাধারণত ১২'(ফুট) থেকে ১৫' (ফুট) ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার অনুচ্চ মঞ্চে এই রীতির অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে (লেখচিত্র নং ২)। এর আসর বা অভিনয় স্থান চারকোণা দিয়ে ঘেরা বর্গাকৃতির অংশের ভেতরে গোলাকার হয়ে থাকে। আসরের উপরে চাঁদোয়া বা সামিয়ানা টানাবার জন্য চার কোণে চারটি খুটি সোজা করে দাঁড়া করানো থাকে। অভিনয় আসরে মাদুর বা চট বিছানো থাকে। গোলাকার এই অভিনয় আসরের কেন্দ্রে পালাগানের সমস্ত কলাকুশলীরা গোল হয়ে বসে। এর মধ্য থেকে অভিনেতারা প্রপস্ সহকারে চরিত্র ধারনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বাদ্যযন্ত্রীদল বাদ্যযন্ত্র সহকারে অবস্থান করে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকে। অভিনয়ের জন্য আলাদা কোন সাজঘর ব্যবহার করে না। দর্শকেরা অভিনয় মঞ্চকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে মাটিতে খড়-কুটা বিছিয়ে আলাদা আলাদা করে আসন গ্রহণ করেন। জগেন কসাই নামে তাঁর ওস্তাদের কাছ থেকে মুহম্মদ গফ্‌ফার মৌখিকভাবে এই গানের পরিবেশনা রপ্ত করেছেন বলে জানা যায়।[৫৬]

পালাগান (বগুড়া অঞ্চল)
লেখচিত্র নং ২

[৫৬] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka, 2000, Pg. 271-272

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যায়িকার কাহিনী সংক্ষেপ নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

রাজা কাগনুন ঘুমোচ্ছিলেন। একটি দুঃস্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখছিলেন স্বপ্নে কে যেন তাঁকে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে জেগে উঠতে বলছে। ভীত সন্ত্রস্ত রাজা ঘুম থেকে উঠে দ্রুত রাজপ্রাসাদের বাইরে চলে এলেন এবং দৌড়ে বনের দিকে যেতে লাগলেন। পথিমধ্যে তাঁর পায়ের সাথে ধ্যানমগ্ন এক সন্যাসীর আকস্মিক ভাবে ধাক্কা লেগে যায়। সন্যাসী রেগে রাজাকে অভিশাপ দিতে গেলে রাজা সন্যাসীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। সন্যাসী দুটো শর্তে রাজাকে ক্ষমা করতে রাজী হলেন। প্রথম শর্ত: ফারাক্কায় রাজা লছিরের মেয়ে লছিমনের সাথে রাজার ছেলে আলমকে বিয়ে দিতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত: বিয়ের পরপরই যুবরাজকে লঙ্কার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যে গিয়ে বারো বৎসরের জন্য রাজ্যের বাইরে থাকতে হবে। সন্যাসী রাজাকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, যদি রাজা এই আজ্ঞা পালনে অস্বীকার করে তাহলে তাঁর রাজ্য পুরে ছাই হয়ে যাবে এবং তাঁর ছেলেও মারা যাবে। রাজা রাজী হলেন এবং ধর্ম সম্মতভাবে খুবই ধুমধামের সাথে তাঁর ছেলের বিয়ের আয়োজন সমাপ্ত করলেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত আলম বিয়ের পরপরই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। রাতে সে জানতে পারলো যে, যদি আজ গভীর রাতে লছিমন গর্ভধারন করে তাহলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে হাসলে তাঁর হাসিতে মুক্তা ঝরবে আর সে সাত রাজ্যের রাজা হবে। গোপনে যুবরাজ আলম বিলম্ব পাখির পিঠে চড়ে বাড়ী চলে আসে। বাড়ী এসে আলম লছিমনের ঘুমের ঘরের দরজা খুলতে বললে সে খুলতে রাজী হয় না। কেননা সে জানে তাঁর স্বামী বাণিজ্য উপলক্ষ্যে দেশের বাইরে চলে গেছে। আলম নিজের পরিচয় দিয়েও লছিমনের ঘরে ঢুকতে ব্যর্থ হলে সে সন্যাসীর সাহায্যে শক্তি খাটিয়ে পরে লছিমনের ঘরে প্রবেশ করে। আলম লছিমনের স্পর্ধার জন্য তাঁর গালে চড় বসিয়ে দেয় এবং তাঁর সাথে রাত্রি যাপন করে। ভোর হবার পূর্বেই বিলম্ব পাখির পিঠে চড়ে সবার অলক্ষ্যে সে আবার তার বাণিজ্য এলাকায় ফিরে আসে। সকালে উঠে লছিমনের ননদ তার চুল এলোমেলো দেখে রাতে তাঁর কাছে কোন পুরুষ লোক এসেছিলো সন্দেহ করে বদনাম দিতে থাকে। পরবর্তীতে যখন তাঁর শরীরে গর্ভধারনের চিহ্ন পুরোপুরিভাবে পরিস্কার তখন অসতীর অপবাদে তাঁকে বনবাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বনের মধ্যে এক কাঠুরিয়ার কাছে সে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে সে এমন এক পুত্র সন্তান প্রসব করে যে হাসলে মনে হয় সত্যিই যেন তার হাসিতে মুক্তা ঝরে। তাঁর নাম রাখা হয় লালমন। লছিমন নিজের অসহনীয় অবস্থা সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে কাঠুরিয়ার ঘর ছেড়ে বনে বনে ঘুরতে থাকে।

এদিকে লালমন তাঁর নিজের আসল পরিচয় না জানা অবস্থায় কাঠুরিয়ার ঘরে বড় হতে থাকে। একদিন স্কুলে যাবার পথে লছিমনের সাথে দেখা হলে অল্পের মধ্যেই একে অপরের পরিচয় জেনে যায়। সে তাঁর মায়ের করুণ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য বাবার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এদিকে লছিমন তাঁর ছেলেকে রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে জানতে পেরে রাজা কাগনুন লছিমনকে বন্দি করে। পথিমধ্যে লালমন আলমের পরিচয় না জেনে তাঁকে বাধা দেয়। উভয়ের সংঘটিত যুদ্ধে লালমন হেরে যায়। তারা তাঁদের নিজেদের পরিচয় জানতে পেরে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজা কাগনুন লছিমনকে আটকে রেখেছে জানতে পেরে আলম রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যে কোন উপায়ই হোক আলম এবং লালমনকে রাজা পরাজিত করে। তারা সন্যাসীর সাহায্য প্রার্থনা করে। সন্যাসীর সাহায্যে তারা যুদ্ধে জয়ী হয়। এর পরে লালমনের জন্ম রহস্য সবার সামনে পরিস্কার হয়ে গেলে বৃদ্ধ রাজা, তাঁর ছেলে, পুত্র বধূ এবং নাতীর পূণর্মিলন ঘটে। তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।[৫৭]

অভিনয় কাঠামো : সাধারণত দিনে এবং রাতে উভয় সময়েই এই গান অভিনীত হয়ে থাকে। দিনের অভিনয় সকাল নয়টার দিকে শুরু হলে বেলা একটার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। আর রাতের বেলা রাত আটটার দিকে শুরু হলে শেষ হতে প্রায় একটা বেজে যায়। পালার অভিনয় শুরুর পূর্বে দলপ্রধান বা মূল গায়েন মুহাম্মদ গফ্ফার কিছু গোপনীয় নিয়ম কানুন মেনে চলেন। বিশেষ করে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য এগুলি করেন। প্রথমে নিজেকে রক্ষার জন্য মন্ত্র পড়ে নিজেকে বেধে নেন। এর পরে মন্ত্র পড়ে এক এক করে অভিনেতাবৃন্দ ও আসর বেধে নেন্। অভিনয়ের শুরুতে যন্ত্রীদল কিছুক্ষণ যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। এরপর বাদ্যসহকারে চারজনের একটি দল কোরাস গানের মাধ্যমে বন্দনা গান পরিবেশন করেন। বন্দনায় প্রথমে আল্লাহকে সালাম জানানো হয়। এরপরে সালাম জানানো হয় নবীকে। পশ্চিমে বন্দনা করা হয় মক্কা বড়স্তান (ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে-বড়স্থান), উত্তরে হিমালয় পর্বত বন্দনা করা হয়। দক্ষিণে ক্ষীর নদীর সাগরকে আর পূর্বে করা হয় সূর্য দেবতাকে। পালাগানে মূল অভিনয় অংশ এবং তার অভিনয় উপাদান সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো :

১) সংলাপাত্মক অভিনয় গদ্য : আখ্যায়িকার একটি বড় অংশ গদ্য সংলাপের দ্বারা অভিনীত হয়ে থাকে। এখানে বৃত্তাকার আসরের কেন্দ্রস্থলে গোল হয়ে বসা অভিনেতাদের ভেতর থেকেই অভিনেয় চরিত্রগুলি আসরের

---

[৫৭] পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রস্থলের বৃত্তের বাইরে চলে আসেন এবং পুনরায় বৃত্তের মধ্যে ফিরে যান। বৃত্তের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসাকে অভিনয় আসরের মধ্যে চরিত্রের প্রবেশ এবং পুনরায় বৃত্তের ভেতরে গিয়ে বসা-কে অভিনয় আসর থেকে চরিত্রের প্রস্থান-কে নির্দেশ করে।

২) সংলাপাত্মক অভিনয় গীত : পালাগানের মধ্যে অভিনেয় চরিত্রগুলি বিভিন্ন সময় বাদ্য সংলাপের পাশাপাশি গীত-সংলাপও ব্যবহার করে থাকে।

৩) গদ্য বর্ণন বা বর্ণনাত্মক অভিনয় গদ্য : দুটি দৃশ্যকে সম্পর্কায়িত করার জন্য মূল গায়েন আসরের কেন্দ্রস্থিত বৃত্তের চারপার্শ্বে ঘুরে ঘুরে আখ্যায়িকার কাহিনীর সংক্ষিপ্ত গদ্য বর্ণনার দ্বারা অভিনয় করে থাকেন।

৪) বর্ণনাত্মক অভিনয়-গীত : কখনও কখনও গীত অংশের সাথে দৃশ্যের সমন্বয়ের জন্য কোরাস ও বাদ্যযন্ত্রীদের সহায়তায় আসরের কেন্দ্রের বৃত্তের চারপার্শ্বে ঘুরে ঘুরে বর্ণনাত্মক গীতের সাহায্যে অভিনয় করে থাকেন (স্থির চিত্র নং ৯)।

পালাগান (বগুড়া অঞ্চল), চিত্র নং ৯

উপরোক্ত অভিনয় উপাদানগুলি ছাড়াও পালাগানের উপস্থাপনায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিম্নরূপ-

১) মুখোশের ব্যবহার : মাত্র একটি দৃশ্যে বাঘের মুখোশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২) প্রপস্ : প্রপস্ হিসেবে তারবারি, খেলনা জাহাজ, বাঁশের চটি এবং গৃহস্থালীর নিত্য ব্যবহার্য বাসন-কোসন ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

৩) দান : অভিনয়ের মধ্যে লছিমনের পাগল হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ানোর সময় দর্শকদের কাছ থেকে ভিক্ষা তোলা হয়ে থাকে।

পালাগানের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও অঞ্চল ভিত্তিতে পালাগানের অভিনয় উপস্থাপনায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-

১) অভিনয় কাঠামোগত দিক থেকে দোহারেরা আসরের কেন্দ্রে বৃত্তাকারে অবস্থান করে।
২) দলের মধ্যে ছুকরীদের অংশগ্রহণে নৃত্য পরিবেশন (চিত্র নং ৯)।
৩) অভিনয়ের সময় মূল গায়েনের পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রের উপস্থিতি।
৪) মুখোশের ব্যবহার (যদিও খুবই সামান্য পরিমাণেই লক্ষ্য করা যায়)।

৩.২.৪. তারী গান

নড়াইল অঞ্চলে 'তারী গান' নামে যে নাট্যরীতির অভিনয় লক্ষ্য করা যায়, সে সম্পর্কে নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে নড়াইলের কালিয়ায় কিছু সংখ্যক তরুণ বয়সী ছেলেরা মিলে 'তারী গান' নামে নতুন একটি নাট্যরীতির প্রচলন ঘটান। এটা মূলত বিদ্রুপাত্মক কাজের উপর ভিত্তি করে রচিত, যা ঢাউস গান নামেও পরিচিত। সাধারণত ধান কাটার সময় ধান কাটার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকেরা এই গান গেয়ে থাকে। বর্তমানে সাধরণত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় তারী গানের আয়োজন করা হয়। শহরে বা গ্রামে-গঞ্জে দূর্গা পূজা, কালী পূজা, স্বরস্বতী পূজা ইত্যাদিতে এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে দেখা যায়। সমাজের বিভিন্ন শোষণ, নিপীড়ন, দুরাচার আর অপকর্মের বিরূদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করাই এই গান পরিবেশনার উদ্দেশ্য। গানের পরিবেশনায় সকল বয়সের সকল শ্রেণীর দর্শকদের সমাগম ঘটে থাকে। বিশেষ করে সাধারণভাবে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের উপস্থিতিই বেশি দেখা যায়। তারী গানের সকল কলাকুশলীই পুরুষ এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়েরই রয়েছে। পেশার দিক থেকে এদের অনেকেই ছাত্র, কেউ বেকার (বাড়ীতে কর্মহীন অবস্থায় বসে আছে), অথবা প্রাইভেট পড়াচ্ছে এরকম।[৫৮]

আসর : সন্ধ্যার দিকে স্কুল-কলেজের খেলার মাঠে অথবা উন্মুক্ত কোন স্থানে, ফাঁকা জায়গায় অথবা বাড়ীর উঠানে তারী গানের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অভিনয়ের জন্য সাময়িকভাবে মাটি থেকে প্রায় ১৮"(ইঞ্চি) উঁচু এবং ১২'(ফুট) বর্গাকৃতির মঞ্চ তৈরী করা হয় (লেখচিত্র নং ৩)। । অভিনয় মঞ্চের উপরে চাঁদোয়া বা সামিয়ানা টাঙানোর জন্য মঞ্চের চারকোণে চারটি খুঁটি দাঁড়া করানো থাকে। আলোর উৎস হিসেবে হ্যাজাক বা বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করা হয়। দর্শকেরা অভিনয় মঞ্চকে তিন দিক থেকে ঘিরে মাটিতে বসে থাকে। কেননা অভিনয় মঞ্চের চতুর্থ পার্শ্বে (অভিনয় মঞ্চের পেছনের অংশ) কালো পর্দা ঝোলানো থাকে।

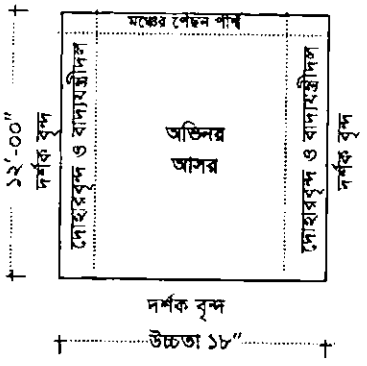

তারীগান (নড়াইল)
লেখচিত্র নং ৩

দলের গঠন : একজন কবিয়াল, পাঁচজন বাদ্যযন্ত্রীদল এবং চার থেকে ছয়জনের দোহার দল নিয়ে তারী গানের দল গঠিত। তাঁদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে ঢোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, দোতারা, জুড়ি উল্লেখযোগ্য।

এই গানের পরিবেশনায় মন্দিরা, জুড়ি বাদক এবং ঢোল বা তবলা বাদকসহ দোহার দলের একটি অংশ মঞ্চের বামদিকে মঞ্চের আপ-স্টেজ থেকে ডাউন স্টেজ পর্যন্ত পাশাপাশিভাবে বসে থাকে এবং হারমোনিয়াম, বাঁশিসহ দোহারদলের বাকী অংশ মঞ্চের ডান দিকে (দর্শকের দিকে মুখ করে বাম দিকে) পূর্বের নিয়মে মঞ্চের বাম পার্শ্বের দোহার দলের মুখোমুখি হয়ে আসন গ্রহণ করে। তবে কখনও কখনও দোহারদল ও বাদ্যযন্ত্রীদল একত্রে অর্ধবৃত্তাকারে দর্শকের দিকে মুখ করে বসে থাকে।

পোশাক-পরিচ্ছদ : গানের মধ্যে প্রত্যেক কলাকুশলীই সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী পরিধান করে থাকে। এরূপ একটি তারী গানের দলনেতা হলেন টুলু গাজী। তাঁর কথা মতে, এর (তারী গান) কাহিনীগুলি (text) সংক্ষিপ্ত আকারে মিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ণনাত্মকরীতিতে খণ্ড-খণ্ড অংশে পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিষয়ের দিক থেকে এসব কাহিনী ৭১ এর যুদ্ধ, সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের শোষণের চিত্র এবং শহরে ও গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের চিত্রগুলি নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। যেমন- যৌতুকের বিষয়ে একটি কাহিনীতে দেখানো হয়েছে কিভাবে যৌতুক দেয়া হয়, যৌতুক আদায় করা হয়, বিয়ের যৌতুকের লেন-দেনে মূল ভূমিকায় যারা থাকেন, যৌতুকের পরিমাণ সামর্থ্যের বাইরে হলে কন্যার পিতার সামাজিক ও মানসিক অবস্থা, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করেও কন্যার পিতা যখন যৌতুকের টাকা জোগাড় করতে না পারে, যৌতুকের কারণে কিভাবে বিয়ে ভেঙ্গে যায়, অথবা স্বামীর বাড়ী গিয়ে শাশুড়ী, ননদ কর্তৃক সীমাহীন অত্যাচার আর নির্যাতনের শিকার হয়ে অবশেষে আত্মহত্যা করে ইত্যাদি।

মূল অভিনায়ংশ উপস্থাপন : বাদ্যযন্ত্রীদলের যন্ত্রসঙ্গীতের (কনসার্ট) মধ্য দিয়ে তারীগানের অভিনয় শুরু হয়। ঠিক এর পরপরই গানের বন্দনা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এরপর অভিনেতারা আলাদা আলাদা বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের অভিনয় প্রদর্শন করে থাকে। তারী গানের অভিনয় উপাদানগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো :

১) বর্ণনাত্মক অভিনয় পদ্য : নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক প্রতিটি বিষয়ের অভিনয়ের শুরুতে কবিয়াল মিত্রাক্ষর ছন্দে ছড়ার মতো করে নাট্যাভিনয়ের আগেই তার কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে থাকেন।
২) বর্ণনাত্মক অভিনয় গদ্য ও গীত : পাইল-দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীদের পরিবেশিত বাদ্যযন্ত্র সহকারে কবিয়াল তাঁর পরিবেশিত বিষয়গুলির গান গেয়ে যান এবং গানের মাধ্যমে চরিত্রের হয়ে বর্ণনাও করেন। একটি গান শেষ হবার পর আরেকটি গান শুরুর আগে তিনি কথ্য ভাষায় গদ্যে বিভিন্ন রকম সমালোচনা ও মন্তব্য করে থাকেন। অভিনয়ের সময় প্রায়ই পাইল দোহারদের ভেতর থেকে একজন তাঁর (কবিয়াল) পরিবেশিত গান, সমালোচনা ও মন্তব্যের সূত্র ধরে ছোট-ছোট প্রশ্ন করে, যা 'তারী গান'কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে থাকে। 'তারী'র গানগুলি খুবই জনপ্রিয় সুরে (যেমন : কীর্তন গান, ঢাউস গান ইত্যাদি) পরিবেশিত হয়ে থাকে।

[৫৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮-৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

৩) অভিনয়ের সময়কাল : তারীগানের অভিনয় সাধারণত এক থেকে দেড় ঘন্টার হয়ে থাকে। গানের শেষে দর্শকদের সম্মান জানানো হয় এবং কলাকুশলীদের পরিচিতিমূলক শেষ গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তারীগানে যবানিকা টানা হয়।

পূর্ব ময়মনসিং অঞ্চলের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর পরিবেশিত পালাগানের সাথে টুলু গাজী পরিবেশিত তারী গানের উপস্থাপনার মধ্যে নিম্নরূপ মিল পরিলক্ষিত হয় :

ক) তারীগান এবং পালাগান উভয় রীতিতেই মূল গায়েনের সাথে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত পরিমাণের সংলাপের আদান-প্রদানের জন্য দোহারদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান সহযোগী রূপে অভিনয় করতে দেখা যায়।
খ) উভয় পরিবেশনার মধ্যে অভিনয় উপাদান হিসেবে বর্ণনাত্মক গদ্য ও গীতের ব্যবহার বেশী পরিলক্ষিত হয়।
গ) উভয় পরিবেশনারই একজন মূল গায়েন হিসেবে সমস্ত পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে।

আর যেসব অমিল পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ :
তারী গানে কাহিনীর বিষয় হিসেবে সমাজের অসংগতিমূলক আচরণ, শ্রেণীবিভেদ ও অনৈতিক কার্যকলাপ স্থান পেয়েছে। যা সমাজের সাধারণদেরকে বিনোদনের মাধ্যমে সচেতন করার প্রয়াসে একটি ঐচ্ছিক পদক্ষেপ। বিপরীতে ইসলাম উদ্দিনের পরিবেশিত পালাগানের কাহিনী পার্থিব-অপার্থিব, জাগতিক-আধিজাগতিক, বাস্তব-ঐতিহাসিকবাস্তব ও কল্পনার সমন্বয়ে মিশ্রিত রাজা-রানী-রাক্ষস-পরীদের কাহিনী, যা শুধুমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যেই পরিবেশিত হয়ে থাকে।

ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর পরিবেশিত পালাগানের রীতিটি যেহেতু তারীগানের রীতির থেকে পুরোনো এবং শুধুমাত্র কাহিনীর বিষয় ছাড়া উভয়ের পরিবেশনাগত উদ্দেশ্য ও প্রায়োগিক দিক প্রায় একইরকম হওয়ার কারণে তারীগানকে পালাগানের একটি অপভ্রংশ রীতি বলা যেতে পারে।

৩.২.৫. রয়ানী গান

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে সর্পদেবী বলে পরিচিত মনসার মাহাত্ম্য ও স্তুতির উদ্দেশ্যে 'রয়ানী গান' নামে এক ধরনের নাট্যরীতি লক্ষ্য করা যায়। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা নেতৃত্বেও একক ভাবে এই গান পরিবেশিত হতে দেখা যায়। চৈত্র ও পৌষ মাস ছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে (কেননা শীতকালে দৈনন্দিন কাজের চাপ বেশি থাকে বলে মনসা পূজা দেয়া হয় না) মানসিক বা মানত এবং মনোসিক বা ধর্মীয় পূণ্য অর্জনে কোন স্বচ্ছল ব্যক্তিবর্গের অর্থায়নে এই পরিবেশনার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাধারণত ৩, ৫ বা ৭ দিনের জন্য এই গানের আয়োজন করা হয়। রয়ানীগানে একজন মাত্র মূল গায়েন থাকেন যিনি দোহার ও বাদ্যযন্ত্রী সহযোগে সমস্ত গান পরিবেশন করেন। এরূপ একটি দলের মূল গায়েন হলেন রাধালক্ষ্মী, বয়স প্রায় ৭০ বছর, পিরোজপুর সদর থানার অন্তর্গত মাছিমপুর গ্রামনিবাসী। স্বামী : হরি পাগল গোস্বামী (মৃত), মিঠাখালী, মঠবাড়িয়া থানা। ছেলে-মেয়ে নেই। জীবিকা উপার্জনের জন্য তিনি ৪০ বৎসর ধরে এই গান পরিবেশন করে এসেছেন। পাশাপাশি তিনি একজন ব্যবসায়ী তবে তাঁর মূল জীবীকা ব্যবসা নয়, এই 'রয়ানী গান' পরিবেশনা। স্বামীর মৃত্যুর পরে মায়ের আদেশে, এখন মনের টানে এই গান পরিবেশন করেন বলে তিনি জানান (চিত্র নং ১০)। পরিবারে উৎসাহ দেবার কেউ নেই। যখন তিনি রয়ানী গান গাওয়া শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বৎসর। বিয়ের তিন বছর পরে স্বামীর মৃত্যু হয়। বই পড়ে এবং মানুষের মুখে মুখে শুনে, গুরুর কাছ থেকে শিখেছেন। রয়ানী গানের পুরোটা মুখস্ত করতে তার প্রায় ৬/৭ বছর লেগেছিল। আগে যারা গাইতেন তারা হলেন : কলাফতী- আশ্বিণী ঢালী। শিক্ষানবিশ অবস্থায় গাইতেন বলে তখন কোন পারিশমিক পেতেন না। মোট ৭জন সদস্য নিয়ে তাঁর দল

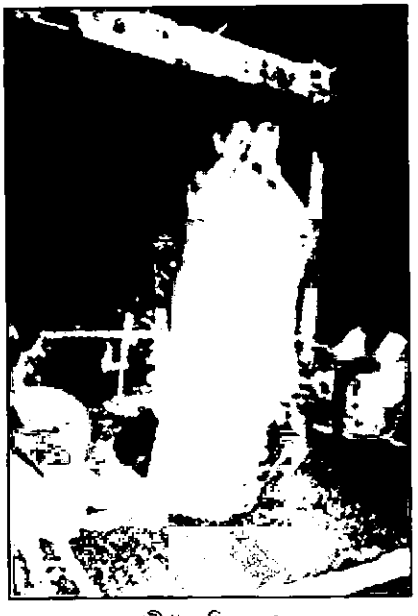
রয়ানীগান, চিত্র নং ১০

Dhaka University Institutional Repository

গঠিত। দলের অন্যান্য সদস্যদের নাম এবং তারা যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন তা যথাক্রমে উল্লেখ করা হলো- রয়ানী গানের পরিবেশনার মধ্যে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম-১ জন (রমারন)/মহানন্দ, চাকী-১ জন (অমল মণ্ডল), খোল-১ জন (কুঞ্জ বাইন), এবং দোহার হিসেবে রাধালক্ষ্মী ব্যতীত যে তিনজন মহিলা কাজ করে থাকেন তারা হলেন- ১. শোভা, ২. পারুল (শিকারপুর), এবং ৩. রমারন। এরা সবাই আত্মীয় সম্পর্কিত। জন্মসূত্রে এদের সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বর্ণজাত। তবে গানের চড়া সুরগুলি জোরালো রূপে গাওয়ার জন্য একজন সহযোগী গায়েন রাখেন। সহযোগী গায়েন হিসেবে পারুল অথবা শোভার সাহায্য নিয়ে থাকেন। পারুল, শোভা ছাড়াও কাহিনীর বর্ণনায় ও চরিত্রাভিনয়ে প্রয়োজনমতো রমারনেরও (মহিলা) সাহায্য নিয়ে থাকেন।[৫৯]

রয়ানী গান, চিত্র নং ১১

পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিবেশনার উদ্দেশ্য : সাধারণত ধর্মীয় পূণ্য অর্জন, রোগ-মুক্তি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা কামনায়, সন্তান লাভ, বিদেশযাত্রার শুভকামনায় বা বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্খায় মানত হিসেবে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত উদ্যোগে এই রীতির পরিবেশনা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শেণীর সাধারণ মানুষ এই গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। লোক মারফত গান পরিবেশনের বায়না করা হয়ে থাকে। বছরে প্রায় ছয় মাস তিনি এই রয়ানী গান পরিবেশন করে থাকেন। এই ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ১৫টি বায়নার কাজ করে থাকেন। ফাল্গুনে, বৈশাখে বেশি এবং মাঘে বায়নার ডাক কম আসে। দক্ষিণ অঞ্চলেই বেশির ভাগ বায়নার ডাক পড়ে থাকে।

রয়ানীগান, চিত্র নং (উপর থেকে যথাক্রমে) ১২-১৩

মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও প্রতি বছর এই গানের পৃষ্ঠপোষকতা কম-বেশি পেয়ে থাকে বলে রাধালক্ষ্মী উল্লেখ করেন। অধিকাংশক্ষেত্রেই দর্শক আসনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় সমসংখ্যক দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। গান পরিবেশনে বায়নার টাকা ছাড়াও কিছু দ্রব্য সামগ্রী (ধূতি, গামছা প্রভৃতি) এবং প্যালা তোলা (পরিবেশনাকালীন দর্শকদের নিকট থেকে সংগৃহীত) কিছু অর্থ পেয়ে থাকেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিন দিনের বায়না হয়ে থাকে বলে জানা যায়। গান পরিবেশনের সময় ছাড়া বাকী সময়টা রাধালক্ষ্মী কাচামালের ব্যবসা করে কাটান।

পরিবেশনাগত তথ্য : আঙ্গিক অভিনয় করেন নিজের বিবেক দিয়ে। একাই গেয়ে থাকেন, পাছে পাইল দেয়ান অন্যরা গাইলে বলে দিতে হয়। বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া রয়ানী গান গাওয়া সম্ভব নয়। গান গাইতে কোন প্রস্তুতিমূলক মহড়ার দরকার হয় না।

প্রপস : গান পরিবেশনের সময় রাধালক্ষ্মী হাতে একটি চামড় ব্যবহার করেন। আর পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে নিজের নিত্যব্যবহার্য কাপড় (শাড়ী - নীল জমিনের উপর সাদা বা সোনালী পাড় বা হলুদ স্টেপ যুক্ত লাল পাড় ও

[৫৯] সাক্ষাৎকার গ্রহণ: রাধালক্ষ্মী, মাছিমপুর বাজার, পিরোজপুর সদর, ডিসেম্বর, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ব্লাউজ-সাদা/নীল/হলুদ রঙ) এবং হলুদ রঙের উত্তরীয় ব্যবহার করেন। পায়ে ঘুঙুর ব্যবহার করে থাকেন। সাজ্-সজ্জার ব্যাপার তেমন নেই শুধু কপালে তিলক পড়েন (রয়ানী গান, চিত্র নং ১০, ১১)।

গান পরিবেশনে প্রথাসিদ্ধ আচার-ব্যবহার : পূর্বে রয়ানী গান পরিবেশনের আগে উপোষ থাকতেন। এখন থাকেন না। উত্তর-পূর্বে মনসার ঘট বসান। সকালে ঘট বসালে সন্ধ্যা অধিবাস করতে হয়। রয়ানী গানে দুটো ঘটের দরকার হয়। আরো যা যা দরকার হয় সেগুলি হল- নতুন কুলায় ৪/১ সের চাল, ৫টাকা ৫৫ পয়সা, একটা নতুন গামছা এবং একটি নারিকেল নিয়ে যার জন্য রয়ানী গাওয়া হয়, তিনি মূল গায়িকার হাতে দিয়ে বলেন, "আমাকে দেনা থেকে রক্ষা করেন।" মনসার ঘটটি সালু কাপড় বা গামছা দিয়ে আচ্ছাদন হিসেবে ঘেরা থাকে। মাথার উপরে মালির ঝরা ফুল থাকে। মণ্ডপের ভেতরে কলার খোলের নৌকায় পুতুল থাকে, গান শেষে মনসার ঘট ঘরে যায় এবং বাকীগুলি পুরোহিত নিয়ে নেন্। ঘরে নিয়ে যাবার সময়ে ঘটের সাথে পুতুলও ঘরে থাকবে। রয়ানী গান পরিবেশনের সময় মন্দিরের সাথে পরিবেশন আসরের কোন যোগাযোগ থাকে না। তিলের তেলের প্রদীপ থাকে। লখিন্দরকে জিয়াতে জবাফুলের ডাল, ২১টি সুপারী, কলা, হাতের নখ, সোয়াসের চাল ইত্যাদির দরকার হয় (চিত্র নং ১৪)। গান গাওয়ায় বিপরীত কোন প্রভাব নেই। এ ব্যাপারে রাধালক্ষ্মীর ধর্মীয় অনুভূতির কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "সাপ মন্দিরে আসে, দুধ কলা খায়। প্রতিদিন সকালে ফুল, তুলসী পাতা দিয়ে মনসার ভোগ দেই। আর শ্রাবণ মাসে বেশি ফল মূল দিয়ে পূজা/ভোক্ দেই।"[৬০] অভিনেতারা গান পরিবেশনের মধ্যে বিরতি গ্রহণ করে থাকে।

মঞ্চ বা আসর : মঞ্চ সাড়ে তিন হাত থেকে চার হাত অর্থাৎ ৯′ X ৯′ বা ১২′ X ১২′ বর্গাকৃতির হয়ে থাকে (লেখচিত্র নং ৪ এবং চিত্র ১২-১৩)। আসরের মাথার উপরে টিনের চালা বা নলের চাচ্ বা তাবু থাকে টাঙানো থাকে। সাধারণত বেলা ৪টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত করা হয়। এই গান পরিবেশনে রবিবার, বৃহস্পতিবার লাগবেই। কারণ হিসেবে বলেন- রচনাকার বিজয়গুপ্ত ঐদিন রবিবার রাতে এই 'রয়ানী গান' রচনা করেন।

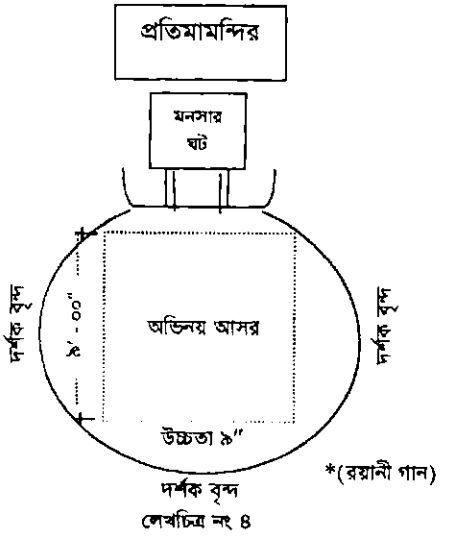

লেখচিত্র নং ৪

প্রবেশ-প্রস্থান : সমগ্র কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত সংলাপাত্মক ইম্প্রোভাইজড্ দৃশ্য ছাড়া অভিনয়ে প্রবেশ-প্রস্থান লক্ষ্য করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ- 'ধাইমা'র চরিত্রাভিনয়ে শোভা রানী দৃশ্যটি শুরুর পূর্বেই পাশের গৃহে তাঁর গায়ের উত্তরীয় মাথায় ব্যবহার করে বৃদ্ধ 'ধাইমা'র সাজে অপেক্ষা করেন। দৃশ্যটি শুরু হলে পারুল তার নাম ধরে (ধাই) ডাকলে লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ির মতো করে হেঁটে অভিনয় স্থানের পূর্ব প্রান্তের নির্দিষ্ট পথ দিয়ে আসরে প্রবেশ করেন। দৃশ্যটি শেষ হলে যেভাবে চরিত্রধারণ করে মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন, সেভাবে চরিত্র ধারন করে দোহারদের কাছাকাছি গিয়ে মাথার উত্তরীয় সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং নিজের পূর্বের আসনে বসে পড়েন।

কাহিনীর পালা-বিভাগ ও পরিবেশনকাল : রাধালক্ষ্মী রয়ানীর আখ্যানে মূলত বিজয়গুপ্ত রচিত পদ্মাপুরাণ অনুসরণ করে থাকেন। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, বিজয়গুপ্ত রচিত মূল পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণভাবে পরিবেশন করতে হলে ৩ মাস ১৩ দিনের প্রয়োজন হয় এবং সমগ্র আখ্যানটি ২২টি পালা বা খণ্ডে বিভক্ত করে পরিবেশন করতে হয়। তিনি ২২টি পালার কথা বললেও এই ২২টি পালার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ১১টি পালার নাম প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এই ১১টি পালার মধ্যে মিশ্রিত রয়েছে ২২টি পালা। নিম্নে তার উদ্ধৃত ১১টি পালার নাম উল্লেখ করা হলো :

১. মনসার জন্ম, ২. মনসার বিবাহ, ৩. মনসার বনবাস, ৪. রাখাল বাড়ির পূজা, ৫. চাঁদের বাদ, ৬. ছয় কুমার বধ, ৭. চাঁদের দুরাবস্থা, ৮. লখিন্দরের জন্ম, ৯. বিবাহ, ১০. দংশন এবং ১১. জীয়ন।

সাধারণত ১, ৩, ৫ বা ৭ দিনের পরিবেশনার জন্য সমগ্র আখ্যানটির সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত পরিবেশনার প্রয়োজন হয়। বায়নার সময় বা নির্ধারিত দিন অনুযায়ী তাঁর দল কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত ভাবে ১১টি পালাই পরিবেশন করেন। প্রতিদিনের পরিবেশনা দুই বেলায় করা হয়ে থাকে। দিনের প্রথম বেলায় সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত আর দ্বিতীয় বেলায় বিকেল ৫টা থেকে বিরতিহীনভাবে রাত ১১টা পর্যন্ত পরিবেশন করে থাকেন।

---

[৬০] পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি আসরেই তাৎক্ষণিকভাবে নতুন নতুন পদ বিন্যাসের মাধ্যমে (সমস্ত আখ্যানের ঘটনা-বিন্যাস অক্ষুণ্ন রেখে) কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত পরিবেশনা করতে হয়। ফলে আসরে পদ-বিন্যাসের সাথে রচিত পাণ্ডুলিপির পদ-বিন্যাসের বা চরণ থেকে চরণে খুব কমই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই মধ্যযুগের 'মনসা মঙ্গলে'র কবি বিজয়গুপ্ত রচিত পদ্মাপুরাণ আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কাগজে লিপিবদ্ধ একটি স্থির কাহিনীতে আবদ্ধ থাকেনি বরং সর্বদাই নতুন নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে আসর থেকে আসরে এক একটি জীবন্ত কাহিনীর রূপ লাভ করেছে।

পরিবেশনরীতি এবং অভিনয় উপাদান : সমগ্র পরিবেশনার দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথমত: আখ্যান পরিবেশনার পূর্ববর্তী পর্ব। যার সাথে যুক্ত রয়েছে কুশীলবদের প্রস্তুতিমূলক ক্রিয়া এবং ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ত: মূল আখ্যান পরিবেশনা। প্রথম পর্যায়ের শুরুতে হারমোনিয়াম মাষ্টার মহানন্দসহ যন্ত্রীদল মঞ্চে উপবেশন করেন এবং স্ব-স্ব নির্ধারিত স্থানে বাদ্যযন্ত্র রেখে ভক্তি যোগে প্রণাম করেন। তারপর মহানন্দ তাঁর হারমোনিয়ামে গীত পরিবেশনার একটি সাধারণ স্কেল অনুযায়ী কুঞ্জ বাইন খোল এবং অমল মণ্ডলের 'চাকী'র সাথে টিউনিং বা সুর সমন্বয় করেন। টিউনিং শেষে পরিবেশিত হয় প্রচলিত বা জনপ্রিয় কোন লোকগীতির সুরে একটি যন্ত্রসংগীত বা কনসার্ট পরিবেশনা। এসময় মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁর শাস্ত্রীয় বিধান মতে পূজার কাজ পরিচালনা শুরু করেন। কনসার্ট চলাকালে রাধালক্ষ্মীসহ তাঁর দুই সহযোগী শোভা ও পারুল ক্রমানুসারে মঞ্চে উপবেশন করে দেবী মনসাকে প্রণাম, চারদিকে দর্শক ও বাদ্যযন্ত্রগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করে তাদের নির্ধারিত আসনে বসে পড়েন। কনসার্ট শেষে শুরু হয় বন্দনা গীত।

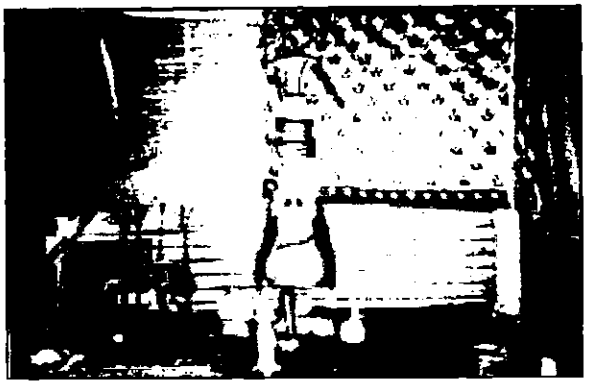
রয়ানীগান, চিত্র নং ১৪

বন্দনা পরিবেশনের পূর্বেই পুরোহিত শাস্ত্রীয় বিধান মতে মন্দিরে ঘট স্থাপনা কার্য সম্পন্ন করেন। মানসিক (যিনি মানত করে গানের আয়োজন করেন) অভিনয় স্থানের উত্তর-পূর্ব কোণে মন্দিরমুখী হয়ে প্রণামরত দণ্ডায়মান অবস্থানে থেকে বন্দনা গীত পরিবেশন করেন। ফলে মানসা, পূজা ও পরিবেশনা পরস্পরে একই সম্পর্কে এসে দাঁড়ায়। আর এটাই হচ্ছে - 'স্তুতি'।

বন্দনার মধ্যে দেবী মনসা, বিভিন্ন দেব-দেবী, মুনি-ঋষি, শিক্ষাগুরু, দিক বন্দনা প্রভৃতি বর্ণনাত্মক গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। দুইজন গায়েন সর্বদাই পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানে থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিমমুখী উলম্ব চলনের মাধ্যমে কোরাস কণ্ঠে এই গীত পরিবেশন করেন। এই বন্দনা গীতাভিনয়ের সামগ্রিক ক্রিয়ার দ্বারা চারদিকে দর্শকদের একযোগে অন্তর্ভুক্ত করাই হল গায়েনদ্বয়ের এরূপ চলন ভঙ্গিমায় গীত পরিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য। বন্দনা পরিবেশনার পর শুরু হয় মূল আখ্যান পরিবেশনা। আখ্যান পরিবেশনার পূর্বে মানতকারী দেবী মনসাকে (মনসার ঘট, চিত্র নং ১৪) প্রণাম জানিয়ে অভিনয় স্থান ত্যাগ করেন। বন্দনা গানের মাঝে তাঁর এরূপ দণ্ডায়মান অবস্থানের কারন হচ্ছে, দেবী মনসার কৃপা লাভে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা। পরিবেশনার অন্য আরও একটি অংশে তাঁকে পরিবেশনার সাথে যুক্ত হতে দেখা যায়। বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ অনুষ্ঠানে পদ্মার নাগ দর্শনে লখিন্দর ভয়ে অচেতন হয়ে পড়লে বেহুলা পদ্মার আলয়ে চলে যায় এবং পদ্মার নিকট হতে পুষ্প জল বর নিয়ে ফিরে এসে অচেতন লখিন্দরের শরীরে ছিটিয়ে দিয়ে চেতন ফিরিয়ে আনে। এই দৃশ্যে লখিন্দরের অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ হওয়ার সাথে মানতকারীর রোগ মুক্তিকে সংযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এসময়ে পুরোহিত কর্তৃক মন্ত্রপাঠ যুক্ত জলপূর্ণ ছোট একটি পিতলের ঘট (দেবী মনসা প্রদত্ত পুষ্পজলের বর স্বরূপ) মানতকারীকে অভিনয় স্থানের মাঝে মন্দিরমুখী হয়ে হাঁটুগেড়ে বসিয়ে গায়ে ছিটিয়ে দেয়া হয়। যেন সেও সকল রোগ-বালাই থেকে মুক্তি লাভ করে (রয়ানীগান চিত্র নং ১৫)।

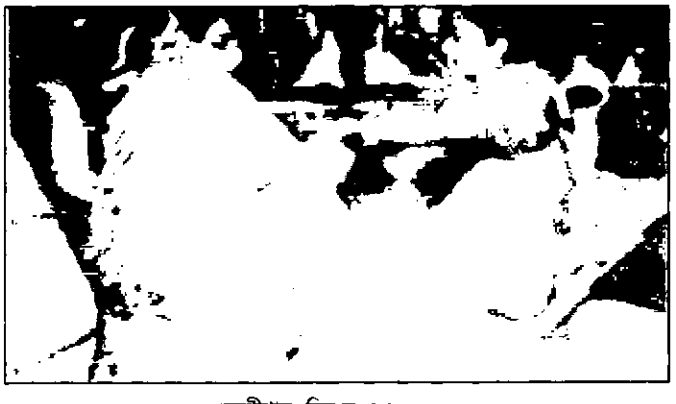
রয়ানীগান, চিত্র নং ১৫

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও আখ্যানভাগের কিছু অংশে মনসা দেবী বর প্রদান করেন; যেমন- ঝালু-মালুর বর প্রদান, পুত্রবর দান প্রভৃতি। এসকল ক্ষেত্রে পুরোহিত কর্তৃক মন্ত্রপাঠ যুক্ত ভোক্ গ্রহণ করতে হয় মানতকারী পরিবারের যে কোন ব্যক্তিকে। উল্লেখ্য, মনসাদেবীর 'পুত্র বর দান' অংশ পরিবেশনায় মানতকারীকে কুলায় করে পান, সুপারি এবং চাল ও চামরের পবিত্র স্পর্শ গ্রহণ করতে দেখা যায় (রয়ানীগান চিত্র নং ১৫)। এভাবে দেবী মনসার সন্তুষ্টি বিধানে ধর্মীয় পূজা আচারের সাথে এবং মানসাকারী ও তাঁর পরিবারের সাথে পরিবেশনাকে যুক্ত হতে দেখা যায়।

রাধালক্ষ্মী দলের পরিবেশিত রয়ানী গানের অংগী বা মূখ্য অভিনয় উপাদান হচ্ছে বর্ণনাত্মক-গীত। এছাড়াও কিছু কিছু নির্দিষ্ট দৃশ্যের পরিবেশনায় তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট সংলাপাত্মক-গদ্য উপাদানের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই সংলাপাত্মক উপাদানের মধ্যেই আবার কখনো কখনো সংলাপাত্মক-পদ্য এবং গীত অংশের সংক্ষিপ্ত পরিবেশনা দেখা যায়। বর্ণনাত্মক গদ্য সাধারণত পরিবেশনার অভ্যন্তরে কোন বিষয় সম্পর্কে দর্শকেরা প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে তখন সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বর্ণনাত্মক গদ্যে কাহিনীর বর্ণনা করে থাকেন বলে জানা যায়।

সংলাপাত্মক গদ্য/পদ্য/গীত : রাধালক্ষ্মী দলের পরিবেশিত রয়ানী গানে সংলাপাত্মক উপাদান সমূহের প্রয়োগ পরিষ্কার ভাবে এবং পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত ভাবে সংযুক্ত হয়েছে। মূল পরিবেশনারীতি হতে এই পরিবেশনা সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা নির্দিষ্ট কয়েকটি দৃশ্যের এই সংলাপাত্মক অভিনয় সম্পূর্ণরূপে ইম্প্রোভাইজেশনের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। কাহিনী বহির্ভূত সমসাময়িক বিষয় সম্বলিত সংলাপের আধিক্য হেতু হাস্যরসযুক্ত এই উপাদানের প্রয়োগকে প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

রয়ানীগান, চিত্র নং ১৬

বেহুলা লখিন্দরের বিবাহ, ঝালু-মালুর মাছ ধরা, রতি ধাই এর শাক তোলা এবং গোঁদার ঘাট এই চারটি অংশে সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবেশিত হয়। শাক তোলা দৃশ্যে গায়েন (পারুল) বৃদ্ধা সেজে অভিনয় করে। এসময়ে সে এই দৃশ্যের কিছু অংশ বর্ণনাত্মক গীতের মাধ্যমে কোমড় দুলিয়ে নৃত্যের তালে তালে অভিনয় পরিবেশন করে থাকে এবং কিছুটা অংশ সংলাপাত্মক গদ্যে পরিবেশন করে। এছাড়াও আরোও কয়েকটি দৃশ্যে যেমন- গোঁদার ঘাট, ঝালু-মালুর মাছ ধরা প্রভৃতি অংশে সংলাপাত্মক অভিনয় হলেও এখানে পোশাকের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। অভিনয় উপাদান হিসেবে সংলাপাত্মক গীতের সংক্ষিপ্ত পরিবেশনা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও রয়ানী গানের পরিবেশনায় গানের ছন্দের পদবিন্যাসে তিন ধরনের ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি নিম্নরূপ-

১. একপদী ছন্দ - প্রতিটি একক চরণ শেষে সংক্ষিপ্ত ধুয়ার পরিবেশনা।
২. দ্বি-পদী ছন্দ - দুই চরণে পরিবেশিত পদ।
৩. ত্রিপদী ছন্দ - তিনটি চরণ সমন্বয়ে গঠিত পদ।

রয়ানী গানের বিভিন্ন অভিনয় উপাদান সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গে রয়ানীগানের ছন্দ পদবিন্যাসের ব্যবহার সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। নীচে সংলাপাত্মক গদ্য ও গীতের দু'টি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল :

সংলাপাত্মক গদ্য :
সোনারানীর চিকিৎসায় ধাইয়ের আমন্ত্রণ (চিত্র নং ১৬) :
ধাই (গায়েন-১) : এই ধাই ডাকে কিডা কতি পারো?
সহযোগী (গায়েন-২) : কিডা?
১ : এই অনেক দিন তো গান গাওয়া ছাড়ান দিছি। কেবল আবার ওই আরম্ভ হয়া গেছে।
২ : ইবারে নতুন?
১ : হ এই জয়েন্ট করিছি।
২ : জয়েন্ট করিছো? তারপর...
১ : এম্নে, ওই যে, ধাই-মা ডাকতিছে না, এই ধাই মা ডাকে কিডা কতি পারো?

Dhaka University Institutional Repository

১ : এ আমার এট্টা ছেলে আছে।
২ : তারপর...
১ : তার নাম কী জানো?
২ : কী নাম?
১ : তার নাম হচ্ছে নোটু।
২ : নোটু।
১ : ওই... নোটুর বাবা, আমারে ধাই মা বুলে ডাকে।
২ : নামটা কী আল্লারতে নামী?
১ : গৌরবের নাম। ওই নোটুর বাবা আমরে ধাই মা ডাকে? করিছি কি... এত্‌দিন বাড়িতি আসে দাইমা দাইমা করে, আমি কিছু কই নে... একদিন কায়দা মত উত্তর দিয়েছি।
২ : কী রকম...। এট্টু দিয়ে ফেলাও দিন।
১ : দেবো?
২ : হ।
১ : এ রাতকে গান কি দিনি হয়?
২ : হয় তো না, একুন এদের তো লাগবে...।
১ : নোটুর বাবারে কি বলেছি শুনবা?
২ : শুনবো।

{বর্ণনাত্মক গীত : নৃত্য সহ পরিবেশিত}

১ : আরে ধাইমা ধাইমা বুলে ডাকছে আমায় কে?
হাটিতে পারি না আমার কুত্তো বিয়ায়ছে।
২ : কী কুত্তো বিয়ায়ছে? বলো কী?

এভাবে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের দ্বারা দৃশ্যটি এগিয়ে চলে। উপরোক্ত এই দৃশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কথোপকথনের দৃশ্য 'যোগীর গান' এ ভর্তৃদাস ও যোগীর সাথেও অভিনীত হয়ে থাকে। ভর্তৃদাস (বোকা চরিত্রের) তাঁর স্ত্রীকে রমার মা বলে সম্বোধন করার পরিবর্তে 'আমার মা' বলে সম্বোধনের কাহিনী বর্ণনার দ্বারা হাস্যরসাত্মক অভিনয় পর্বের সৃষ্টি করে। নিজের স্ত্রীকে যে 'মা' বলে সম্বোধন করতে নেই, সে কথা যোগী ভর্তৃদাসকে বোঝাতে গেলে ভর্তৃদাস স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করার হাস্যকর যুক্তি দেখায়। কিন্তু ভর্তৃদাসের উদ্দেশ্য শুধু হাস্যরসের অবতারনা করাই নয়, বরং স্বামীকেও যে স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখানো উচিত সে বিষয়টি সাধারণ দর্শকদেরকে জানানোর উদ্দেশ্যেই ভর্তৃদাস আলোচ্য বিষয়টিকে নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সংলাপাত্মক আলোচনায় নিয়ে আসে। অপরদিকে, রয়ানী গানে যেহেতু মহিলা পরিবেশিত সে কারণে মহিলাদেরকে পুরুষের দ্বারা হেয় হওয়ার প্রতিবাদ স্বরূপ উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তাহল, 'রয়ানীগান' ও 'যোগীর গান' দুটি ভিন্ন ধারার নাট্যরীতি হলেও উভয়ের পরিবেশনায় নারীর প্রতি সম্মান বা পুরুষ দ্বারা নারীকে হেয় হওয়ার প্রতিবাদের ইঙ্গিতকে সূচিত করেছে, যদিও ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্নভাবে তা উপস্থাপিত হয়েছে। অভিনয়ের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপিত এরূপ বিষয়ের অবতারনা; সাধারণ দর্শকমনে যথেষ্ট হাস্যরসোদ্দীপকের সঞ্চার করে। লোকনাট্যে সংলাপাত্মক অভিনয়ের মধ্যে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অথচ উপেক্ষিত বিষয়গুলি হাস্যরসের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করার বিষয়টি লোকনাট্যকে একটি ভিন্ন মাত্রার বিশিষ্ট্যতা দান করেছে।

দৃশ্যের শেষে ধাইরূপে মূল গায়েন ও তাঁর সহযোগীর সংলাপাত্মক অভিনয় :

১ : তো মাইনে টাইনে দ্যাও।
২ : তা তুমি সওদাগরের (মানতকারীর) কাছে যায়া চেয়ে নাও। আমার এত বেতন-আমি কী করবো।
১ : তুমি কয়ে ফেলাও।
২ : আমি কোলি কাজ হবি না।
১ : বুড়ো মানুষ তো কতা ভাল লাগছে না।
২ : সওদাগর মশায় ওই যে দাঁড়ায়ে...ওই যে সনেকা (মানতকারীর স্ত্রী)
১ : সওদাগার মশায় আমার মাইনে টাইনে ইট্টু বাড়ায়ে দেও...আমা বাত তো ঢাকায় যাবো চিকিৎসা করতি...পিজি হাসপাতাল আছে না? ভর্তি হবো।
২ : মেডিকেলে...।

Dhaka University Institutional Repository

(মানতকারী ১০ টাকা দক্ষিণা প্রদান করে। এরপর শুরু হয় বর্ণনাত্মক গীতে রতি ধাইয়ের শাক তোলা অভিনয়)

সংলাপাত্মক গীত :
(নাপিতবাড়ি : লখিন্দরের খেউর কর্মে নিযুক্ত নাপিত)

নাপিতের স্ত্রী (গায়েন-১) :
সকাল সকাল আসতে কইতি নাপিত
সন্ধ্যা কেন তুমার হইলরে,
ওই ও...ওরে রসিক নাপিতরে॥
নাপিত (সহযোগী গায়েন-২) :
সকাল সকাল রানতে বইছিস ময়না
রান্নায় দেরী কেন হইলরে।
ওই ও...ওরে ওই আমার ফটকার মা।
১ : চালা-ডাল রইছে বাধালের হাটে (নিকটস্থ হাটের নাম) নাপিত।
আইনা তুমি আমার দেও নাইরে
ওই ও...ওরে, রসিক নাপিতরে॥
২ : টাকা পয়সা তুমার কাছে, বলি
আমায় কেন তুমি দ্যাও নাইরে
ওই ও...ওরে আমার গেদির মা।
১ : চাবি রইছে তুমার কাছে, নাপিত
আমায় তুমি দ্যাও নাইরে,
ওই ও...ওরে রসিক নাপিতরে॥
২ : চাবি রইছে পকেটে আমার
দিতে ভুল তাই হইয়াছে
ওই ও...ওরে আমার ময়নারে।

বর্ণনাত্মক গীত :
রয়ানী গানের পরিবেশনার অংগী অভিনয় উপাদান বর্ণনাত্মক গীত। কিন্তু এই উপাদান প্রয়োগে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ বর্ণনার চরণ প্রয়োগে যে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নরূপ-

১) একপদী চরণের বর্ণনাত্মক গীত : সাধারণত একজন গায়েন কর্তৃক এই ধরনের বর্ণনাত্মকগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ সময়ে গানের পয়ারের প্রতিটি একক চরণ শেষে ধুয়া পরিবেশিত হয়। কুশীলব বৃন্দ বসা অবস্থানে থেকেই এই ধুয়া পরিবেশন করেন। একজন গায়েন ধুয়ার প্রথম চরণ গাওয়ার পর সম্মিলিতভাবে আরও চারবার গাওয়া হয়। এক্ষেত্রে পয়ারের প্রতিটি একক চরণ শেষে সংক্ষিপ্তাকারে ধুয়া পরিবেশিত হয়ে থাকে। গায়েনের এই বর্ণনাত্মক পরিবেশনায় তাঁর শরীরে একটি ছন্দ ধরে রাখলেও সুস্পষ্ট কোন নৃত্যের প্রয়োগ দেখা যায় না। তাঁর চলন চারদিকে হলেও পূর্ব-পশ্চিম বরাবর উলম্ব চলনের নৃত্যের আধিক্য দেখা যায়। নীচে বর্ণনাত্মক-গীতের (একপদী চরণ) কিছু অংশ তুলে ধরা হল :

ধুয়া : আরে ও আনন্দের সীমা নাই।
পয়ার :
পাত্র-মিত্র নিয়ে সাধু বসিলেন সভায় (ধুয়া)
হেনকালে সোমাই পণ্ডিত আসিলেন হেথায়। "
চান্দ বলে সোমাই পণ্ডিত শুনো গো বচন। "
আমার লক্ষিন্দরকে বিবাহ দিব করিয়াছি মন। "
কোন দেশে কন্যা আছে কর যে গণনা। "
উজানিতে কন্যা আছে শুন তার বর্ণনা। "
সাহেরও কুমারী হয় সে বেউলা তার নাম। "
মরিলে জীয়াইতে পারে হারালে পায় ধন। "
আরো আছে গুণ তার শুনো দিয়ে মন। "
বিনা জ্বালে লোহার কলাই করিবে রন্ধন। "

Dhaka University Institutional Repository

এই কথা শুনিয়া চান্দ আনন্দিত মন। "
চণ্ডিকাঠি গণক নিয়া করিল গমন। "
হস্তি পিঠে করে দেখো চন্দ্রবণিক যায়। "
সাহে বেণের বাড়ি গিয়ে হইল উদয়। "

২) পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাত্মক গীত : এই ধরনের পরিবেশনায় একজন গায়েন পয়ারের প্রথম দুই চরণ গাওয়ার পর অন্যান্য কুশীলব পুনরায় উক্ত দুই চরণেরই পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। এইভাবে একজন গায়েন এবং অন্য সকল কুশীলবের মাধ্যমে এই ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক গীত পরিবেশিত হয়। এই সময়ে মূল গায়েনসহ তাঁর সহযোগী দোহারবৃন্দ আসরের মধ্যে গোল হয়ে বৃত্তাকারে অবস্থান করেন। গায়েনের একটি পদ সম্পূর্ণরূপে গাওয়া হলে অন্যান্য সকল কুশীলব তখন মূল গায়েনের গাওয়া পদের কোরাস ধরে পুনরায় উক্ত পদটি পরিবেশন করেন। এই ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক গীত পরিবেশনায় কাহিনী ধীর লয়ে এগিয়ে চলে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাহিনীর বর্ণনা করা হয়ে থাকে। গান পরিবেশনার শেষের দিকে tempo বা লয়ের বৃদ্ধি ঘটে। কারণ সমগ্র গীতটি তখন দ্রুত তালে নৃত্যসহ পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে চরণ দুটি প্রথমত: মূল গায়েন নৃত্যসহ পরিবেশন করলেও অন্য দুই সহযোগীরা আরও সুস্পষ্ট ও গতিশীল করে নৃত্যসহ গীত পরিবেশন করেন। এখানে মূল গায়েন নিজেই কাহিনী ও গানের গতিরেখা নিয়ন্ত্রণ করেন। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত রূপে পরিবেশনার জন্য কখনো কখনো তাঁর মত করে পদ বিন্যাস রচনা করেন অথবা পাণ্ডুলিপি রচিত পদ-বিন্যাস তাঁর মত করে সম্পাদন করে কাহিনীকে এগিয়ে নেন্। এই ধরনের গীতের শুরু এবং শেষে গানের ধুয়া পরিবেশিত হয়। কিন্তু গীত অভ্যন্তরে ধুয়া পরিবেশিত হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাত্মকগীতের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

ওরে ঝালু বলে মালুভাই চল ভাই মাছ ধরিতে
যাই চল যাই কালিদহ সাগরে॥

(দুইজন গায়েন পরপর পুনরাবৃত্তি করে গায়)

ওরে কালিদহ গরহিত জল মনটা করে টলমল
দুই ভাই ফেলে বড় জাল॥
ওরে সাত খেও উঠা-উঠি না বাধিল মৎস্য একগুটি
আরো খেও রে ফেলিল যখন॥
ওরে আরও খেও উঠা-উঠি না বাধিল মৎস্য চেলাপুটি
দুই ভাই করিল ক্রন্দন॥
ওরে ঝালু বলে মালু ভাই চল আমরা বাড়ি যাই
জালে মৎস্য না বাধিল আজি॥
তখন মনসা ভাবিয়া মনে খেও দিল ততক্ষণে
জালে ঘট বাধিল তখন॥
ওরে জাল মেলিয়া চায় চক্ষু তুলিয়া চায়
তুলে নেয় সে সুবর্ণেরই ঘট॥
বিজয় গুপ্ত কবি হয় পদ্মা মায়ের হউক জয়
পদ্মা মায়ের বল জয় হরি॥

৩) পালা-অনুসার বা একান্তরমূলক বর্ণনাত্মক গীত : পর্যায়ক্রমে বা পালা করে পদের চরণ গাওয়া হয় বলে পালা-অনুসার বা একান্তর মূলক গীত বলা হয়েছে। এই পরিবেশনায় মূলগায়েন প্রথমে একটি চরণ গাওয়ার পর সহযোগী গায়েন অথবা সকল কুশীলবের কোরাসগীতের মাধ্যমে পদটির দ্বিতীয় চরণ পরিবেশন করেন। এই ধরনের পরিবেশনার শুরুতেই ধুয়া পরিবেশিত হয়ে থাকে কিন্তু গীত অভ্যন্তরে ধুয়া গীত পরিবেশিত হয় না। মূল গায়েন এবং তাঁর সহযোগী গায়েন পালা করে চরণগীত পরিবেশন করে বলে কাহিনী খুবই দ্রুত এগিয়ে চলে। এইরূপ পরিবেশনার দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়; ক) কখনো কখনো দুইজন গায়েন পালা করে নৃত্যসহ এই গীত পরিবেশন করে থাকে। আবার খ) সহযোগীদের একজন গানের চরণ ধরিয়ে দিলে গায়েন প্রথমচরণ শেষ করার পর সম্মিলিত বা কোরাস কণ্ঠে পরবর্তী চরণ গাওয়া হয়। এসময়েও পরিবেশনাটি দ্রুততালে নৃত্যসহ পরিবেশিত হয়। সবশেষে সম্মিলিত ভাবে শুরুতে গাওয়া ধুয়াটি পরিবেশন করে এই রীতির বর্ণনাত্মকগীত শেষ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ 'সোনারানীর রন্ধন' ও 'লখিন্দরের জন্ম' আখ্যানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল-

Dhaka University Institutional Repository

ধুয়া : ও সোনা মনের আনন্দে চড়াইল রন্ধন।
গায়েন (১) : স্নান করিয়া সোনারানী চড়াইল রন্ধন।
কোরাস (২): ডাইল রান্ধিতে সোনারানী তুলে নিল হাড়ি॥
১ : তেতুলের কাষ্ঠ লইল নারকেলের বাগ।
২ : প্রথমে পাক করিল সোনা ছুলা খেসারির ডাল॥
১ : একেতো খেসারির ডাল জলে দিল আঠি।
২ : তাহার মধ্যে দিল সোনারানী কাঠালের আঠি॥
১ : একেতো মটরের ডাল জলে দিল আঠি।
২ : তাহার মধ্যে দিল সোনারানী পাকা গাবের আঠি॥
১ : একতো সওল মৎস্য তাহার ভিতর ঝোল।
: তাহা দিয়া কসাই সোনা গোল মরিচের ঝোল॥
: একতো কাতল মাছের কসাইয়া লইল কোল।
: অর্ধেক করে ভাজা সোনারানী অর্ধেক করে ঝোল॥
: একেতো জিওল মাছের সর্ব অঙ্গ ধলা।
: তাহা দিয়ে কসাই করে সোনা দক্ষিণ ঝাড়ের কলা॥
: একতো বাগ্‌দা চিঙড়া করে আদা চেচা।
: তাহা দিয়ে কসাই করে সোনা দয়া কলার মুচা॥
... ...
: মুখেতে চালতা দিয়া মুখে সুদ্ধি করে।
: শয়ন করিল গিয়া সোনা পালঙ্কের ওপরে॥
: সপ্ত মাসও যায় সনেকার অষ্টমাসও হয়।
: অষ্ট মাসেও যায় সনেকার নব মাসও হয়।
: নব মাসও যায় সনেকার দশ মাসও হয়॥
: দশ মাসও দশ দিনও পূর্ণত হইল।
: সনেকারও পুত্র তখন নাড়ি যে ছিড়িল॥
: ব্যতারও জ্বালায় সোনা যায় গড়াগড়ি।
: লখিন্দরের জন্ম হইবে জয় বিষহরি॥
: ব্যতার জ্বালায় সোনার মুখে নাহি কথা।
: একবার উঠে একবার বসে চাঁদের মাথা ব্যথা॥
: ব্যথার জ্বালায় সোনা হইল অচেতন।
: ভূমিতে পড়িল সোনার প্রাণেরও ধন॥

৪) কোরাস বা সম্মিলিত বর্ণনাত্মক গীত : এটি একটি সমন্বিত পরিবেশনা। এখানে কাহিনীটি সম্মিলিতভাবে কোরাস কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। এই রীতির বর্ণনাত্মক গীতেও দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ক) দুইজন গায়েন কর্তৃক দ্বৈতকণ্ঠের পরিবেশনা এবং খ) সকল কুশীলবের সম্মিলিত কোরাস কণ্ঠের পরিবেশনা। প্রথম পর্যায়ের পরিবেশনায় দুইজন গায়েন একই সাথে দ্বৈতকণ্ঠে পদের চরণ গেয়ে চলেন। এবং অন্যান্য কুশীলব তাঁদের বসা অবস্থানে থেকেই চরণ শেষে ধুয়া ধরেন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে সকল কুশীলব সম্মিলিত কণ্ঠে গীত পরিবেশন করেন। এসময়ে ধুয়া পরিবেশিত হয় না। দুইজন গায়েন দাঁড়িয়ে এবং অন্য সকলে বসা অবস্থায় থেকেই এই গীত পরিবেশন করে থাকেন।

কাহিনীর যে সকল অংশ করুণ রসাত্মক, সে সকল অংশে প্রথম পর্যায়ের কোরাস পরিবেশনা পরিলক্ষিত হয়। এসময়ে কুশীলবদের অবস্থান দুজন গায়েন ব্যতীত অন্য সকলে বসা অবস্থানে থাকেন। এ সময়ে গায়েনদ্বয় পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানে থেকে কিছু কিছু সময়ে নৃত্যযোগে এই গীত পরিবেশন করেন। উদাহরণ হিসেবে দংশন আখ্যানের পরিবেশনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসময়ে সমস্ত গীতটি টানা সুরে ধীর লয়ে পরিবেশিত হয়। এবং গানের কথার বারবার পুনরুক্তি ঘটে থাকে। ধীর লয়ে টানা সুরে পুনরুক্তিমূলক করুণ রসাত্মক এই কোরাস গীত সমস্ত দর্শককে আবেগ তাড়িত করে। কারণ গায়েনদ্বয় করুণ রসাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে সমগ্র পরিবেশনাকে একটি তীব্র উত্তেজনাকর অবস্থায় নিয়ে যান। ফলে দর্শক এবং কেউ একজন ছুটে গিয়ে ক্রন্দনরত কোন দর্শককে জড়িয়ে ধরে উভয়ের আবেগকে আরও তীব্র করে তোলেন। আবার কখনো কোন দর্শক গায়েনকে জড়িয়ে ধরে তাঁর আবেগ প্রকাশ করেন। এভাবে দর্শক এবং অভিনেতার মাঝে বিদ্যমান দূরত্ব ঘুঁচে গিয়ে সমস্ত আসরটি উভয়ের মধ্যে একটি সক্রিয় সম্পর্ক স্থাপনার নিঃশঙ্ক ক্ষেত্রে পরিণত হয়। (উল্লেখ্য যে, হাস্যরসযুক্ত সংলাপাত্মক অভিনয়ের সময়েও দর্শক

Dhaka University Institutional Repository

ও অভিনেতার মধ্যে সক্রিয় সম্পর্ক সৃষ্টি হতে দেখা যায়)। নীচে দ্বৈতকণ্ঠের কোরাস গীতের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

ধুয়া : কালি লখাইরে দংশিতে যায়,
ওগো লখাই-বেউলা শুয়ে আছে সুবর্ণের খাটে
লখাইরে দংশিতে চায়।

গান :
ওগো লখাই বেউলার রূপ দেখে করে হায় হায়।
লখাইরে...
ওগো কালি বলে মাসী তোমার দয়া মায়া নাই।
লখাইরে...
ওগো কোন অপরাধে দংশিয়া যাবো কারণ নাহি পায়।
লখাইরে...
ওগো লখাইরে দংশিব কেমনে পড়েছি মায়ায়।
লখাইরে...
কারি বলে দেব ধর্ম তোমরা থেকো সাক্ষী।
লখাইরে...
ওগো বিনা দোষে চান্দের পুত্র আমায় মারে লাথি।
লখাইরে...
ওগো এবার সহিলাম আমি ধর্মের দিকে চাইয়া।
লখাইরে...
ওগো আর বার পড়িলে লাথি যাইব দংশিয়া।
লখাইরে...।
ওগো আর বার কাল নাগিনী ফেরে ডানে বায়ে।
লখাইরে...।
ওগো আর বার চরণ পড়ে কাল নাগিনীর গায়ে।
লখাইরে...।
ওগো কালি বলে ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমরা থেকো সাক্ষী।
লখাইরে...।
ওগো বিনা দোষে চান্দের পুত্র আমায় মারে লাথি।
লখাইরে...।
ওগো আর বার কাল নাগিনী ফেরে ডানে বায়।
লখাইরে...।
ওগো আর বার চরণ পড়ে ওই কাল নাগিনীর গায়।
লখাইরে...।
ওগো ... একবার দুইবার তিনবার আমি ধর্ম করে সাক্ষী।
লখাইরে...।
ওগো বিষের কামড় মারে কালি লখাই উঠে জাগি।

বর্ণনাত্মক গীতের উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিবেশনারীতির প্রয়োগে সমস্ত আখ্যান পরিবেশিত হয়। এই গান পরিবেশনায় রাগিণীর সুর অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশ, মিশ্র এবং মনোহরসই এই তিনটি রাগিণীর ব্যবহার করেন এবং সমস্ত আখ্যানের সুর নির্মাণে এই তিনটি রাগিণীর প্রভাব বেশি বলে জানা যায়। খোল বাদক গানের সাথে তালের ব্যবহার সম্পর্কে জানান যে, চৌতাল, কাহারবা, দাদরা, ত্রিতাল, ঝাপতাল, একতাল এবং ঝুমুর ইত্যাদির মধ্যে একতাল, ঝাপতাল ও ঝুমুরের প্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঝুমুর তাল দিয়ে গান ধরা হয় এবং ঝুমুর তাল দিয়েই তালের সমাপ্তি করা হয়ে থাকে। তবে গানের মধ্যে গায়েনের সাথে সমন্বয় বজায় রেখেই ঢোলে তেহাই এর মাধ্যমে তাল পরিবর্তন করে একাধিক তাল ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। তবে যে একটি সাধারণ নিয়মের কথা জানা যায় তাহল, গানের পরিবেশনায় প্রতিটি স্বতন্ত্র ঘটনাংশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (খোলের তাল) ধীর লয়ে থেকে ক্রমান্বয়ে তেহাই এর মাধ্যমে দ্রুত লয়ে এগিয়ে যায়। এ সময়ে নৃত্যের মাত্রাও বেড়ে যায়। এর মধ্যে 'লাচাড়ি'র ব্যবহারও দেখা যায়। 'লাচাড়ি' বলতে কেউ কেউ দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দকে

Dhaka University Institutional Repository

বুঝে থাকেন। আবার কেউ নৃত্যযুক্ত পদকে বলেছেন 'লাচাড়ি'। তবে রয়ানী গানের রাধালক্ষ্মী লাচাড়ি বলতে নৃত্যযুক্ত পৃথক কোন পদ বলে মনে করেন না। 'লাচাড়ি' হিসেবে তিনি দীর্ঘ ও লম্বা পদকে বুঝে থাকেন।

এই দলের পরিবেশনায় আরেকটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রক্ষিপ্ত সঙ্গীত পরিবেশনা লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশন রীতি অনুযায়ী প্রতিটি স্বতন্ত্র ঘটনাংশ পরিবেশনের পর দল কিছু সময় করে বিশ্রাম নিয়ে থাকে। এরূপ কয়েকটি অল্প বিশ্রামযুক্ত ঘটনাংশ পরিবেশনের পর একটি দীর্ঘ বিশ্রামের মাঝে কাহিনী বহির্ভূত সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এক্ষেত্রে কখনো কখনো দেহতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বলিত গীত, লোকজ আদি-রসাত্মক গীতসহ নৃত্য পরিবেশিত হতে দেখা যায়। রয়ানী গানের পরিবেশনার সাথে ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে শেষ দৃশ্যে চাঁদ সওদাগরের ঘট পূজা করা হলে সেই ঘট মানতকারীর গৃহে তোলা হয়। এই পরিবেশনার সাথে মানতকারী এবং ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান সম্পর্কে আরেকটি যে বিষয় উল্লেখযোগ্য তাহল, গান পরিবেশনকালীন সময়ে চাঁদের পূজাদান অংশে মানতকারী নিজে পুরোহিতের পাশে থেকে দেবীর ঘট পূজা করে থাকেন। শাস্ত্রীয় বিধান মতে পুরোহিত মনসা দেবীর প্রেরিত ঘট -এ পূজাদান শেষ করলে মানতকারী শ্রদ্ধানতমস্তকে সে ঘট গ্রহণ করে তাঁর ঘরে তোলেন। ঝালু-মালু আর গোয়ালবাড়ির মতো যেন তাঁর গৃহেও দেবী মনসার বরে সুখ সমৃদ্ধি আর স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে-এটাই তাঁদের বিশ্বাস। এখানেই লুকিয়ে রয়েছে দীর্ঘ প্রস্তুতিময় কিছু মানুষের অর্থ ও শ্রম ঝরা এই রয়ানী গান পরিবেশনার মাহাত্ম্য।

৩.২.৬. 'পাঙ্খু' ও 'জ্যা' (মারমা সম্প্রদায়)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় 'মারমা' নামে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এদের মধ্যে 'পাঙ্খু' ও 'জ্যা' নামে দুই ধরনের জনপ্রিয় নাট্যরীতি প্রচলিত রয়েছে। পাঙ্খু নাট্যরীতিতে সাধারণত সন্ন্যাস গ্রহণ, বিয়ে প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 'মনরিমাংৎসুমুই' পালা গীত হয়। প্রায় ২৫জন নর-নারী পরপর দুই রাত ধরে গীত-নৃত্য-সংলাপও শারীরিক কসরত এর মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকে। পাঙ্খু শব্দের অর্থ 'কীট', 'পিঁপড়া' বা 'মাকড়শা'। পিঁপড়ার সারিবদ্ধতা এবং মাকড়শার জাল বুননের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় পাঙ্খু নৃত্যে। আর 'মনরিমাংৎসুমুই' এর অর্থ হল 'রাজকন্যা মনরি'। 'রাজকন্যা মনরি'র কাহিনী সংক্ষেপ নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

> স্বর্গরাজা দোমরায়ের সাতটি কন্যা। সাতটি কন্যা দেখতে একই রকম। তারা একদিন মর্তলোকের সংবাদ পেয়ে সেখানকার হ্রদে অবগাহনের আগ্রহ প্রকাশ করে। সপ্তকন্যা একত্রে মর্তে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে পিতার কাছে। পিতা স্বপ্নে দেখেন কনিষ্ঠা কন্যার দুঃখজনক পরিণাম। তিনি এজন্য সবাইকে বারণ করেন কিন্তু কন্যাদের অধীর আগ্রহে আবেদন প্রত্যাখান করতে পারেননি। তাই শেষে কন্যাদেরকে মর্তলোকে যাবার অনুমতি দেন। সপ্তকন্যা পৃথিবীর হ্রদে ডুবসাঁতারের আনন্দে প্রতি সন্ধ্যায় উড়ে আসে। কিন্তু একদিন এক শিকারী, নাগরাজ থেকে পাওয়া বিষের জালে আটকে ফেলে এক পরী কন্যাকে। সে কনিষ্ঠা বোন, নাম রাজকুমারী মনরি। শিকারী ধৃত মনরির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় সে দেশের রাজপুত্র 'রাজকুমার সাথানুর'। সাথানুর সঙ্গে প্রথমবারের মতো বিবাহ হয় মনরির।
>
> এরইমধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে যুদ্ধ লাগে মারমা রাজ্যের। সাথানু চলে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। এদিকে ব্রাহ্মণরা রাজপুরীতে মনরির আগমনে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য দেখে গভীর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাজা একদিন এক স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণরা সে স্বপ্ন খণ্ডনের বিধান দেয় এমত-'সাথানুর কল্যাণের জন্য মনরিকে মন্দিরে বলি দিতে হবে। মনরি এক শিশুপুত্রের জন্ম দেয়। প্রাণ রক্ষার্থে পুত্রকে ফেলে মনরি পুনরায় স্বর্গলোকে উড়ে চলে যায়। যাবার সময় শুধু রেখে যায় গহীন অরণ্যে এক সন্ন্যাসীর কাছে একটি অঙ্গুরী।
>
> সাথানু যুদ্ধজয় শেষে ফিরে এসে মনরিকে না পেয়ে উন্মত্ত বেদনায় গৃহত্যাগী হয়। নানারাজ্য ঘুরে দেখা পায় সেই সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী স্বর্গে যাবার উপায়সহ মনরির রেখে যাওয়া অঙ্গুরী দিয়ে দেয় সাথানুকে।
>
> বহু কষ্টে স্বর্গে যায় সাথানু। শক্তি ও বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে সে জিতে নেয় মনরিকে। স্বর্গলোকে পুনরায় বিয়ে হয় তাদের। বিয়ে শেষে ডোমরায়, বাকি ছয় কন্যা মিলে প্রাসাদসহ জামাতা ও মনরিকে রেখে আসে মর্তলোকে।
>
> পৃথিবীতে তখন একশ বছর পরে; মনরির রেখে যাওয়া সেই শিশুপুত্র এখন বৃদ্ধ। বৃদ্ধের কৃপায় তার লুপ্ত পূর্বকাল ফিরে আসে। শিকারী টের পায় পূর্বজন্মে সে ছিল সাথানু-মনরির দাস। এবং সাথানু-মনরি পালার শুরুতেই বলা হয়

Dhaka University Institutional Repository

যে তারা ছিল প্রথম জন্মে একজোড়া কপোত-কপোতী। গহীন অরণ্যে দাবানলে তাদের সন্তান পুড়ে গেলে শোকে দুইজনে আত্মাহুতি দেয়।[৬১]

সাধারণত বাড়ির আঙ্গিনায়, উৎসব কেন্দ্রে বা আমবাগানের সমতল ভূমিতে এই আখ্যান পরিবেশনার আয়োজন করা হয়। মঞ্চের একদিকে দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীদল অন্যদিকে কাপড় দিয়ে ঘেরা স্থানে কলাকুশলীরা অবস্থান করে। প্রবেশ প্রস্থান মেনে চলা হয়। কলাকুশলীদের মধ্যে পুরষেরা পাৎলুন বা গাঢ়নীল রঙের জামা এবং মেয়েদের থাকে ঐতিহ্যবাহী 'থাবি-আঙ্গি' (চিত্র নং ১৭)। তাঁদের হাতে একটি করে লাল রুমাল থাকে যা, নৃত্যমধ্যে সঞ্চালনের মাধ্যমে কখনও অবগাহন, কখনও বা আকাশে ওড়া দেখানো হয়। ওড়নার মধ্যে রুমালটি ফেলে দিলে তা হয়ে ওঠে মনরির শিশুপুত্র। সাথানুর সঙ্গে যুদ্ধে 'বোলু' বা 'বুলু' জীবজন্তুর মুখোশ ব্যবহার করে থাকে।

'পাজু'-'রাজকন্যা মনরী', চিত্র নং ১৭

বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কালে এ কাহিনীর উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন। ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্র, মনরির স্বর্গে পলায়ন প্রভৃতি ঘটনা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘর্ষের সময়কে সূচিত করে।

অপরদিকে, কোন ধর্মোৎসবে অথবা মৌসুমী ফসল ঘরে তোলার সময় 'জ্যা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাধারণত বুদ্ধ মন্দিরের সামনের উঠানে এবং যে কোন খোলা জায়গাতে এ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়ে থাকে। আলোর উৎস হিসেবে হ্যাজাক বা হারিকেনই বেশি ব্যবহৃত হয়। এই পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সাধারণত মন্দিরের সন্নিকটস্থ কোন ঘর বা তদুপযোগী কোন ঘর ব্যবহার করে থাকে। এর দর্শক চতুর্দিক থেকে আসরকে ঘিরে বসে থাকে এবং যন্ত্রীদল আসরের যে কোন দুই পার্শ্বে মুখোমুখি হয়ে আসন গ্রহণ করে। এদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে ঢোল 'পাই-পে' (একপার্শ্বে হরিনের চামড়া এবং অন্যপাশে বাঘের চামড়া যুক্ত) ব্যবহার করে থাকে। দুই পার্শ্বেই বাজানো যায় এমন একটি ছোট ঢোল 'বোম', 'চেগরী' (পিতলের তৈরী বড় প্লেট), 'নে' অর্থাৎ কাঠের তৈরী প্রায় দুই ফুট লম্বা বাঁশী, 'লাখু'-প্রায় এক হাত লম্বা, কাঠ দিয়ে বাজানো যায় এরূপ বাঁশের বাঁশীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

মারমা জাতির সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে এরূপ একটি জনপ্রিয় লোকগাথা হল 'আলংনাবাহ'। এই লোকগাথাটির কোন লিখিত রূপ নেই এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখে মুখেই প্রচলিত এর কাহিনী। এই 'লোকগাথা' বা 'পালা'কে, কখন রচনা করেছেন তা সবার কাছে অজানা থাকলেও এটা সবাই বিশ্বাস করেন যে, এটি মারমাদেরই সুষ্টি বা মারমা-ই এর উৎস বা উৎপত্তিস্থল। লোকগাথাটি গদ্য এবং পদ্য সংলাপে লিখিত। নীচে এর কাহিনী সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হল :

আনসাজটেম্পার যুবরাজ মংসাংখা নামে একজন নামকরা সদাগর ছিলেন, পাশাপাশি একজন দানবীর হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। একদিন তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু উইরিয়াকে নিয়ে একটি গ্রামের আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ত্রান ও খাদ্য-দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করছিলেন। ঠিক এমন সময় তাঁর ভাগ্যের চাকা পাল্টে যায়; বন্যায় তাঁর সদাগরী নৌকা ডুবে যায় এবং তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। যার ফলে তিনি উইরিয়ার দাসত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ঝড়ে আক্রান্ত হওয়ার খবর তাঁর স্ত্রী রানী ম্যাসাংখার কাছেও পৌঁছে যায়। স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লে তিনিও উইরিয়ার চক্রান্তের শিকারে পরিণত হন। উইরিয়া তার শিশু সন্তানটিকে খুন করার জন্য নদীতে নিক্ষেপ করলে দেবতা 'প্রজনাপরমিতা'র আশীর্বাদে শিশুসন্তানটি রক্ষা পায়। পরবর্তীতে সে সিংহাসনে আরোহন করে। এর মধ্যে উইরিয়া ম্যাসাংখাকে তার সঙ্গে ঘর করতে বাধ্য করে। একদিন সুযোগ বুঝে ম্যাসাংখা উইরিয়ার থাবা থেকে পালিয়ে যায়। নিজের রাজ্যে সন্তানের কাছে ফিরে আসে এবং মারা যায়। ম্যাসাংখা শুধু মাত্র তাঁর স্বামীর মৃত দেহ খুঁজে বের করতে পালিয়ে আসে। সে তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে, যদি সে একটি মন্দির নির্মাণ করে পূজা দেয় এবং একটি কূপ খনন করে তাহলে তাঁর স্বামী পুনরায় জীবীত হয়ে ফিরে আসবে। রানী ম্যাসাংখা সে অনুযায়ী কাজ করে। শেষে ম্যাসাংখা তার পুত্র সহকারে রাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয় এবং উইরিয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আর মংসাংখা বুদ্ধদেবের আশীর্বাদে পুনরায় জীবন ফিরে পায়।[৬২]

---

[৬১] ড. সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪০৬-৭

[৬২] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity : Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka, 2000, Pg. 173-4

Dhaka University Institutional Repository

'জ্যা' পালাটির অভিনয়ের শুরু হয় অর্কেস্ট্রার বাঁশীর সুরের মাধ্যমে, যা দেবতাকে উৎসর্গ করে পরিবেশিত নৃত্য 'পুউ-ই-উ' অনুযায়ী হয়ে থাকে। বুকের সামনে একটি ধাতব গামলা ধরে রেখে নৃত্য পরিবেশিত হয়; যার মধ্যে ৫টি সুপারি, নারকেল, সোয়াসের চাল, একছড়া কলা, দুটি মোমবাতি ও পাঁচ টাকা থাকে। জঙ্গলে নিরাপদে চলাচল ও আপদ-বিপদ থেকে রেহাই পাবার জন্য বুদ্ধদেব ও অধিজাগতিক শক্তিকে উৎসর্গ করে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। এর পরে ৬ থেকে ১২ জন মেয়েদের (অনুর্ধ্ব বিশ বছর বয়সী) দিয়ে ভালোবাসা ও শান্তি বিষয়ক দলীয় নৃত্য 'টুইচা-দুংগা' করে থাকে (স্থিরচিত্র নং ১৭)। মেয়েদের ৪ জনের একটি দল 'লিছামাইয়্যং' নামে আরোও একটি দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে থাকে, যার মধ্যে চাষাবাদের চিত্র-পদ্ধতি তুলে ধরা হয়। কিন্তু 'জ্যা' নাট্যরীতির মূল অভিনয় কাঠামোর উপাদানগুলি নিম্নরূপ-

১. সংলাপাত্মক অভিনয় কাব্য : এখানে চরিত্রগুলির বেশিরভাগ সংলাপ অর্কেস্ট্রার সুরের তালে তালে কাব্যে বর্ণনা করে থাকে।
২. সংলাপাত্মক অভিনয় গদ্য : এখানে চরিত্রগুলি সরাসরি গদ্য সংলাপে অভিনয় করে থাকে।

সবশেষে সমস্ত কলাকুশলী ও সহযোগীদের সমন্বয়ে 'বুদ্ধের আশীর্বাদ সবার উপরে বর্ষিত হোক' এরূপ একটি সম্মিলিত গান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তাদের অভিনয় শেষ করে থাকে।

ড. সেলিম আলদীন মনে করেন, বাংলার যাত্রা এই 'জ্যা' দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত। কেননা ধর্মমঙ্গলের রচনার (text) সাথে সামাঞ্জস্যতাপূর্ণ হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের পরিবর্তিত রূপ হল 'আলংনাবাহ'। আফছার আহমেদের মতে, 'আলংনাবাহ' পালাটির মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম/দর্শন প্রচারের একটি চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধিজমের অভীষ্ট ইচ্ছা পুরণের মাধ্যমে তা এই প্রক্রিয়ান্তরে বর্ণনা করা হয়। এক্ষেত্রে ড. সৈয়দ জামিল আহমেদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। তিনি মনে করেন, যতদুর জানা যায় মারমাবাসী মূলত আরাকান অঞ্চলের অধিবাসী। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে মারমাদের 'জ্যা' হল মায়ানমার এর জ্যাট গোত্র থেকে উৎপত্তি হয়ে বর্তমানে 'জ্যা'। এখানে 'জ্যা' শব্দের উচ্চারণগত উৎপত্তি 'জ্যাট' অর্থাৎ মারমা থেকে, যার অর্থ হল মায়ানমার থেকে জন্মলব্ধ।[৬৩]

এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অভিনয়ের পূর্বে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গের জন্য যে সব আয়োজন করা হয় তা একেবারে হুবহু হিন্দু ধর্মের রয়ানীগান অভিনয়ের পূর্বে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত প্রস্তুতিরই অনুরূপ। যেমন- উভয় গানের মধ্যেই ৫টি সুপারী, একটি নারকেল, পাঁচ টাকা, সোয়াসের চাল, ইত্যাদি লক্ষণীয়। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম আচারণের মধ্যে একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে এটাও বলা যেতে পারে যে, দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে বাংলার প্রাচীন রীতির এটিও একটি রীতি, যা বাংলার সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৩.২.৭. কেচ্ছাকাহিনী

পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোনা অঞ্চলে 'কেচ্ছাকাহিনী' নামে একটি নাট্যরীতির অভিনয় লক্ষ্য করা যায়। এ রীতিতে অভিনীত আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে 'বেতুল সিপাই', 'তেয়ান ও পর ধনাইয়ের কিচ্ছা', 'মতিলাল বাদশা' এবং 'অকুল-বকুল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব আখ্যায়িকার মধ্যে 'তেয়ান ও পর ধনাইয়ের কিচ্ছা' আখ্যায়িকাটি হল একজন চালাক-চতুর ব্যক্তির গল্প। এছাড়া বাকী সবগুলিই পরীদের ভালোবাসা ও দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

অভিনয়ের আসর : এই নাট্য গ্রামাঞ্চলের বাড়ীর উঠানে অথবা উঠানের বাইরেও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এর অভিনয় স্থানগুলি সাময়িকভাবে তৈরী করা হয়ে থাকে। আয়তনের দিক থেকে অভিনয় স্থানগুলি (৭′ × ৬′) এবং প্রায় ১ হাত উচুঁ আয়তাকৃতির হয়ে থাকে। অভিনয় স্থান তৈরীর জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘুমাবার চৌকী (কাঠের তৈরী) ব্যবহার করা হয়। অভিনয় স্থানের উপরে চার কোণে চারটি খুঁটির সাহায্যে চাঁদোয়া টানানো থাকে। অভিনয় স্থান বা আসরে দোহারেরা গোল হয়ে উপবেশন করে। আর মূল গায়েন একাই বর্ণনা করে অভিনয় করেন। গীত বর্ণনের সময় তাঁর সহযোগী দোহারেরা গানের ধুয়া ধরে তাঁকে সাহায্য করে থাকে।

---

[৬৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

নীচে 'তুলাল বাদশা' আখ্যায়িকার কাহিনী সংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো :

জাহাঙ্গীর নগরের রাজা জাহাঙ্গীর বাদশার ছিল সাত পুত্র। তাঁদের মধ্যে সবার ছোট তুলাল বাদশা ছাড়া সবাই ছিল বিবাহিত। তুলাল বাদশা রাগ করে তাঁর ছয় ভাবীর অমতে তুলাপজান নামের এক রাজ কন্যাকে বিয়ে করে। ফলশ্রুতিতে তারা তুলাল বাদশা ও তুলাপজানকে শাস্তি দিতে কুমতলব আঁটে। এর কিছু পরেই তাঁর অন্য ছয় ভাই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ডিঙ্গা সাজিয়ে যাত্রা করে। বাণিজ্য থেকে তারা ফিরে আসলে ছয় ভাবী মিলে ছয় ভাইয়ের কাছে ছোট ভাই তুলাল তাদের শুচিতা নষ্ট করার চেষ্টা করেছে বলে তুলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। তাঁরা এমন ছলনা করে যে ছয়ভাই ক্রুদ্ধ হয়ে যথা দ্রুত তুলাল ও তার স্ত্রী তুলাপজানকে বনবাসে পাঠিয়ে দেয়। এর কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীর বাদশা তাদেরকে খুঁজে বের করে। জঙ্গলে তাদেরকে একটি দুর্গরূপ বাড়ী করে দেয়। চলে যাবার সময় তোলাপজান তাঁকে বিরামকল পাখী আনতে অনুরোধ করে। অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে জাহাঙ্গীর বাদশা অবশেষে বিরামকল পাখীর সন্ধান পায় এবং তোলাপজানের জন্য পাখিটি কিনে রাখে। এই পাখিটি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে দেখে জাহাঙ্গীর বাদশা অবাক হয়ে যায়। খুশী মনে জাহাঙ্গীর বাদশা তোলাপজানের জন্য পাখিটি নিয়ে আসে। এদিকে তোলাপজানের একপুত্র সন্তান হয়েছে, নাম রাখা হয়েছে মিরাজ বাদশা। জাহাঙ্গীর বাদশা এ খবর বাড়ীতে এসে জানতে পেরে আরোও খুশী হয়। এরপর কিছুকাল সে তাঁদের সাথে অতিবাহিত করে। এরপর সেখান থেকে বাড়ীতে যাবার সময় তার ছেলেকে একটি অনুরোধ করে যায়, "তাঁর নামে যেন একটি দীঘি খনন করা হয়"। বাড়ীতে ফিরে যাবার কিছু দিন পরেই জাহাঙ্গীর বাদশা মৃত্যু হয়।

এদিকে দিনের দিন ছয় ভাই তাঁদের সহায়-সম্পত্তি সব হারিয়ে গরীব হয়ে পড়ে। এসময় তুলাল তাঁর বাবার শেষ ইচ্ছাপূরণের জন্য দীঘি খননের সিদ্ধান্ত নেয়। শত শত লোক জড় হয় দীঘি খননের জন্য। এই খবর শুনে তাঁর ছয় ভাইয়েরাও সেখানে শ্রমিকের কাজের জন্য উপস্থিত হয়। তুলাল তাঁর ভাইদেরকে চিনতে পারলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁর ছয় ভাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রাতে তুলালের বাড়ী আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। বিরামকল পাখি তুলালকে তার ভাইদের আক্রমণের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সতর্ক করে দেয়। তুলাল, তোলাপজান আর মিরাজকে নিয়ে নিরাপদে চলে যায়। অপরদিকে ছয় ভাই তুলালের রাজ্য দখল করে নতুন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করে। বিরামকল পাখী তুলালের পরিবারকে পিঠে করে অনেক দূরবর্তী এলাকায় একটি মরুময় দ্বীপে নিয়ে যায়। সেখানে তোলাপজান দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেয়। তখন খাবার তৈরীর জন্য কাছে কোন আগুন না থাকায় তুলাল আগুনের খোঁজে বিরামকল পাখির পিঠে চড়ে বসে। উড়তে উড়তে পাখি একটি জঙ্গলে এসে পৌঁছে। সেখান থেকে তুলাল হাটতে হাটতে চলে যায় এক বনমালীর বাসায়। বনমালীর ছিল এক অপরূপা সুন্দরী কন্যা। নাম তাঁর সুরতী। তুলালকে দেখে সে তাঁর প্রেমে পড়ে যায়। যখনই তুলাল তাঁর সাথে কথা বলতে যাবে তখন সুরতী তাঁর দাদার যাদু মন্ত্রের সাহায্যে তাঁকে মোহিত করে বন্দী করে ফেলে। জঙ্গলের পেছনে বিরামকল পাখী তুলালের ফিরে আসার কোন লক্ষণ না দেখে সে নিজেই আগুনের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। খুঁজতে খুঁজতে সে চলে যায় কামারের কাছে। কামার কৌশলে তাঁর সাথে প্রতারণা করে তাঁকে খাঁচায় বন্দী করে ফেলে।

এদিকে নির্জন দ্বীপে তোলাপজান তাঁর স্বামীর ফিরে আসার পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। নিজেকে ক্লান্ত মনে করে চোখে মুখে পানি দেবার জন্য চলে যায় সমুদ্র উপকূলে। ঠিক সেই সময়ে রুপতান শহরের বিশিষ্ট সদাগর রুপতান সদাগর যাচ্ছিল সেই উপকূল দিয়ে। তোলাপজানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে তোলাপজানকে সেখান থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। রুপতান তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিলে তোলাপ তাঁকে অনুনয় বিনয় করে ১২ বছরের জন্য অপেক্ষা করার সময় চায়। রুপতান তোলাপজানের অনুনয়ে সম্মত হয় এবং তাঁর জাহাজের উপরের একটি কক্ষে তাকে তালাবদ্ধ করে রাখে। এরই মধ্যে তোলাপজানের ছোট বাচ্চা দুধের জন্য প্রচণ্ডরকম চীৎকার শুরু করে। বাচ্চা শিশুর কান্না শুনে আল্লাহ জীবরাঈলকে ডেকে বলে, "যাও এই মুহূর্তে তাড়াতাড়ি দেরী না করে ঐ বাচচা শিশুর কাছে একটি দুধের গরু দিয়ে আস।" সেই মত একজন দুধওয়ালা সমুদ্র পার হয়ে উঠে আসে ঐ বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য। সকালে দুধওয়ালা এবং তাঁর স্ত্রী লক্ষ্য করে যে গরুর দুধের বানে কোন দুধ নেই। এটা নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোকের কাজ, এই সন্দেহে সে রাতে গরুর দুধ চুরি যাতে না হয় তাঁর জন্য পাহাড়া বসায়। রাতে সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করে যে সমুদ্র থেকে তাঁর দিকেই একটি দুধেল গাভী উঠে আসছে। সে গাভীটিকে অনুকরণ করে। গরুর লেজ ধরে ঝুলে সে সাগরের ওপারে চলে যায় এবং লক্ষ্য করে সে দু'টি শিশু রয়েছে। সে শিশু দুটিকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসে। সেখানে শিশু দুটি সুশিক্ষায় লালিত-পালিত হয়ে বড় হতে থাকে।

বারো বছর পরে এই দুই ভাইকে নদীর উপরে সাঁকো থেকে নদীর মধ্যে জাহাজের কর আদায়ের জন্য সেই দেশের রাজা নিয়োগ দেন। একদিন রুপতানের জাহাজ সেই টোল আদায়ের সাঁকোর কাছে নোঙর করলে মিরাজ তাঁর ছোট ভাইকে তাঁদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করছিলো। তোলাপজান জাহাজের ভেতরে থেকেই তাদের ঘটনা শুনছিলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তারা দু'জনেই তোলাপজানের অনেক আগে হারিয়ে যাওয়া সন্তান। যখন রুপতান জাহাজের কাছে ফিরে আসল তখন তোলাপজান ঐ দুইভাই তাকে অপমান করেছে বলে রুপতানের কাছে নালিস করে এবং ১২জন রাজার উপস্থিতিতে ন্যায় বিচার পাবার প্রার্থনা করল। এই খবর দ্রুত এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে ১২ রাজার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বহুল আলোচিত ন্যায় বিচার দেখার আশায় সুরতী তুলাল'কে নিয়ে ঐ বিচারালয়ে উপস্থিত হল। আর কর্মকার পাখিটি কোন রাজার কাছে বিক্রি করে বেশী দাম পাবার আশায় সেও পাখিসহ সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত হল। যখন ঐ বারোজন রাজা তাঁদের বিচারকের আসনে গিয়ে বসলেন তখন মিরাজ জাহাজের কাছে যা ঘটেছিলো সে ঘটনা এবং তাঁর জীবনের দুঃখের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। বিরামকল পাখিটি মিরাজের বিস্তারিত ঘটনা শুনে তোলাপজানের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে কথা বলতে শুরু করল। এর পরে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির কথাও বর্ণনা করল। ১২জন রাজা তাদের সমস্ত ঘটনা শুনে রুপতান সদাগর, সুরতী ও কর্মকারকে জীবন্ত কবর দেয়ার নির্দেশ দিলেন। দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার পরে পুনরায় তুলাল বাদশা, তোলাপজান এবং তাঁদের দুই ছেলে একত্রিত হল।[৬৪]

৩.২.৮. কেচ্ছাগান

পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের ধর্মনিরপেক্ষ লোকনাট্য অভিনয়ের মধ্যে 'কেচ্ছাগান' নামে একটি নাট্যরীতি লক্ষ্য করা যায়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে কেচ্ছাগান ও কেচ্ছাকাহিনী একই রকম হলেও অভিনয়ের দিক থেকে এদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এর মূল গায়েন বা প্রধান বর্ণনাকারী বা দেওয়ানজী একটি অনুচ্চ গোলাকার আসরে (৬-৮ফুট ব্যাস) ৬ থেকে ৮ জন দোহার সহযোগে বৃত্তাকারে বসে এই গান পরিবেশন করে থাকেন। দর্শকেরাও এদের চতুর্দিকে ঘিরে বসে থাকে। পালা পরিবেশনের সময় দেওয়ানজী সার্বক্ষণিকভাবে একটি কোলবালিশ কোলের উপর রাখেন এবং এই কোল বালিশটিকে তিনি বিভিন্নরূপে ব্যবহার করে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কোলবালিশ ছাড়া তিনি অন্য কোন প্রপস্ বা বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করেন না। কখনও গদ্যে আবার কখনও গানের দ্বারা বর্ণনার মাধ্যমে 'কেচ্ছাগানে'র সমস্ত পালাটি বসে বসেই পরিবেশন করে থাকেন। এই গান সাধারণত গ্রামের পূর্ণিমার রাতে বাড়ির উঠানে বা বাড়ীর বৈঠকখানার মধ্যেও পরিবেশিত হয়ে থাকে। 'কেচ্ছাগান'-এ অভিনীত আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে 'মোহিদার বাদশা', 'গোহুর বাদশা বনেছা পরী', 'কাঞ্চন মালা', 'আয়না বিবি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কেচ্ছাকাহিনী রীতির উপরিউক্ত কাহিনীটির সাথে 'চড়ুই আর কাকের কথা' শিরোনামে বাংলা লোককাহিনীর জনপ্রিয় একটি কাহিনীর যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। রওশন ইজদানীর মোমেনশাহীর লোকসাহিত্যে (ঢাকা, ১৯৫৮) 'কাক ও চড়ুই' নামে কাহিনীটি পাওয়া যায়। কেচ্ছা-কাহিনীর রীতির কাহিনীর মধ্যে যেমন গাভী, গাভীর দুধ, আগুন, কামার ইত্যাদি লৌকিক উপাদানগুলি বর্তমান তেমনি 'চড়ুই আর কাকের কথা' বা 'কাক ও চড়ুই' শিরোনামের বাংলা লোককাহিনীর মধ্যেও উপরোক্ত উপাদানগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন, "গল্পের একটি নৈতিক দিক আছে; 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু', 'অতি লোভে তাঁতীর মরণ' -বলে একটি প্রবাদ আছে। অতি লোভ করতে গিয়ে কাকটি প্রাণে মারা গেল।"[৬৫] 'কাক ও চড়ুই' এর গল্পে যেমন অতি লোভ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেল তেমনি কেচ্ছাকাহিনী রীতির গল্পেও কামারসহ অন্যান্য বিরূদ্ধ চরিত্রগুলি অতি লোভ করতে গিয়ে শেষে সবাইকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রাণ দিতে হল। কেচ্ছা-কাহিনী রীতি আনন্দ বিনোদনের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হলেও এর মধ্যে নৈতিকতার এই দিকটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৩.২.৯. হাস্তর গান

নড়াইল অঞ্চলের কালিয়াতে 'কেচ্ছাকাহিনী'র মতোই 'হাস্তর গান' নামে আরেকটি নাট্যরীতি লক্ষ্য করা যায়। নীচে এই রীতির কিছু জনপ্রিয় গানের নাম উল্লেখ করা হলো যা প্রায়ই 'কেচ্ছা কাহিনী' বা 'হাস্তর গান' রূপে অভিনীত হয়ে থাকে। যেমন- 'বিরাজ গুরু' (স্থানীয় উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে রচিত), 'বেলপতি কইন্যা' (পরীর গল্প), 'আলী বাবা চল্লিশ চোর' (আরব্য কাহিনী অবলম্বনে), 'বেহুলা লক্ষিন্দর' (পদ্মাপুরাণ কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত)।

এছাড়াও বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে পাংশা এলাকায় 'হাস্তর গান' (শাস্ত্র) নামে একধরনের নাট্যরীতির অভিনয় দেখা যায়। এ গান গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে মুসলমানদের দ্বারা অভিনীত হয়ে থাকে। রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার হাজরা পাড়া গ্রামে শাস্ত্রগানের দলের খোঁজ পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর লোক এ গানের দর্শক হিসেবে উপস্থিত হয়ে থাকেন। গানের অধিকাংশ কাহিনীই ধর্ম নিরপেক্ষ প্রকৃতির এবং এর বিষয় হিসেবে দুঃসাহসিক অভিযান ও বীরত্বপূর্ণ অভিপ্রায় ও প্রেমমূলক কাহিনীই বেশি দেখা যায়। এই প্রকৃতির কতগুলি জনপ্রিয়

---

[৬৪] মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, বাংলাদেশের লোককাহিনী : ২য় খণ্ড, নরসিংদী, ১৯৯৭, পৃ. ৫১-৬৫

[৬৫] ড. ওয়াকিল আহমদ, লোককথা তত্ত্ব ও মতবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যায়িকা হল : শাহ জামাল (বা জামাল বাদশা), 'জানে আলম বাদশা'। পদ্মাপুরাণের উপর ভিত্তি করে রচিত চাঁদ সওদাগরও খুবই জনপ্রিয়।[৬৬]

আসর : গানের অভিনয়স্থান সাধারণত আট থেকে নয় ফুট ব্যাসের অনুচ্চ বৃত্তাকৃতির হয়ে থাকে (লেখচিত্র নং ৫)। এই বৃত্তাকার অভিনয় মঞ্চের বর্গাকারের আয়তন ধরে অভিনয় মঞ্চের উপরে সামিয়ানা বাধার জন্য চার কোণে চারটি বাঁশের খুটি স্থাপন করা হয়। আলোর উৎস্য হিসেবে অভিনয় মঞ্চের চার কোণে বাঁশের সাথে হ্যাজাক লাইট বা বৈদ্যুতিক বাল্ব ঝুলিয়ে রাখা হয়।

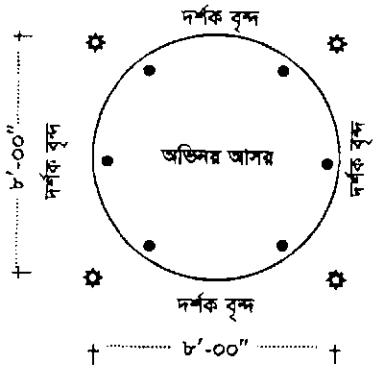

লেখচিত্র নং ৫ হাস্তর গান

অভিনয় কাঠামো : দর্শকেরা বৃত্তাকার অভিনয় স্থানের চতুর্দিকে উপবেশন করে থাকে। অভিনয় স্থানের পরিধিতে পাঁচ থেকে সাতজনের কোরাস দল সমান দূরত্বে অবস্থান করে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই গানে কোন বাদ্যযন্ত্রী দল থাকে না। মূল গায়েন বা প্রধান বর্ণনাকারী বৃত্তাকার অভিনয় স্থানের মধ্যস্থানে অভিনয় করে থাকেন। শাস্ত্রগানে (হাস্তর গান) দুই ধরনের অভিনয় পরিলক্ষিত হয় : ১) বর্ণনাত্মক অভিনয়-গদ্য, ২) বর্ণনাত্মক অভিনয়-গীত। গানের প্রথমভাগে মূল বর্ণনাকারী উপস্থিতভাবে (Improvised) গদ্য বর্ণনের দ্বারা কাহিনী বর্ণনা করেন। আর দ্বিতীয়ভাগে কোরাস দলের ধুয়া সহযোগে পুনরায় তা গানের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোরাস গায়ক দল মূল বর্ণনাকারীকে সংক্ষিপ্ত ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কাহিনীকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। দলের সমস্ত অভিনেতারাই অভিনয়ে সাধারণ নিত্যব্যবহার্য পোশাক পরিধান করেন। সাধারণত ভরাপূর্ণিমায় এই গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। রাতের খাবারের পর আটটা থেকে নয়টার দিকে গান শুরু হয়ে রাত দুইটা থেকে তিনটার দিকে শেষ হয়ে থাকে।[৬৭]

৩.২.১০. ঘাটু গান

ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলে ঘাটু গান, ঘাড়ু গান, গাড়ু গান এবং গাটু ইত্যাদি নামে আজও এধরনের লোক অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে যখন পূর্ব ময়মনসিং অঞ্চলের বড় বড় হাওর বিলগুলি পানিতে ভরে থাকে, খুব কমসংখ্যক কৃষক কৃষিকাজে যাবার সুযোগ পায়, তখন তাঁদের এই অবসর সময়টা তারা বাড়িতে বসে ঘাটু গান গেয়ে কাটিয়ে দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষ যেমন আষাঢ় মাসের রথযাত্রা উৎসবে, শুভ নববর্ষের বৈশাখ মাসে শুভ হালখাতা, বৈশাখী মেলা, চড়ক পূজা ইত্যাদি উপলক্ষ্যেও এই গানের পরিবেশনার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বৎসরের যে কোন সময় যদি কেউ 'ঘাটু গানে'র অভিনয় করাতে চায় তাহলেও এই অভিনয় হতে দেখা যায়।

পৃষ্ঠপোষকতা : পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রাম্য সমাজের আপেক্ষাকৃত ধনবান প্রভাবশালী শ্রেণীই এই গানের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে থাকে। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে অধিকাংশ কলাকুশলী-ই মুসলমান এবং পেশায় তাঁদের সবাই-ই কৃষক শ্রেণীর। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দর্শক হিসেবে এই গানের অভিনয় উপভোগ করে থাকে।

ঘাটুগানের দলের গঠনকাঠামো : 'ঘাটুগানে'র দলে একজন সরকার থাকেন। তিনিই প্রধান গায়ক ও নাচের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রায় ক্ষেত্রেই তারা গ্রামের দারিদ্রতার কষাঘাতে পীড়িত পরিবারের কিশোর বয়সী ছেলেদেরকে গান গাওয়ার চুক্তি (তিন থেকে পাঁচ বছর) করে নিয়ে এসে নাচ-গান শিখিয়ে তাঁদেরকে নাচে-গানে দক্ষ করে গড়ে তোলেন। এই কিশোরেরা ঘাটু বা ছোকরা নামে পরিচিত। ঘাটু গানের নাচে-গানে পারদর্শী এইসব ছোকরাদের (সাধারণত বারো থেকে পনের বছর বয়সী) ভরণ-পোষণের সমস্ত খরচ দলের সরকারই বহন করে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দলের সরকার কোন এক সময় ছোকরা ছিল। কথিত আছে যে, এক সময় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানায় যখন ঘাটু গান খুবই জনপ্রিয় ছিল, তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাচ্চা শিশুদেরকে ধরে এনে এই ঘাটু গানের দলের সরকারদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হত। এরা কখনই আর তাঁদের

---

[৬৬] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka, 2000, Pg. 280
[৬৭] পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাবা-মা'র কাছে ফিরে যেতে পারত না। 'ঘাটু গানে' পারদর্শী ছোকরাদের বেশি দামে বিক্রি করা হত। ফলশ্রুতিতে দক্ষ ছোকরাকে অধিকারের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ-বিবাদ লেগে যেত। কখনও কখনও দক্ষ ছোকরার নিরাপত্তার জন্য দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করা হত।[৬৮] 'ঘাটু গানে'র অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রী হিসেবে বাকীরা সবাই কোরাস গায়ক দল (পাইল) হিসেবে কাজ করে থাকে। এই নিয়ে 'ঘাটু গানে'র একটি দল গঠিত।

ঘাটুগানের দল পরিচিতি : নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত সম্ভদ সরকার, ঝংকার শিল্পগোষ্ঠী নামে নিজেই একটি দল চালিয়ে থাকেন। তিনি নিজে সরকার, দুইজন ছোকরা, চৌদ্দজন পাইল এবং দুইজন বায়েন (যারা বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোলক ও মন্দিরা বাজিয়ে থাকেন) নিয়ে তাঁর ঘাটু দল গঠিত। তাঁর বায়েনদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে ঢোলক, একজোড়া মন্দিরা ও করতাল উল্লেখযোগ্য।[৬৯]

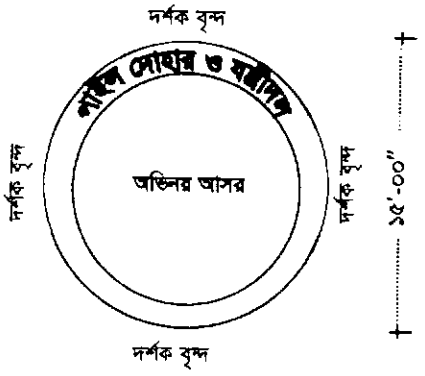

ঘাটু গান, লেখচিত্র ৬

এছাড়াও 'ঘাটুগানে'র আরেকটি দলের সরকার হলেন হাসান আলী, গ্রাম রাধা-কৃষ্ণপুর, থানা মধুপুর, জেলা টাঙ্গাইল। তাঁর দলে তিনি নিজেই সরকার। দুইজন ছোকরা, আটজন পাইল এবং দুইজন বায়েন রয়েছে। চার থেকে পাঁচজন ছোকরা ও সমসংখ্যক বায়েনদের নিয়েও ঘাটু দল রয়েছে। এসব দলে উপরোক্ত দলগুলির মতো দুইজন বায়েন ছাড়াও অন্যান্য বায়েনরা বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, বাঁশি, করতাল, সারিন্দা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।[৭০]

অভিনয় কাঠামো : 'ঘাটু গান' সাধারণত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোন স্থানে অথবা টার্মিনালের খোলা পরিবেশে অথবা কোন বাড়ির উঠানে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে খুব কমই বাড়ির উঠানে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। বাড়ির উঠানে পরিবেশনের আয়োজন করা না হলে গ্রামের মহিলাদেরকে সাধারণত দর্শক হিসেবে উপস্থিত হতে দেখা যায় না। জানা যায়, সম্ভদ সরকারের দল গান পরিবেশনার জন্য সাধারণত বড় কোন গাছের নীচে এবং প্রায় পনেরো ফুট ব্যাসের অনুচ্চ বৃত্তাকার মঞ্চের আয়োজন করে থাকে। এই বৃত্তাকার আসরের চতুর্দিক ঘিরে দর্শক বসে থাকে। শুধুমাত্র শীত বা বৃষ্টির মৌসুমে অভিনয় স্থানের উপরে চাঁদোয়া বা সামিয়ানা টাঙানো হয়। আসরের চারদিকের চার কোণে চারটি খুটির সাহায্যে মাথার উপরে চাঁদোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আলোর উৎস হিসেবে অভিনয় আসরের বৃত্তের পরিধিতে দুই থেকে তিনটি হ্যাজাক লাইট জ্বালানো থাকে। অভিনয় স্থানের পরিধির ভেতরের দিকে সমস্ত অভিনেতারা অর্ধবৃত্তাকারে ছোকরাদের আগলে বসে থাকেন এবং বায়েন দুজন কোনাকুনিভাবে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে আসরে অবস্থান করেন (ঘাটু গানের অভিনয় স্থান, লেখচিত্র ৬)। অর্ধবৃত্তাকারে বসা অভিনেতাদের সামনে থেকে শুরু করে নির্ধারিত অভিনয় মঞ্চের ভেতরেই ছোকরা-নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। বড় কোন লঞ্চ, টার্মিনালের ডেকে ঘাটুগানের অভিনয় করার সময়ও অভিনেতারা এই একইভাবে মঞ্চে আসন গ্রহণ করে থাকে। যখন সাধারণত জাহাজ ঘাটে জাহাজ নোঙর করা থাকে তখন ঘাটু গানের সময় সাধারণভাবেই নদীর পারে দর্শকের সমাগম ঘটে থাকে। অভিনয়ে খুশী হয়ে দর্শকেরা অনেক সময় ছোকরাদেরকে বক্শীশ প্রদান করে থাকেন। যেহেতু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাটুগানের বিভিন্ন উপাখ্যান অভিনীত হয়ে থাকে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং অভিনীত উপাখ্যানটি হল রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক উপাখ্যান। এসব উপাখ্যানের বেশিরভাগ কাহিনীরই শেষ হয় মিলনের আকুল আকাঙ্খা নিয়ে। কিন্তু কখনও তা মিলনকে সূচিত করে না।

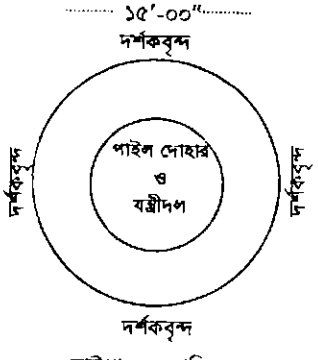

ঘাটুগান, লেখচিত্র ৭

অপরদিকে হাসান আলীর দলের পরিবেশিত ঘাটুগানের অভিনয়ে অভিনয় স্থান বা আসরের মধ্যস্থানে অভিনেতারা গোল হয়ে বসেন। আর ছোকরা অভিনেতারা আসরের মধ্যস্থানে গোল হয়ে বৃত্ত ও দর্শকের মধ্যকার স্থানের ফাঁকা অংশে অভিনয় পরিবেশন করে থাকেন (ঘাটু গানের অভিনয় স্থান, লেখচিত্র ৭)।

---

[৬৮] ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১০৭

[৬৯] সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সম্ভদ সরকার, ঝংকার শিল্প গোষ্ঠী, নেত্রকোনা, কেন্দুয়া, সাক্ষাৎকার স্থান : টিএসসি চত্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী, ১৯৯৭

[৭০] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka, 2000, Pg. 286

Dhaka University Institutional Repository

সাজসজ্জা : বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছোকরা-রা লুঙ্গী এবং লম্বা আলখেল্লা পরিধান করে থাকে। তাঁদের বেশভূষা-সাজসজ্জা অবিবাহিতা স্ত্রী লোকের মতো মাথায় মুকুট-পরচুলা, গলায় মালা, পায়ে আলতা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার করে। ছোকরাদের মধ্যে যিনি কৃষ্ণ সাজেন তিনি ধুতি এবং হাতাকাটা কোট পরিধান করেন, মাথায় কারুকাজ করা মুকুট ব্যবহার করেন এবং হাতে একটি বাঁশী রাখেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ চরিত্রের অভিনয়ে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের আচার ব্যবহার্যের মতো করা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ঘাটুগানের অভিনয়ে ছোকরা-রা পায়ে ঘুঙুর পরে থাকে।

নিম্নে ঘাটু গানে পরিবেশিত রাধা-কৃষ্ণ আখ্যানের একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল-

> কৃষ্ণ মাঠে গরু চড়াতে যাবে তাই তার মা'কে ডেকে তাকে সকালের খাবার দিতে বলছে। কৃষ্ণের সংগীরাও এসে পৌঁছে তার মাকে অনুরোধ করছে যে, যেন কৃষ্ণকে সাজিয়ে দেয় এবং যেতে অনুমতি দেয়। কেননা ইতিমধ্যেই গরুকে মাঠে চড়ানোর জন্য অনেক দেরী হয়ে গেছে। কৃষ্ণ যখন তাঁর সঙ্গীদের সহকারে পথদিয়ে যাবারকালে রাধাও তখন তাঁর সখীদের সাথে পানি নিয়ে যাচ্ছিল। যাবার সময় একে অপরকে দেখে প্রেমে পড়ে যায়। এরপর দিনের বাকী সময়টা সারাক্ষণ প্রিয় ভালোবাসার লোককে নিয়ে নানা রকম কল্পনা, চিন্তা আর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কেটে যায়। রাতে হতাশায় কাঁদতে কাঁদতে যখন ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখল; কৃষ্ণের সাথে তাঁর দৈহিক মিলন হচ্ছে। তখন ভোরে পাখির কলতানে ঘুম ভাঙলে তাঁর মনের ভেতরে কৃষ্ণকে পাবার আকাংক্ষা আরোও বেড়ে যায়। তিনি নিজেকে শান্তনার দ্বারা আস্বস্ত করে সখীদের সাথে ফুল তুলতে লাগলেন। এভাবে একসময় যমুনায় গোসল করে পানি আনার সময় হয়ে আসে। সে তাঁর সখীদেরকে কৃষ্ণ আসছে কিনা বা দেখা যায় কিনা সেদিকে নজর রাখতে বললেন। যখন গোসল সেরে পানি নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন কৃষ্ণ সত্যি সত্যিই তাদের পেছন পেছন অনুসরণ করছে। কৃষ্ণ, রাধার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন এবং মনের গভীরে এক রোমাঞ্চকর তীব্র অনুভূতি অনুভব করলেন। সুবাস নামে কৃষ্ণের এক সহচরকে জানতে পাঠালেন যে, এই অপরূপা সুন্দরী রমণী কার স্ত্রী হতে পারে এবং ক্রমে কৃষ্ণর ভেতরে রাধা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরোও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে সাহস করে রাধার সাথে কথা বলতে যায়; কিন্তু রাধার কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করে। যমুনার পানিতে রাধার গোসল করার সময় কৃষ্ণ রাধাকে তাঁর মনের অতৃপ্তির কথা জানায়।[৭১]

উপরোক্ত উপাখ্যানটির এখানেই শেষ হয়ে যায়। এরপর ধারাবাহিকভাবে বিচ্ছেদের বিষয়কে নিয়ে বিরহ বা একাকীত্বের গান শুরু হয়। যদিও ঘাটু গানের বেশিরভাগ কাহিনী রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হলেও লীলাকীর্তনের ভজন বা প্রার্থনা সংক্রান্ত গীত এর মধ্যে কিছুটা কম পরিলক্ষিত হয়। বিপরীতে, ঘাটু গানের কাহিনীতে (যা অভিনীত হয়ে থাকে) বিষয় হিসেবে প্রচলিত সুফীবাদের অতীন্দ্রিয়বাদমূলক গীতে সক্রিয়তা ও পরিবর্তনশীলতার (Dynamism) বৈশিষ্ট্য এবং মধুররস মিশ্রিত জাগতিক কামনা-বাসনার বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয়।[৭২] 'ঘাটুগানে'র অভিনয়ে সংলাপের সমস্ত অংশটাই কাব্যে রচিত। এ সকল উপাখ্যান রচয়িতাদের সন্ধান পাওয়া না গেলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন; কোন অশিক্ষিত মুসলিম কৃষক মৌখিকভাবে এগুলি রচনা করে থাকবেন। অভিনেতারা দলের সরকারের কাছ থেকে মুখে শুনে পালার গানগুলি আত্মস্থ করে থাকেন।

'ঘাটু গানে'র অভিনয় সাধারণত বন্দনা দিয়েই শুরু হয়ে থাকে। এক বা একাধিক ছোকরার সাথে কোরাস দল বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনা সহযোগে কৃষ্ণ বা স্বরস্বতীসহ অন্যান্য দেবতা এবং গুরুকে সালাম জানিয়ে গান পরিবেশন শুরু করে। হাসান আলীর দলের ক্ষেত্রে কখনও কখনও তাঁদের পরিবেশিত বন্দনার গানে ধর্মগত প্রভাব মুক্ত হয়ে থাকে। গানের শুরুতে তারা যে বন্দনা গান পরিবেশন করে তাঁকে তারা 'সালাম' বলে থাকে। এই গানের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের দলের পরিচিতি এবং দর্শকদেরকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অভিবাদন জানিয়ে থাকে।

ঘাটুগানের অভিনয় উপাদান সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো :

১) সংলাপাত্মক অভিনয়-গীত : অনবরত নাচের সাথে কোরাস এবং বাদ্যযন্ত্রীদের বাদ্যসহকারে ছোকরা অভিনেতারা গানের অংশগুলি অভিনয় করে থাকে। গানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দোহারদল বরাবরই বাদ্যের তালে তালে হাত তালি দিয়ে তাল দিয়ে থাকে। রাধা বা রাই, কৃষ্ণ বা সিয়াম চরিত্রগুলি তাঁদের সহচর-সহকারে গানে সমস্ত অংশগুলি পরিবেশন করে কিন্তু এই চরিত্রগুলির মধ্যে কখনওই সরাসরি সংলাপের আদান-প্রদান হয় না। প্রতিটি দৃশ্যে শুধুমাত্র একজন কথক থাকেন তখন অন্যান্যরা (যেমন- রাধা বাড়ীতে বসে একাকী কৃষ্ণের জন্য অধীর

---

[৭১] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka, 2000, Pg. 287

[৭২] আব্দুল কাদের, বাংলার লোকায়ত সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহে অপেক্ষা করছে) অনুপস্থিত থাকে অথবা নিশ্চুপ থাকে (যেমন- কৃষ্ণ যখন রাধাকে উদ্দেশ্য করে কোন বর্ণনা করে থাকে)। এর নাচের অংশগুলি ভাড়ামী বা প্রহসনমূলক, মাধুর্য্যপূর্ণ, প্রেমমূলক (কামদ) হয়ে থাকে। গানের মধ্যে বৈচিত্র্যতা আনার জন্য সুরের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলির মধ্যে উড়াইল্যা সুর/গান, সাম গান, কাইচমারী গান, চাইল গান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২) প্রহসনমূলক অভিনয় : অভিনয়ে আসরে সরকার নিজেই গানের অংশগুলি গেয়ে থাকেন। এ সময় ছোকরারা নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। সাধারণত রাত আট-টার পরে 'ঘাটু গানে'র অভিনয় শুরু হয়ে ভোর রাতের দিকে শেষ হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর ছন্দে কৃষ্ণলীলার গানগুলি পরিবেশিত হয়ে থাকে এবং শেষের গানটি নিমাই (চৈতন্য) এর উপরে হয়ে থাকে যার দ্বারা বোঝা যায়, যে 'অভিনয় শেষ হতে যাচ্ছে'। কখনও কখনও 'ঘাটুর গানে' একজন ছোকরা মেয়ে (বালিকা) সেজে রাধা-কৃষ্ণ উভয় চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে।

৩) প্রতিযোগিতামূলক অভিনয় : ঘাটু গানের দুটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অভিনয়ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঘাটু গানের এই প্রতিযোগিতামূলক অভিনয় 'লড়াক' নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে দল দুটি অভিনেয় আসরে গোল হয়ে উপবেশন করে (মঞ্চ ব্যবস্থাপনা সম্ভ্রদ সরকারের মতোই) এবং দর্শকেরা এই দুটি দলের উপবেশনকৃত বৃত্তের চারপার্শ্বে অবস্থান করে। আর বিষয়ের দিক থেকে একটি দল যদি রাধার পক্ষ নেয় তাহলে অন্যদলকে কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে আসরে উপস্থিত হতে হয় এবং তখন এক দল আরেক দলকে প্রশ্ন করে থাকে। এদের একটি দল রাধা (রাই) বা কৃষ্ণের (সিয়াম) এর পক্ষ নিয়ে অপর দলকে প্রশ্ন করে। এদের প্রশ্নগুলি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক হয়ে থাকে তবে এমনকি কখনও কখনও সুফীবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদও বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কোন একটি দল অপর দলের করা প্রশ্নে উত্তর দিতে বা গান গাইতে ব্যর্থ হলে প্রশ্নকারী দল তাঁদের করা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় এবং অপর দলের ব্যর্থতাকে দলের সরকার (গুরু হিসেবে) পরাজয় বলে মেনে নেয়। ক্ষেত্র বিশেষে এই ধরনের অভিনয় ছয় দিন-ছয় রাত ধরে পরিবশিত হতে দেখা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঘাটুগানের অভিনয়ের সাথে 'লড়াক' অভিনয়ের বেশ মিল রয়েছে। এই ধরনের অভিনয় সাধারনত গ্রাম-গঞ্জের লঞ্চ-টার্মিনালে, জাহাজ ঘাটে আয়োজন করতে দেখা যায়।

মুহম্মদ সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরীর মতে, ষোল শতকের প্রথমার্ধে সিলেটের অন্তর্গত আজমীর গঞ্জের বৈষ্ণববাদী আচার্য রাধা কৃষ্ণের যুগলরূপে দর্শনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভক্তির সাথে গভীর উপাসনা করেন। সম্ভবত নিজের কোষ্ঠ সাধনে প্রচণ্ড রকম মানসিক ইচ্ছার কারণে ছোট বালকদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন যারা রাধার সাক্ষীরূপে নাচে গানে পারদর্শী ছিল। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী বলেন, "ধীরে ধীরে তাহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল ও নিম্ন শ্রেণীর অনেক ছেলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল বা শিষ্য করিয়া লওয়া হইল। এইসব ছেলেকে রাধিকার সখী সাজান হইত। ছেলেরা নীরবে নাচিয়া ভাব প্রকাশ করিত, বিরহ সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ ও ভাবাতুর করিত। ক্রমে এই ছেলে-শিষ্যদের যোগে গড়িয়া উঠিল গাঁড়ু গান। এভাবে মহিলার সাজে বালকদের দ্বারা পরিবেশিত লাস্য নৃত্যের পূর্বোল্লিখিত নৃত্যের মধ্য দিয়ে ঘাটুগানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। গাঁড়ু গানের সম্যক বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভের পূর্বে উক্ত উদয় তদীয় গুরুদেবের আচরিত সাধন পদ্ধতির কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে পালাগানে পরিণত করেন। এই পালাগান বা গাঁড়ু গান ভজন, সালাম, সাজন, গৌর, বংশী, গোষ্ঠ, জলভরা, জলরূপ, ফুল তোলা, কুঞ্জ সাজান, নিদ্রা, স্বপন, কোকিল, বিচ্ছেদ, ভোর, মধুমাস, সখী সংবাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি অঙ্কে বিভক্ত।"[৭৩] প্রত্যেক অঙ্ক আবার সাধারণ গান, খেয়াল গান ও সমগানে বিভক্ত। কাশিমপুরী আরোও দেখিয়েছেন যে, ঘাটুগানের কিছু গানের হিন্দি শব্দের ব্যবহার রয়েছে এবং তিনি অনুসন্ধান করে যা পেয়েছেন তাহল; ঘাটুগানের উৎপত্তি লোক সমাজ থেকে নয়। তা উত্তর ভারতের মথুরার নিকটে 'ব্রজ' এর বিশ্বনাথ কেন্দ্র থেকে আহরিত। ঘাটুগানের হিন্দি শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে এদের আগমন ঘটেছে যা একসময় ব্রজবুলি রূপে চিহ্নিত হত। ঘাটুগানের উৎস সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিতগণই উপরোক্ত মতামত প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন, ঘাটুগান বিশ্বনাথ আচার্যেরই সৃষ্টি। যিনি ব্রজবুলির শব্দ দ্বারা পদাবলী কীর্তনকে সম্মৃদ্ধ করেছিলেন।[৭৪] আশরাফ সিদ্দিকী এবং আব্দুল হাফিজও ঘাটুগানের উৎপত্তির বিষয়ে একই মত পোষণ করেন। বৈষ্ণববাদের ভজন সাধনের শ্বাশত বিরহের বিপরীতে নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণজনিত ধর্ম নিরপেক্ষ প্রেম বিষয়ক সঙ্গীতের রূপ লাভ করে। স্থানীয় প্রভাবশালীরা অর্থ-উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ঘাটুগানকে টিকিয়ে রাখতে দল গঠন করে ঘাটুদেরকে একটি নির্দিষ্ট বরাদ্ধকৃত মাসোহারা দিতে শুরু করে। বর্তমানে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ঘাটুগান আজ লুপ্ত প্রায়।

ঘাটুগানের কিছু বিশিষ্ট ব্যবহার ও অভিনয় উপাদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীচে আলোচনা করা হলো :

---

[৭৩] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী, গাঁড়ু গান, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলনঃ ৫৩, পৃ. ১২৪

[৭৪] পূর্বোক্ত, Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, pg. 290

Dhaka University Institutional Repository

১) স্থাপনার কাজে ঘাটুগানের ব্যবহার : 'ঘাটুগানে'র বৈচিত্র্য হিসেবে বট্ ঘাটুর অভিনয় পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত যেখানে স্থাপাত্য নির্মাণ এলাকায় "Working Song" হিসেবে ঘাটুগানের দল এই গান পরিবেশন করে থাকে। বিশেষ করে বিল্ডিং এর ছাদ ঢালাইয়ের সময় চুন, বালি ও পানির মিশ্রণের উপর কাঠের মুগুর দিয়ে পিটিয়ে শক্ত করার কাজে কন্ট্রাক্টর এর সাথে চুক্তি করে প্রায়ই গান করে থাকে। 'বট ঘাটু'র গানের দল গানের পাইল ধরে এর তালে তালে শক্ত কাঠের গুড়ি দিয়ে একাধারে ছাদ ঢালাইয়ের মিশ্রণের কাজে তাল দিয়ে থাকে। তাঁদের সামনে একজন ঢোল বাদক ঢোলের বাদ্য বাজিয়ে যায় এবং একজন ছোকরা বাদ্যের তালে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। বর্তমানে গ্রামে-গঞ্জে খুব কমই এধরনের অভিনয় অভিনীত হতে দেখা যায়। বাগেরহাটের দক্ষিণাঞ্চলেও ছাদ ঢালাইয়ের কাজে গানের দল গান পরিবেশন করে থাকে। তবে সেখানে তারা 'ছাদ ঢালাইয়ের কাজে গান পরিবেশনার দল' নামেই পরিচিত। ঢালাই কাজ ছাড়া তারা সাধারণত অন্য কোন রীতির অভিনয়ের সাথে যুক্ত থাকে না।

২) ছোকরাদের নাচের ধরণ : ছোকরাদেরর নাচ খুবই কামোত্তেজনা পূর্ণ হয়ে থাকে। যা দর্শকদেরকে আলোড়িত করে তোলে। ঘাটুগানের অভিনয়ে শৃংগার রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন, যারা লোকনাট্যের কলাকুশলী, মাটির সাথে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কটা হচ্ছে আত্মিক। আর দৈহিক দিক থেকে মাটির সাথে দেহ সরাসরিভাবে নীচের অংশ দ্বারা সম্পর্কিত। এ কারণে প্রায় লোকনাট্যই যৌন বা কামোত্তেজনা মূলক উপাদান দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত।

৩) সংলাপ : কোন চরিত্রের সংলাপের সময় অন্য চরিত্রগুলি হয় নিশ্চুপ থাকে অথবা অনুপস্থিত থাকে।

৪) পোশাক : বিশেষকরে মহিলা পোশাকধারী যে কেউ যে কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে। যার ফলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণের চরিত্রের সময় যে দুটো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাহল পুরুষ অভিনেতা মেয়ে সেজে অভিনয় করে আবার ঐ একই ব্যক্তি পুরুষ চরিত্রের ভূমিকায়ও অভিনয় করে থাকে।

৩.২.১১. মাটিয়াল গান

বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার দিকে একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য রীতি হল মাটিয়াল গান । অধিকংশ ক্ষেত্রেই এই গান হিন্দুদের দ্বারা পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এদের বেশিরভাগই পেশায় কৃষিজীবী।

পৃষ্ঠপোষকতা : মাটিয়াল গান সাধারণত হিন্দুদের অনুষ্ঠান উৎসবে, সামাজিক অনুষ্ঠান (যেমন বিয়ে, অন্নপ্রাশন, আকিকা ইত্যাদি) এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ের উৎসবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সমষ্টিগতভাবে এই গান পরিবেশনের আয়োজনকালে (যেখানে গান পরিবেশন করা হবে) সেখানকার প্রতিবেশীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে টাকা বা চাল এনে সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত এসমস্ত অর্থ ও উপাদান দলের অভিনেতাদের সম্মানী হিসেবে দেয়া হয়। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে দর্শকেরা এ গানের পরিবেশনা উপভোগ করে থাকে।

আসর : আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে এ গানের অভিনয় স্থান বা আসর অনুচ্চ প্রায় ১৫'×১৫' আয়তাকৃতির হয়ে থাকে। তবে কখনও কখনও দর্শকের উপস্থিতির পরিমাণ বেশি হলে এর অভিনয় স্থান মাটি থেকে প্রায় এক ফুট পরিমান উঁচু করা হয়। অভিনয় আসরের উপরে সামিয়ানা টাঙানোর জন্য অভিনয় আসরের চারকোণে চারটি খুটি স্থাপন করা হয়। পূর্বে বাঁশের চটা দিয়ে মাচার মতো করে তার উপরে ছাউনি হিসেবে শাড়ি ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে সামিয়ানা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অভিনেতাদের মতে, মাথার উপরে সামিয়ানা না টাঙানো থাকলে অভিনেতাদের প্রক্ষিপ্ত সংলাপ "উড়ে যায়"। দর্শকেরা শুনতে পায় না। অভিনয়স্থান বা আসরের সাথে একটি সরু পথ দ্বারা গ্রীনরুম সংযুক্ত করা থাকে। অভিনয়ের জন্য কখনও গ্রীনরুম অস্থায়ীভাবে তৈরী করা হয় অথবা অভিনয় আসরে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য সামান্য সরু পথ ছেড়ে দিয়ে দর্শকগণ অভিনয় আসরের চতুর্দিকে ঘিরে বসে থাকে। অভিনয় আসরের ঠিক মাঝ খানে পাঁচ থেকে ছয়জন দোহার (একই সাথে বাদ্যযন্ত্রীদল) গোল হয়ে আসন গ্রহণ করে থাকে।

বাদ্যযন্ত্র : তাঁদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে খোল, করতাল, মন্দিরা, খমক, খঞ্জরী, বাঁশী, দোতারা এবং হারমোনিয়াম উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয় কাঠামো : অভিনয় চলাকালীন সময়ে গানের অংশে পাইল ধরা এবং বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজানো তাঁদের কাজ। অভিনয় আসরের মাঝখানে গোল হয়ে বসা পাইল-দোহার দলের সাথে একজন প্রম্পট মাষ্টারও অবস্থান করেন। দলের অন্যান্য সদস্যদের প্রায় বারোজন বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ে অংশ নিয়ে থাকেন। তারা চরিত্রাভিনয়ের জন্য গ্রীনরুম থেকে মঞ্চে প্রবেশ ও মঞ্চ থেকে গ্রীনরুমে প্রস্থান করে থাকেন। দলের সমস্ত সদস্যরাই পুরুষ। চরিত্রের প্রয়োজনে পুরুষেরা মহিলা (ছুকরী) সেজে মহিলা চরিত্রের অভিনয় করে থাকেন। সাধারণত এরূপ প্রতিটি গানের দলের মধ্যে তিনজন করে ছুকরী থাকতে দেখা যায়। একটি মাটিয়াল গানের কাহিনীতে (অভিনয় টেক্সট) প্রায় কুড়িটি দৃশ্য এবং পনেরটি গান রয়েছে। গানগুলির জন্য পূর্বেই রিহার্সল করে প্রস্তুতি নেয়া থাকে কিন্তু অভিনয়ের মধ্যকার সংলাপগুলি আসরে অভিনয়ের সময় তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট এবং গদ্য আকারের হয়ে থাকে।

নিম্নে মাটিয়াল গান রীতির 'চাইনাশভরি' পালার কাহিনী সংক্ষেপ উদ্ধৃত করা হলো :

> বিতান পিয়ারী নামে এক বিধবা মহিলা ছিল। তাঁর এক সুন্দরী কন্যা ছিল, নাম চায়নাশভরি। তাঁদের বাড়ীতে এক গরীব কিশোর কাজ করত। যেহেতু সে শ্যালো টিউব-ওয়েল চালাত সে কারণে তাঁকে দ্বি-শ্যালো নামে ডাকা হতো। এক সময় চায়নাশভরি শ্যালোকে ভালোবেসে ফেলে। চায়নাশ ভরির মা তাঁদের মধ্যকার সম্পর্কের কথা জানতে পারলে দ্বি-শ্যালোর সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। গ্রামের মুরুব্বীদের কাছে বিতান পিয়ারী দ্বি-শ্যালোর বিরুদ্ধে বিচার দিলে তারা দ্বি-শ্যালোর পক্ষে রায় দেয়। ঘটনা পর্যায়ে জানা যায় গ্রামের প্রভাবশালী জমিদার বিতান পিয়ারীকে বিয়ের জন্য পুরোঘটনাকে নিয়ন্ত্রন করছিলেন। বিতান পিয়ারী বিস্তারিত ঘটনা শুনে গ্রামের প্রভাবশালী জমিদারের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হন এবং তাঁর মেয়েকে ও দ্বি-শ্যালোর সাথে বিয়ে দিতে রাজী হন।[৭৫]

সাধারণত রাত এগারোটার দিকে মাটিয়াল গানের অভিনয় শুরু হয়ে সারা রাত ধরে চলতে থাকে। অভিনয় শুরুর পূর্বে মন্ত্রপূত পাঠ করে পবিত্রকরণের জন্য অভিনেতারা নিজেদের শরীরে তেল মেখে থাকে। শয়তানের দৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে আড়াল করার জন্য গ্রীনরুমে বসে তারা এই কাজ করে। কোনরকম বাধা বিপত্তি থেকে রক্ষা পেতে এবং নিরাপদে অভিনয় শেষ করতে আসর বন্ধনের জন্য সবার অলক্ষ্যে তারা এই তেল মঞ্চেও ছিটিয়ে থাকে। তেল দ্বারা নিজেদেরকে (অভিনেতা) ও আসর পবিত্রকরণের এই পদ্ধতি খুবই গোপনীয়ভাবে পালন করা হয়। তাঁদের বিশ্বাস সঠিকভাবে নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এই তেল ব্যবহার করতে পারলে তা খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। যিনি যাদুবিদ্যার দ্বারা এই পবিত্র তেল তৈরী করেন তাঁকে গুণিক বলা হয়ে থাকে। সাধারণত প্রতিটি গানের দলে একজন করে গুণিক থাকে।

গানের শুরুতেই কিছুক্ষণের জন্য অকেস্ট্রা বাদন পরিবেশনার পরেই বন্দনা গান শুরু করা হয়। দুইজন ছুকরী ও দুইজন পুরুষ অভিনেতার দ্বারা বন্দনার গীত পরিবেশন করা হয়। বন্দনা গানে স্বরস্বতী, কালী, গঙ্গা, ধর্মঠাকুর, পীর, নবীদের আশীর্বাদ কামনা করা হয়। দলের গুরু এবং দর্শকদের আশীর্বাদ কামনা করা হয়। কখনও কখনও বন্দনার গানে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার জন্য (নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে) আশীর্বাদ প্রার্থনা সংযোজন করা হয়।

মাটিয়াল গানের অভিনয় উপাদান সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো :

১। সংলাপাত্মক অভিনয়-গদ্য : নাট্যাভিনয়ে অভিনেতাদের প্রক্ষিপ্ত গদ্য সংলাপগুলি তাৎক্ষনিকভাবে সৃষ্ট। চরিত্রের মধ্যকার সংলাপের আদান-প্রদানে গদ্য সংলাপগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২। সংলাপাত্মক অভিনয়-গীত : এর দ্বারা চরিত্রগুলি সংলাপের কথাগুলি গানের আকারে পরিবেশন করেন। দোহার দল বাদ্যযন্ত্র সহকারে গানের ধুয়া ধরে চরিত্রের সাথে গেয়ে যাওয়া সংলাপের গানের কথাগুলি পুনরায় গেয়ে যান। কখনও কখনও এই সংলাপাত্মক গীতের সাথে ছুকরী নাচও চলতে থাকে।

৩। সংলাপাত্মক অভিনয়-কাব্য : এর দ্বারা চরিত্র তাঁদের সংলাপগুলি কাব্য আকারে পরিবেশন করে থাকে। অভিনয়ের অংশটিও পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে। তবে সচরাচর সংলাপাত্মক কাব্যের ব্যবহার দেখা যায় না।

অভিনয়ের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত গানের মাধ্যমে দর্শকের কাছে অভিনয় পরিবেশনাগত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে গান শেষ করা হয়।

---

[৭৫] পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.১২. গম্ভীরা গান

বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ জেলায় 'গম্ভীরা গান' পরিবেশিত হতে দেখা যায়। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মালদহ জেলায়ও গম্ভীরা গানের পরিবেশনা লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত ও পরিবেশিত হয় বলে এদের উভয়েই (গম্ভীরা গান: নবাবগঞ্জ-বাংলাদেশ ও মালদহ-ভারত) দুটি ভিন্ন প্রকৃতির ও বৈশিষ্ট্যের।

গম্ভীরা গানের পটভূমি : বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে বাংলাদেশে গম্ভীরা গানের প্রসার ঘটে। দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে অভিবাসিত গম্ভীরা গানের কিছু অভিনেতারা 'শিব' চরিত্রের পরিবর্তন করে এবং চরজারী, পালা বান্দি এবং গানের মাধ্যমে সংবাদাদি পরিবেশনের অংশগুলি বাদ দিয়ে গম্ভীরা গান পরিবেশন করা শুরু করেন। যার ফলে দেশ বিভাগের পর থেকে গম্ভীরা গানে দুইজন পুরুষ অভিনেতা নানা-নাতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাংলার গ্রামীণ সমাজের একদিকে বয়োজেষ্ঠ্য সমাজ ও অপরদিকে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শোষিত মানুষের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছে। গম্ভীরা গানের মধ্যে এই দুইজন চরিত্র কখনও সমাজের বর্তমান অবস্থাকে নিয়ে তীক্ষ্ম সমালোচনাও করে থাকে। যদিও পাকিস্তান শাসনামলে গম্ভীরা গানের কঠোর সমালোচনা মূলক বৈশিষ্ট্যের জন্য বহুবার গম্ভীরা গানের অভিনয়কে দমন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পরই দেশব্যাপী গম্ভীরা গানের দারুণ জনপ্রিয়তার কারণে বাংলাদেশ সরকার নব উদ্দিপনায় গম্ভীরা গান পরিবেশনার পৃষ্ঠপোষকতা দান করে।

গম্ভীরা গানের আসর লেখচিত্র নং ৮

গম্ভীরার পৃষ্ঠপোষকতা ও বাহ্যিক অবকাঠামো : বর্তমানে গম্ভীরা গান সারা বছর ধরেই বিভিন্ন ধরনের উৎসবাদিতে, মেলায়, এমনকি জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিদের সম্মানার্থে আয়োজিত সান্ধ্য ভোজোৎসবেও পরিবেশিত হতে দেখা যায়।[৭৬] এছাড়াও দিনের যে কোন ভাগে অর্থাৎ সকাল, দুপুর, বিকেলের যে কোন সময়ে গম্ভীরা গানের অভিনয় পরিবেশন করা যায়। পরিবেশনা সাধারণত তিন ঘন্টা বা কখনও কখনও তার কম সময়ের জন্যও হয়ে থাকে। এর অভিনয় স্থান সাধারণত দর্শক সারির বিপরীতে (সামনের দিকে) প্রসেনিয়াম মঞ্চে বা উঁচু যে কোন বেদিতে হয়ে থাকে (লেখচিত্র নং ৮)। অভিনয় মঞ্চের পেছন দিকে এর গ্রীনরুম বা সাজ ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। গম্ভীরা গানে বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে হারমোনিয়াম, তবলা-বায়া, মন্দিরা, খঞ্জরী এবং দোতারার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। অভিনয় মঞ্চের মধ্যে পাঁচ থেকে তিনজনের একটি দোহার দল বাদ্যযন্ত্র সহকারে দর্শকের মুখোমুখি হয়ে অর্ধবৃত্তাকারে আসন গ্রহণ করে।

গম্ভীরার অনুষ্ঠান কাঠামো ও পোশাক : নানা ও নাতির দ্বারা পরিবেশিত গানগুলি পূর্ব থেকেই কয়েকটি পরিবর্তিত সুরে তৈরী করা হয়। গানের পাশাপাশি তাঁদের দুইজনের নাচের মধ্যে গানের ছন্দে নাচের কিছু নির্দিষ্ট মুদ্রা এবং ঢং ব্যবহার করে থাকে। তাঁদের নাচের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, দর্শকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য কোন ভাড়ামির চেষ্টা না করা। গম্ভীরা গানে গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত কোন পোশাক না থাকলেও নানা-নাতি আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পোশাক ব্যবহার করে থাকে, যেমন- নানা; লুঙ্গি, এর সাথে ছেড়া বা তালি দেয়া হাফ হাতার সাদা গেঞ্জি, মাথায় মাথাল (গ্রামে রোদ-বৃষ্টি বা ঝরে চলাচলে বা ক্ষেতে ক্ষামারে কাজের জন্য কৃষকদের মাথায় পরিধেয় বাঁশের বা হোগল পাতার তৈরী আচ্ছাদন বিশেষ) ব্যবহার করে থাকে। এর সাথে হাতে একটি ছোট্ট লাঠি থাকে এবং কখনও কখনও কাধে লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে নানা গানের আসরে প্রবেশ করে থাকে। আর নাতি হাটু পর্যন্ত লম্বা ঢিলা হাফ প্যান্ট অথবা লুঙ্গি ও ছেড়া ফতুয়া পরে থাকে। এছাড়াও উভয় চরিত্রের পায়েই ঘুঙুর ও কোমড়ে গামছা বাধা থাকে। তবে কখনও কখনও নাতির হাতে হুক্কা ও কোমড়ে গামছার এক প্রান্তে কিছু রুটি ও গুড় বাধা থাকে।

সাজসজ্জা : সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে 'নানা'র সাধারণত লম্বা দাড়ি ও বিশাল ভুড়ি থাকে। আর নাতির ক্ষেত্রে পাতলা গড়নের দেহ, দেখতে ছিমছাম এবং একটু বোকা প্রকৃতির হয়ে থাকে। যন্ত্রীদলের বাদ্য সহকারে গায়কদলের সাথে বন্দনা পরিবেশনার সময় নাতি বন্দনা গানের সাথে নৃত্যও পরিবেশন করে থাকে। গম্ভীরা গানের বন্দনার গানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তাহল; গম্ভীরা গানের বন্দনা পুরোপুরিই সকল প্রকার ধর্ম-ভক্তি-ভাব বিবর্জিত।[৭৭]

---

[৭৬] আব্দুল ওহাব সরকার, বাংলাদেশের লোকগীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৯

[৭৭] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka, 2000, Pg. 300

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ স্বরূপ নীচে গম্ভীরাগানের বন্দনার কিয়দংশ উদ্বৃত করা হল :

ওরে ভাই কোন বা দ্যাশে আছিরে,
বাঘে ধান খায়, কুত্তায় ঘিওর যায়,
জান-মান আমার গ্যাছেরে॥
একাত্তরে যুদ্ধ হইল, হইল স্বাধীন দ্যাশ।
সামরিক জান্তা আইসা মারলো গণতন্ত্রের প্যাঁচ॥
আর,
স্বৈরাচারের দুঃশাসনে কেবল
আমরা নাকাল রইছিরে॥
শুধু আমরা নাকাল রইছিরে॥[৭৮]

অভিনয় উপস্থাপনা : বন্দনাপর্ব শেষ হওয়ার ঠিক পরপরই নানা বেশ তর্জন-গর্জন করে রাগান্বিত অবস্থায় নাতির খোঁজ করতে করতে অভিনয় আসরে প্রবেশ করে। নাতিকে দেখা মাত্রই কোন দেরী না করে নানা নাতির উপরে তাঁর হাতের লাঠির সদ্ব্যবহার করে। এরপরে 'নানা' দর্শকদেরকে নাতির একগুয়েমির কথা বলতে থাকে, যেমন- ক্ষেতে যাবার কথা বলে চালাকী করে ক্ষেতে না গিয়ে এই এখানে (অভিনয় আসর দেখিয়ে) এসে বসে আছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'জনার মধ্যে ঝগড়া বাধে যা দর্শকের জন্য প্রচুর আনন্দদায়ক ও হাস্য রসের সঞ্চার করে। শেষে নাতি নানাকে শান্ত করে এবং একটি প্রসঙ্গ তুলে ঘটনার দিক পরিবর্তন করে প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার দ্বারা 'নানা'কে অস্থির করে তোলে। 'নানা' বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা ও তার কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকে। 'নানা' যখন নির্দিষ্ট বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে তখন দর্শকদেরকে আনন্দদানের জন্য নাতি 'নানা'কে বারংবার বোকার মতো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকে। অপরদিকে 'নানা' তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা (তাৎক্ষনিকভাবে সৃষ্ট) জ্ঞান ও বোধশক্তির আলোকে কখনও গীতের দ্বারা আবার কখনও গদ্য বর্ণনের দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকে। সমসাময়িক কালের সামাজিক জীবনের এক বা একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গম্ভীরা গানের অভিনয় পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এসকল বিষয়ের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমোবৃদ্ধি, সন্তানদেরকে স্কুল-কলেজে ভর্তি করানোর সমস্যা, সরকারী হাসপাতাল-ক্লিনিকে চিকিৎসা সুবিধার অব্যবস্থাপনা, দূর্নীতি, কালো বাজারী, অপরাধ প্রবণতা, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, রাজনীতি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গম্ভীরা গানের অভিনয় উপাদান সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো :

১) সংলাপাত্মক অভিনয়-গীত : দোহার দল গানের ধূয়া ধরে ও বাদ্যযন্ত্রী দলের পরিবেশিত বাদ্যযোগে নানা-নাতি গানের মাধ্যমে তাঁদের সংলাপের আদান-প্রদান করে থাকে। গীত অংশগুলিতে সমাজের বর্তমান অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকে। এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ দুটি গানের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে-

ক) ও দাদা কি যে যন্ত্রনা আমার সহ্য করতে হয়
বড় পরিবার সে যে তারই বড় কারণ হয়
এইনা কষ্টেরও জ্বালায় আমার বুঝি মরণ হয়
শরীলটা বুঝি তাই আমার কোন শান্তি মনে লয়, দাদারে।...॥[৭৯]

খ) শুন বাঙালী গান্ধা তোদের
নাই বাংলার উন্নতি
টেরী কেটে চশমা এঁটে
সেজে ছিল লবাব নাতি।
তোরাই দেশের রাজা ছিলি
বিলাসিতায় হারিয়ে দিলি
সালাম গিরি চাকরী পেলি
হায় কি তোদের দুর্গতি।[৮০]

---

[৭৮] তথ্য দাতা : সাইদুর রহমান, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত
[৭৯] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

গম্ভীরা গানের উপরের এই গানগুলি পূর্বরচিত। দর্শকের সামনে গানগুলি পরিবেশনার সময় নানা-নাতি দুজনেই গানের কপিগুলি (কাগজে লেখা গানের লাইন) হাতে রাখেন। গানের মধ্যে দোহার দলের ধুয়া পরিবেশনের সময় এই নানা-নাতি জুটি সাধারণ নৃত্য পরিবেশন করেন।

২) সংলাপাত্মক অভিনয় গদ্য : নানা-নাতি গীতের মাধ্যমে সংলাপ আদান-প্রদানের পাশাপাশি গদ্য সংলাপেরও ব্যবহার করে থাকে। গীত অংশের অভিনয়ে সামাজিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সময় নানা-নাতি গদ্য সংলাপের দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন মন্তব্য, সমালোচনা ও মতামত প্রকাশ করে থাকে।

সবশেষে নানা, নাতির প্রতি উপদেশ বাণী (সবার একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করা, প্রত্যেকের নিজের কাজ ও নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা, সমাজে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সদ্ভাবের দ্বারা শান্তি ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি) প্রদান করে গম্ভীরা গানের অভিনয় শেষ করে।

নানা-নাতির উপস্থাপিত অভিনয় একেবারেই প্রক্ষিপ্তভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপিত নানারকম বিষয় সম্পর্কের অবতারনার দ্বারা অভিনয় করা হয় বলে এই গানের মধ্যে Improvised Acting এর জায়গা প্রচুর। তাই বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণায় প্রায়শই গম্ভীরা গানের পরিবেশনাকে বিভিন্ন জায়গার হাটে, মাঠে ছাড়াও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেও দেখানো হয়ে থাকে।

৩.২.১৩. যোগীর গান

বাংলাদেশের উত্তরে নাটোর অঞ্চলে 'যোগীর গান' নামে একটি নাট্যরীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যোগীর গানে যিনি যোগীর চরিত্রে কাজ করেন তিনিই হলেন এই গানের মূল গায়েন। যোগীর গানে পর্যায়ক্রমে আসরের প্রবেশকারী চরিত্রগুলি হল : ক) যোগী, খ) ভর্তৃদাস, গ) যোগিনী, ঘ) সামদাস। এক্ষেত্রে যোগীর গানের যোগী হলেন আকবর কবিরাজ, বয়স ৪৫ বৎসর, পেশা কৃষিজীবী, ঠিকানা-দীঘাপতিয়া, নাটোর, ধর্ম ইসলাম। পূর্বে যিনি এই চরিত্রে কাজ করতেন তিনি হলেন ভেলু কবিরাজ। ভর্তৃদাস চরিত্রে; শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বয়স ৬৩ বছর, পেশা মৎস্যজীবী, ঠিকানা : দীঘাপতিয়া, নাটোর। ধর্ম হিন্দু। বাংলা ১৩৬৭ সাল থেকে তিনি এই চরিত্রে যোগীর গান গেয়ে এসেছেন বলে জানা যায়। যোগিনীর চরিত্রে; দুলাল সোনার (পদবী), বয়স ৩৩ বছর, পেশা কৃষিকাজ, আগে এই চরিত্রে কাজ করতেন ইদু কবিরাজ, বয়স ৪৫, পেশা-কৃষিজীবী, উভয়ের ধর্ম ইসলাম। আর সামদাস চরিত্রে; আনিস সোনার (পদবী), বয়স ৩৫, পেশা-কৃষিজীবী, পূর্বে এই চরিত্রে কাজ করতেন দলের দলনেতা শ্রীমনোহর হালদার, তারও আগে গাইতেন বল্লক দাস, উভয়েই ধর্মে হিন্দু। যোগীর গানে বাইন (ঢোল বাদক); হযরত কবিরাজ, বয়স ৪৫, পেশা-দিনমজুর ('স'-মিলে কাজ করেন), ঠিকানা মাছপাড়া, দীঘাপতিয়া, নাটোর। জুড়ি- অনুপকুমার ঘোষ, বয়স ৫০ বছর, পেশা-ধানচালের ব্যবসা। ঝাঁঝ-ইদু কবিরাজ, পেশা-কৃষিজীবী। পাইল সিদু কবিরাজ, বয়স ৫০ (প্রায়), পেশা- কৃষিজীবী, আলাল পোরামানিক, বয়স ৩৫, পেশা-বাসের হেলপার, ধর্ম-ইসলাম। সুবেন্দু মণ্ডল, বয়স ৩৫, পেশা-মৎস্যজীবী, হিন্দু। এদের মধ্যে হিন্দু ধর্মালম্বীরা সবাই বৈষ্ণব ধর্মের উপাসক। যোগীর গানে পর্যায়ক্রমে সামনের দিকে মূলগায়েনের ওস্তাদ ও তদ্‌ওস্তাদের নাম দেয়া হল: আকবর কবিরাজ>ওস্তাদ পঞ্চানন মণ্ডল>ওস্তাদ বিষ্ণুপদ মণ্ডল>ওস্তাদ কছীর গায়েন (চকের ডাঙ্গা, দীঘাপতিয়া)> ওস্তাদ হামেদ আলী (চকের ডাঙ্গা, দীঘাপতিয়া)।[৮১]

যোগীরগান, চিত্র নং ১৮

[৮০] শামসুজ্জামান খান ও ডঃ মোমেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলনঃ ৫৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৬১-৬২

[৮১] সাক্ষাৎকার গ্রহণ: পঞ্চানন মণ্ডল ও দুষ্টু মণ্ডল, দীঘাপতিয়া, নাটোর, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষকতা : বিশেষ করে অবসর সময়ে শীতের দিনে অথবা যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা লৌকিক উৎসব উপলক্ষে এই গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। সম্মিলিতভাবে বা সমষ্টিগত উদ্যোগে ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে এই গানের আয়োজন করা হয়। তবে হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রধান্যতায় যোগীর গান আজও টিকে আছে বলে জানা যায়।

দর্শক : যোগীর গানের দর্শক হিসেবে নারী পুরুষ, শিশু কিশোর বৃদ্ধ সবাই একযোগে এই গান উপভোগ করে থাকে। ধর্মের দিক থেকেও হিন্দু মুসলমান বলে কোন পার্থক্য থাকে না।

যোগী-শিব এবং যোগিনী-দূর্গা রথে চড়ে মর্তে এসে মূর্খদের জ্ঞান দান করেন -এ বিশ্বাস নিয়ে মূলত দেহতত্ত্ব মূলক কায়া বা শরীর বৃত্তীয় তত্ত্বকথা শোনানো এই গানের উদ্দেশ্য। গানের বিষয় হিসেবে ক) জন্ম ভেদ, খ) দেহভেদ, গ) চন্দ্র ভেদ, ঘ) দেরাক নামার ভেদ, ঙ) ফকির ভেদ, চ) গুরুভেদ ইত্যাদি প্রধান।

গানের আসর : যে কোন সমতল ভূমিতে সাড়ে পাঁচ হাত বা সাড়ে তিন হাত পাটি মাটিতে বিছিয়ে তার উপরে সবাই গোল হয়ে বসে এই গান পরিবেশন করে থাকে। আসরের চতুর্দিক থেকে তিন হাত করে জায়গা বাদ দিয়ে দর্শকবৃন্দ আসরকে ঘিরে বসে থাকে (চিত্র নং ১৮)। আসরের উপরের দিকে সাময়িকভাবে চারকোণে চারটি খুটির দ্বারা সামিয়ানা টাঙানো হয়। আসরের মধ্যে যোগী, যোগিনী, সামদাস এবং ভর্তৃদাস ব্যতীত অন্যদের সবাই (পাইল দোহার ও যন্ত্রীদল) গোল হয়ে আসরের মধ্যের পাটির উপরে অবস্থান করে।

যোগীরগান, চিত্র নং ১৯

প্রবেশ-প্রস্থান : গান শুরু হলে যোগী ও ভর্তৃদাস গান গেয়ে গেয়ে আসরের দিকে এগুতে থাকে। আসরে প্রবেশ করে তারা আসরের মধ্যে গোল হয়ে বসা যন্ত্রীদল ও পাইল দোহারদেরকে কেন্দ্র করে তাঁদের চারপার্শ্বে ঘুরে ঘুরে গান পরিবেশন করে থাকে। গানের দ্বিতীয়ার্ধে যোগিনী সামদাসকে নিয়ে ঠিক একইভাবে সাজ ঘর থেকে তাঁর স্বামীকে খোঁজার গান গেয়ে গেয়ে আসরের দিকে অগ্রসর হয় এবং আসরে ঢুকে পাইল দোহারদেরকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঘুরে তাঁদের গান পরিবেশন করে থাকে। আসর থেকে সাজ ঘরের দূরত্ব প্রায় ১০-১২ হাত হয়ে থাকে। তবে এখানে যে ব্যাপারটি উল্লেখ্য তাহলো, এখানে সাজ ঘরের জন্য আলাদা কোন ঘরের ব্যবহার করা হয় না। আসর থেকে একটু দূরে কোন আড়াল থেকে তারা রূপসজ্জার কাজ সেরে নেয়। আর যেখানে আড়াল পাওয়া যায় না সেখানে আসর থেকে একটু দূরে একটি চাঁদর টাঙিয়ে দর্শকদের থেকে নিজেদেরকে আড়াল করে সাজ ঘরের কাজ করে থাকে। যোগীর গানে চরিত্রদের প্রবেশ-প্রস্থানে যে ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য তাহল, এর অভিনয়ে চরিত্রদের প্রবেশ আছে কিন্তু কোন প্রস্থান নেই।

সাজসজ্জা : যোগীর মাথায় বরের টোপর থাকে। কপালে চন্দনের ফোটা দিয়ে তিলক বা ত্রিশুল আঁকা এবং তা নাক পর্যন্ত নামানো থাকে। যোগীর বেশ অনেকটা বৈরাগীর মতোই গলায় রুদ্রাক্ষীর মালা, গায়ে নগুন বা পইতা, গায়ে বত্রিশ অক্ষর নামাবলী চাদর জড়ানো, ডানহাতে ষোল নামা (মালা বিশেষ) এবং বামহাতে অগ্নি স্বাক্ষীরূপে জলন্ত মশাল থাকে। মশালটি কাঁচা বাশ, কেরোসিন ও পাট দিয়ে তৈরী। আর ভর্তৃদাসের মাথায় কপালের উপরে সামনের দিকে পেঁচানো গিঢ় দেয়া থাকে। এটাকে বৃন্দাবনী চূড়ার প্রতীক বলে মনে করা হয়। অলংকার হিসেবে পুথির মালা এই চূড়ার সাথে পেঁচানো থাকে। দর্শকের সামনে নিজেকে কিম্ভুতকিমাকার রূপে উপস্থিত করার জন্য চোখের নীচে-চোয়ালে, মুখের থুতনীতে গাঢ় করে জিংক অক্সাইড ও সিদুরের মিশ্রণের ছাপ লাগানো থাকে। আর সাড়া শরীরে জিংক অক্সাইডের গোল গোল ছাপের মধ্যে হাজার পাওয়ারের লাল রঙের ছাপ লাগানো থাকে (চিত্র নং ১৯)। সমস্ত শরীরে কুষ্ঠরোগের চিহ্ন হিসেবে ভর্তৃদাসের এইরূপ সাজ। রোগে বাম হাত অবশ হয়েছে বলে গানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভর্তৃদাসের বাম হাতটি তাঁর বুকের সাথে ভাঁজ করে লাগিয়ে রাখে। যোগিনীর মাথাতেও যোগীর মতোই টোপর থাকে। যোগিনীর সাজ অনেকটা কনে সাজের মতোই পড়নে নতুন চকচকে লাল শাড়ী পড়ে, মাথার উপরে কাপড় দিয়ে ঘোমটা টানা, হাতে নতুন চুরি, গলায় স্বর্ণের লকেটসহ চেইন ও পাতার মত উজ্জ্বল ধাতব মালা, কপালে-চিবুকে লাল ও সাদা ফোটা কেটে নকশা করা, বাম গালে একটি কালো তিল এবং ডান হাতের কব্জিতে লাল কালির বন্ধনী ও পায়ে আলতা মাখানো থাকে। সামদাসের সাজ-সজ্জা একেবারে ভর্তৃদাসের মতোই। যোগীর গানের সমস্ত অংশটুকুই এই

Dhaka University Institutional Repository

চারজন চরিত্র দ্বারা অভিনীত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে। বাদ্যযন্ত্রীদল ও পাইল দোহারদের জন্য বিশেষ কোন পোশাকের ব্যবহার নেই। গান পরিবেশনের সময় প্রত্যেকেই সাধারণ নিত্যব্যবহার্য পোশাক পরিধান করে থাকে। গানের দলে কোন ছুকরী নেই, সমস্ত কলাকুশলীরাই পুরুষ। এদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট কয়েকজনের যে কেউ প্রয়োজন মতো মহিলা সেজে যোগিনীর চরিত্রে অভিনয় করে থাকে।

অনুষ্ঠান কাঠামো : যোগীর গানের সমস্ত অভিনয় মূলত দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমার্ধে যোগী ও যোগিনীর বিয়ের রাতে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। দৈব আদেশ থাকে যে, উভয়েরই ১২ বছর যোগী-যোগিনী রূপে কাটানোর পরেই তাঁদের মিলন ঘটবে। ফলস্বরূপ যোগীর সহচর রূপে ভর্তৃদাস (মূর্খ চরিত্রের) কোন কাহিনী ছাড়াই পথপরিক্রমায় বিভিন্ন পর্যায়ে দেহতত্ত্বমূলক আলোচনা করে যার ভেতরে মানুষের জন্ম মৃত্যু রহস্য, ঋতুভেদ, শরীর ভেদ ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। গানের দ্বিতীয় পর্যায়ে যোগীর সাথে যোগিনীর পথে দেখা হয়। উভয়ের বিভিন্ন প্রশ্ন বান ও উত্তর দানের মধ্য দিয়ে তাদের মিলন হয়। কাহিনী বিহীন যোগীর গানে যোগী ও ভর্তৃদাসের পথ চলতে চলতে যে সব ঘটনার জন্ম দেয় তার সবগুলি মিলিয়েই যেন একটি পরিপূর্ণ কাহিনী দাঁড়িয়ে যায়। অথচ তাঁদের অভিনয়ের পুরোটাই তাৎক্ষণিকভাবে প্রক্ষিপ্ত। যোগী-ভর্তৃদাসের হাস্যরসাত্মক বোধ ও উপস্থিত অভিনয়ের ক্ষমতা যোগীর গানকে কাহিনী ছাড়াই জনপ্রিয় করে রেখেছে। 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালাগানের সাথে 'যোগীর গানে'র অভিনয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ জায়গাটুকু হল-প্রক্ষিপ্ত অভিনয় অংশ। পালাগানে মূল গায়েনের বর্ণনাত্মক বা সংলাপাত্মক প্রভৃতির জায়গাগুলি যেমন তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট ঠিক তেমনি যোগীর গানের এই অংশটুকুও তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট বলেই আমাদের কাছে তা ঘটনা বহুল হয়ে ধরা দেয়।

গান শুরুর আগে দল প্রধান শ্রীমনোহর হালদার সাধারণ পোশাকে আসরের মধ্যে বিছানো পাটির উপরে গিয়ে দাঁড়ান, কথা-বার্তা বলেন, চাঁদর কাপড় ঠিক করেন। ঠিক এই মুহূর্তে সবার চোখ এড়িয়ে দলপতি (শ্রীমনোহর হালদার) মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে বাইরে থেকে যাদু, টোনা, বান ইত্যাদি থেকে রক্ষার জন্য মনে মনে মন্ত্র পাঠ করে নিজেদেরকে বেঁধে নেন। তাঁরা মনে করেন বান মারলে হয়ত গান গাইতে গাইতে গলা থেকে রক্ত পড়তে পারে, হঠাৎ যবান বন্ধ হয়ে যেতে পারে, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে ইত্যাদি। এরপরে তাঁরা পাটির উপর গোল হয়ে বসে খোল মন্দিরাসহ তাঁদের বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাতে (টিউন) থাকে। তাঁদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে খোল, জুড়ি, ঝাঝ/করতাল ব্যবহারই বেশি হয়ে থাকে। মোট তিন জন বাদ্যযন্ত্র বাদনের কাজ করে থাকে। যখন তাঁরা মনে করেন যে, আসরের সমস্ত দর্শকের মনযোগ তাঁদের উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং গান পরিবেশনের জন্য নিজেরাও তৈরী তখন তারা আসর বন্দনার গান শুরু করে থাকে। নীচে তাঁদের পরিবেশিত আসর বন্দনার গান উদ্ধৃত করা হল :

মা তুমি স্বরস্বতী, মা তোমার রাঙা পদে,
মা তোমার চরণপদে, মা তুমি স্বরস্বতী।
তোমারও চরণপদে, তোমারও যুগল পদে,
বুম বুম ভগবতী, ডাইনে লক্ষ্মী স্বরস্বতী।
ওমা দয়া করে এসো মোর আসরে॥
এহোতো ফাল্গুনও মাসে, রাম যাবে বনবাসে,
তোমায় আমায় নিয়ে যাবে পাতালে।
ওমা দয়া করে এসো মোর আসরে ॥

স্বরস্বতী বিদ্যার দেবী বলে আসর বন্দনায় তাঁকে ডাকা হয়েছে।

দল গঠনের দিক থেকে মূল গায়েন দলের প্রধান নন্। দলনেতা দলের প্রধান। তবে দলনেতা মূল গায়েন হলে, গান পরিবেশনের সময় পালাগান ছোট বা বড় করবে তাঁর সিদ্ধান্ত তিনিই নিয়ে থাকেন। কিন্তু এ গানে মূল গায়েন আকবর কবিরাজ নতুন তাই গান পরিবেশনার সময়ে দুষ্টু মণ্ডল বিভিন্ন ইংগিত ও কথার দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এবং বেশিরভাগ গানই (যেগুলি যোগীর চরিত্রের মূলগায়েনের ধরার কথা) ভর্তৃদাস (দুষ্টু মণ্ডল) ধরে সাহায্য করেছিলেন।

যোগীর গানের অভিনয় পরিবেশনা : গানের শুরুতে আসর বন্দনার পরেই সাজঘর হতে যোগী ও ভর্তৃদাস গান গাইতে গাইতে বের হয়ে আসরের দিকে আসতে থাকে। ভর্তৃদাসও যোগীর পেছনে পেছনে লুকিয়ে আসরের দিকে আসতে থাকে। তারা গানের এক চরণ গেয়ে দুই কদম সামনে এগোয় তারপর ঐ চরণ পাইল দোহারেরা পুনরায় গেয়ে থাকে। এসময় যোগী ও ভর্তৃদাস দাঁড়িয়ে থাকে। এইভাবে প্রথমে যোগী ও পরে ভর্তৃদাস আসরে প্রবেশ করে থাকে। আসরে প্রবেশ করে গায়েন আসরে গোল হয়ে বসা পাইল দোহারদেরকে একবার অর্ধ পরিক্রমণ করে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিসহ মুখ দিয়ে অদ্ভুত রকমের শব্দ করতে করতে যোগী অর্থাৎ গায়েনের সামনে এসে দাঁড়ায়। দুজনের মধ্যে সংলাপাত্মক

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয় শুরু হয়। সংলাপের আদান প্রদানের সময় যোগী ও ভর্তৃদাস আসরের মধ্যস্থানে গোল হয়ে বসা পাইল দোহারদেরকে ঘিরে পরিক্রমণ করতে থাকে এবং সংলাপের সময় যোগী তাঁর ডান হাত, নাক ও চোখ-মুখ (ভঙ্গী) বেশি ব্যবহার করে থাকে। ভর্তৃদাসের বাম হাত কুষ্ঠ রোগে অবশ হওয়ায় তাঁর বাম হাত ব্যতীত সে অভিনয়ে সম্পূর্ণ শরীরকে বেশি কাজে লাগায়। এই গানের মধ্যে বর্ণনাত্মক গানের অংশের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের বর্ণনাত্মক গানগুলি পরিবেশনের সময় গানের ছন্দের সাথে পায়ে তাল রেখে আসরের মধ্যস্থিত পাইল-দোহারদেরকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরতে ঘুরতে সামান্য পরিমাণে যে সুন্দর পদবিক্ষেপ করে থাকে সেগুলিকে নিম্নোক্ত লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। যদি বাম 'পা'কে (১) ও ডান 'পা'কে (২) ধরি তাহলে তাঁদের গান পরিবেশনের সময় যে পদবিক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় সেগুলি নিম্নরূপ-

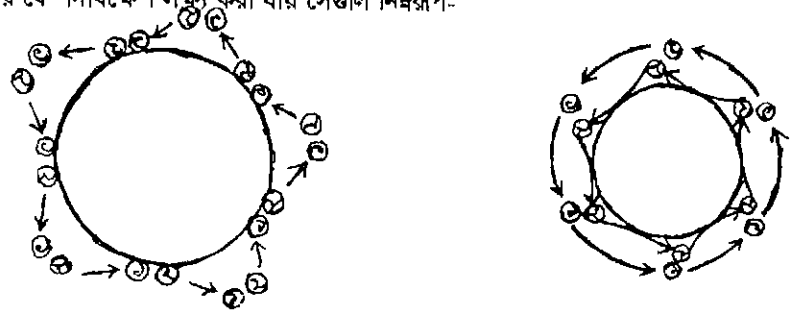

ঠিক একইভাবে প্রতি গানের সময় যোগী এবং ভর্তৃদাস যোগীর গানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এভাবেই পরিবেশিত গানের তালে তালে পদবিক্ষেপের দ্বারা সামান্য নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

যোগী ও ভর্তৃদাসের মতো যোগিনী ও সামদাস আসরে প্রবেশ করে একইরকমভাবে গানের তালে তালে পা পেলে আসরকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণ করতে থাকে। যোগিনী আসরে ঢোকার সময় ভর্তৃদাস যোগিনীর কাছে গিয়ে হাত, গাল স্পর্শ করে দেখতে থাকলে সামদাস তাঁর হাতের বাশের চাটাই দিয়ে ভর্তৃদাসকে আঘাত করার চেষ্টা করে। জোরে বাশের আঘাতে ঠাস্ করে শব্দ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে শরীরের যে অংশে চাটাইয়ের আঘাত লাগে শরীরের সে অংশটা হাত দিয়ে ডলতে ডলতে নানা রকম কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গিমা করে আবার বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে পূর্ব চিত্র মতো পা ফেলার সাথে সাথে কোমড় দুলিয়ে যোগিনীর দিকে এগুতে থাকে (চিত্র নং ১৯)। এভাবে ভর্তৃদাস তাঁর অভিনেয় অংশগুলি খুবই হাস্যরসময় করে তোলে।

অভিনয় চলাকালীন সময়ে পাটির উপরে গোল হয়ে বসে থাকা পাইল দোহারেরাও মাঝে মধ্যে নাট্যক্রিয়ায় অংশ নেয়। যেমন- ভর্তৃদাসের মালা জপা হয়ে গেলে যোগী ভর্তৃদাসকে নিয়ে বৃন্দাবন চলে যেতে চায়। কিন্তু ভর্তৃদাস বৃন্দাবন যাবার আগে তাঁর নগরবাসীর সাথে বুসপুট্ (বোঝাপড়া/পরামর্শ) করে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। যোগী অনুমতি দেয়। ভর্তৃদাস চলে যায় তাঁর নগরবাসীর কাছে। নগরবাসীর কাছে যেতে ভর্তৃদাস যোগীর কাছ থেকে বৃত্তাকারে বসা পাইল দোহারদেরকে কেন্দ্র করে অর্ধবৃত্তাকারে একটি পরিক্রমা শেষ করে। এক পরিক্রমণ শেষ করার মুহূর্তে ভর্তৃদাস যেইমাত্র "এ ভাই নগরবাসী" বলে হাক ছাড়ে, অমনি ঢোলে খুব দ্রুত লয়ে তেহাই দেয়া হয়ে থাকে এবং পাইল দোহারেরা নগরবাসী হয়ে ভর্তৃদাসের ডাকে সাড়া দেয়। নগরবাসীদের কাছে ভর্তৃদাসের না পৌঁছানো পর্যন্ত ঢোলের তেহাই পড়তে থাকে। এখানে যে ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য তাহল; পাইল দোহারেরা সামান্য পরিমাণে সংলাপাত্মক ক্রিয়ায় অংশ নিলেও তারা কখনওই তাঁদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান না বা আসন ত্যাগ করেন না। গানের মধ্যে স্থান পরিবর্তনে পরিক্রমণ রীতি ও ঢোলের দ্রুতলয়ে তেহাইয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই দর্শকের কাছে অভিনয় দৃশ্যের স্থানিক পরিবর্তন যেমনি প্রকাশ পায় তেমনি তা দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যও হয়ে ওঠে। সংলাপের দ্বারা মাঝে মধ্যে অভিনয়ে অংশগ্রহণ ছাড়াও গানে পাইল ধরা দোহারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গায়েনের সাথে দোহারেরা যদি ঠিকমত পাইল ধরতে না পারে তাহলে সেই গান কখনওই পরিবেশনযোগ্য হয় না। তাই পাইল দোহারেরা যাতে গায়েনের গানের সাথে ঠিকমত পাইল ধরতে পারে সেজন্য কখনও কখনও গায়েনের গানের একটি চরণ গাওয়ার পরে ঢোলে তেহাই বা ঠ্যাকা তেহাই (ডুম্ ডুম্ ডুম্) দেয়ার পর পাইল দোহারেরা গানের পাইল ধরে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নীচে পাইল ধরার বিবরণটুকু লক্ষ্য করা যেতে পারে-

"ওরে ভোলা মন, চল যাই শ্রীবৃন্দাবন ॥"

এই অংশটুকু মূল গায়েন গাওয়ার পরে ঢোলে তেহাই দেয়া হয়। তারপরে পাইল দোহারেরা পাইল বা ধুয়া ধরে ঐ গানের চরণের পুনরাবৃত্তি করে থাকে "চল যাই শ্রীবৃন্দাবন...॥" গানের ধুয়া ধরার 'কিউ' হিসেবে ঢোলের তেহাই একটি বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে আবার গান শেষ করার 'কিউ' হিসেবেও ঢোলের তেহাই বিশেষ ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন- গানের শেষের চরণ গাওয়ার সময় ঘন ঘন ঢোলের তেহাই ব্যবহার করা হয়, যার দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে গান শেষ হচ্ছে।

ঢোল ছাড়াও মূল গায়েন ইংগিতের দ্বারা গানের ধুয়া ধরার কিউ নির্ধারণ করে দেন। যেমন- ভর্তৃদাস ও যোগী একত্রে গাওয়া গানের অংশ,

বাপজান কপালমে ফৌটা, কপালমে ফৌটা
ফৌটা পরিয়া ভবে সার ॥
হায় হায় ফৌটা পরিয়া ভবে সার ॥ ধুয়া
গুরু দিয়াছে কপালমে ফৌটা বৃন্দাবন যাইবার॥
ওরে ভোলা মোন চল যাই শ্রীবৃন্দাবন॥ ধুয়া

ওপরের গানের প্রথম চরণ গাওয়ার পরে অন্তরার শেষে ভর্তৃদাস হাত দিয়ে পাইল-দোহারদের দিকে ইংগিত করে আবার কখনও দুই হাটু ভাঁজ করে শরীরকে নীচের দিকে দুলিয়ে দোহারদেরকে ধুয়া ধরার ইংগিত করে থাকে। ভর্তৃদাসের ইংগিত পেয়ে পাইল দোহারেরা ধুয়া ধরে।

যোগীর গানের প্রায় সমস্ত অংশ জুড়েই গদ্য সংলাপ ও বর্ণনাত্মক গীতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গানের মূল অভিনায়াংশের অভিনয় উপাদানগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল :

ক) সংলাপাত্মক অভিনয় গদ্য : গানের প্রথমদিকে যোগী ও ভর্তৃদাস আসরে ঢুকেই যোগীর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এসময় তাঁদের মধ্যে যে গদ্য সংলাপের আদান প্রদান হয়ে থাকে সেগুলি উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

(ভর্তৃদাস যোগীর পথ রোধ করে দাঁড়াবার পর)

যোগী : তুমি কে বাপু, রাস্তা বন্ধ করে আছো? রাস্তা ছাড়ো, আমি চলে যাবো।
ভর্তৃদাস : (ঘুরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে) রাস্তা ক্লিয়ার।
যোগী : কোন বিপদে পড়লাম। আসলাম একা।
ভর্তৃদাস : (হেসে হেসে হাত পা মেলে ধরে সামনে এগুতে এগুতে) আমিও একা।
যোগী : তুমি কে, বাড়ী কোথায়?
ভর্তৃদাস : (পাল্টা প্রশ্ন করে) তুমি কে?
যোগী : আমি যোগী বর। তোমার কেউ আছে?
ভর্তৃদাস : কেউ নেই।
যোগী : কেউ নেই- বাপ, মা, ভাই, বোন?
ভর্তৃদাস : কেউ নেই।
যোগী : তুমি আমার সাথে যাবে?
ভর্তৃদাস : যাবো।
যোগী : আমি গুরু-মন্তর দিলে তুমি গুরু মানবে?
ভর্তৃদাস : টেষ্ট করতে হবে।
এইভাবে যোগী ও ভর্তৃদাসের মধ্যে হাস্যরসাত্মক গদ্যসংলাপ চলতে থাকে।

খ) বর্ণনাত্মক অভিনয় কাব্য : এই গানের মধ্যে কাব্য-সংলাপের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যদিও তা খুবই সামান্য পরিমাণে। যেমন- যোগীর নিকট হতে ভর্তৃদাস গুরুমন্ত্র নিয়ে যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। যোগী ভর্তৃদাসকে হরিনাম দিয়ে নামের মালা জপতে বলে এবং পরোক্ষণেই যোগী ভর্তৃদাসকে মালা জপা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে ভর্তৃদাস তখন যে কাব্য সংলাপগুলি ব্যবহার করে তা নিম্নরূপ-

(যোগী ভর্তৃদাসকে মালা জপা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে)
ভর্তৃদাস : মালা কি জপে বাপুরে,
এই মালা জপলে হবে কী গুরুদেব, জপলে হবে কী?
মন মালা কাঠাল তলা,
পান্তা ভাত আইঠে কলা,

Dhaka University Institutional Repository

ছোটা ফোটা সব গিলে ফেলা।
এই বইলে ভাই জপরে মালা, জপরে মালা ॥

গ) বর্ণনাত্মক অভিনয় গীত : বর্ণনাত্মকগীতের অভিনয়ে ভর্তৃদাস যোগীকে প্রসঙ্গত যে সকল 'ভেদ' বিষয়ক প্রশ্ন করে থাকে যোগী ভর্তৃদাসের সেই সকল প্রশ্নের উত্তর গীতের মাধ্যমে বর্ণনা করে থাকে। এরকম গীতের পরিবেশনে যোগীর সাথে ভর্তৃদাসও গানের সাথে গলা মিলিয়ে সহযোগী গায়ক হিসেবে যোগীকে সাহায্য করে থাকে। নীচে জন্মভেদ এর বর্ণনাত্মকগীতের অংশটুকু উদ্ধৃত করা হল :

যোগীর গান শুরু হয়-
আ-রে শুন শুন শুন রে মন বারো ফুলের ক-অ-থা॥ (ধুয়া)
আহা-আ আর কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়।
ওরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করলে নারী ব্যাজার হয়রে॥ (ধুয়া)
আ-আর জষ্ঠি মাসে ফুল ফুটিলে, বাছা ফুলতে ভালো নয়।
আর আষাঢ় মাসে ফুল ফুটিলে, বাছা ফুলতো ভালো নয়।
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে বেশ্যা কুলে যায় রে॥ (ধুয়া)
আ-আর ভাদ্র মাসে ফুল ফুটিলে, ফুলতো ভালো হয়।
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে অশ্ব যোগ্য হয় রে॥ (ধুয়া)
আর আশ্বিনেতে ফুল ফুটিলে, ফুলতো ভালো হয়।
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে পইড়া পণ্ডিত হয় রে॥ (ধুয়া)
আ-আর কার্তিক মাসে ফুল ফুটিলে, বাছা ফুলতো ভালো নয়।
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলের যক্ষ্মা কাশ ও হয় রে॥ (ধুয়া)
আ-আর অগ্রাহায়ণ মাসে ফুল ফুটিলে, ফুলতো ভালো নয়।
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে অংকে কুড়ি হয় রে॥ (ধুয়া)
আ-আর পৌষ মাসে ফুল ফুটিলে, ফুলতো ভালো হয়।
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে জগতকথা কয় রে॥ (ধুয়া)
আ-আর মাঘ মাসে ফুল ফুটিলে, ফুলতো ভালো হয়।
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে মানবের লক্ষণ হয় রে॥ (ধুয়া)
আ-আর ফাল্গুন মাসে ফুল ফুটিলে, ফুলতো ভালো নয়।
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে দেখতে ভালো হয় রে॥ (ধুয়া)
আ-আর চৈত্র মাসে ফুল ফুটিলে, ফুলতো ভালো নয়।
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে চতুর্বেদী হয় রে॥ (ধুয়া)
ওরে ভোলা মন, শোন বারো ফুলের কথা॥

ধুয়া : ওরে ভোলা মন, শোন বারো ফুলের কথা॥
এছাড়াও পূর্বোক্ত গানে মূল গায়েন গানের চরণগুলি প্রথমে একবার গেয়ে যাবার পর পাইল-দোহারেরা ধুয়া হিসেবে মূল গায়েনের গেয়ে যাওয়া চরণের পুনরাবৃত্তি করে থাকে।

ঘ) সংলাপাত্মক অভিনয় কাব্য : আবার গানের মাঝে কোথাও কোথাও সংলাপাত্মক কাব্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন- গানের মধ্যে এক একটি পর্বের শুরুতে অর্থাৎ দেহ ভেদ, ঋতু ভেদ, জন্মভেদ ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে ভর্তৃদাস যখন যোগীর কাছে প্রশ্ন করে তখন এইসকল ভেদ সম্পর্কিত বর্ণনাত্মক গীতের শুরুতে ভর্তৃদাস ও যোগীর মধ্যে সংলাপাত্মক কাব্যের ব্যবহার দেখা যায়-

যোগী : তা সব বলতে পারলে তুমি যাবেতো হে বাপু?
ভর্তৃদাস : তা যাই না যাই সেইডা আমার মোন।
যোগী : তরে বইলা দি কান খুইলা শোন।

ঙ) সংলাপাত্মক অভিনয় গীত : গানের শেষের দিকে যোগী ও যোগিনীর পথিমধ্যে দেখা হলে দুজনই দুজনাকে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করে থাকে এবং তার উত্তরগুলিও তারা গানের মাধ্যমেই দিয়ে থাকে। যেমন- গানের মাধ্যমে যোগী যোগিনীর প্রশ্নোত্তরমূলক পর্ব-

Dhaka University Institutional Repository

যোগিনী : আবে ও-রে-এ (দীর্ঘ সুর),
যোগী হইয়াছো যোগ ধইরাছো গুনাহ্ কইরাছো ভবে সার ॥
মায়ের পেটে জন্ম নিয়া দুধ খাইয়াছো মার ॥
ধুয়া: ওরে ভোলা মন ভক্তিভবে করছি আমি এ জনমের ক-অ-থা
আবে ও-রে-এ (দীর্ঘ সুর),
কয় কড়িতে জপের মালা কয় কড়িতে জপ,
বুম বুম রাধা রুদ্রাক্ষীর মালা কাহার হাতে রাখ ॥
ধুয়া: ওরে ভোলা মন ভক্তিভবে করছি আমি এ জনমের ক-অ-থা

এভাবে গীতের মাধ্যমে যোগিনী যোগীকে যোগসাধনের উপরে আরও অনেক প্রশ্ন করে থাকে। যোগিনীর উপরোক্ত এই প্রশ্নের উত্তরে যোগী গীতের মাধ্যমে যে উত্তর দেয় তাঁর অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো :

যোগী : আবে ওরে,
দুই কড়েতে ধরিরে মালা তিন কড়েতে জপি।
ঘুমের আবেগ হলে মালা গুরুর গলায় রাখি॥

এইরূপে যোগী ও যোগিনীর মধ্যে সংলাপাত্মকগীতের আদান-প্রদানের দ্বারা সংলাপাত্মক অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সবশেষে যোগীর গানে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাহল, এই গানের অধিকাংশ কলাকুশলীরাই মুসলমান। তারা যোগী সেজে যোগীর ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে। "পদ্মাপুরাণ গান" এ তারা গানের শুরুতে ধর্মীয় কৃত্য হিসেবে ধূতি পড়ে মনসার ঘট সাজিয়ে পূজা করে। কপালে চন্দনের ফোঁটা আঁকে। সামাজিক ভাবে মুসলমান হয়েও গান পরিবেশনায় সাম্প্রদায়িক চেতনা তাঁদের জন্য কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। ধর্ম নিরপেক্ষতা, অহিংস নীতি এবং সাম্যবাদের একটি উল্লেখযোগ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত হল এই গানের কুশীলব এবং তাঁদের অভিনয়।

৩.২.১৪. আলকাপ গান

আলকাপ গানের অঞ্চল ও পৃষ্ঠপোষকতা : রাজশাহীর নবাবগঞ্জ জেলায় খুবই জনপ্রিয় নাট্যরীতি হিসেবে 'আলকাপ গান' অভিনীত হতে দেখা যায়। 'গম্ভীরা গানে'র মতো 'আলকাপ গান'ও ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত আনন্দ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বৃহত্তর রংপুর জেলার দক্ষিণাংশে 'আলকাপ গানে'র অভিনয় প্রদর্শিত হয়ে থাকে। সাধারণত দূর্গাপূজা-কালী-পূজা-লক্ষ্মীপূজা-স্বরস্বতী পূজা এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবাদিতে 'আলকাপ গানে'র আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান; যেমন- বিয়ে, অন্নপ্রাসন (হিন্দু রীতিতে শিশু-বাচ্চাকে প্রথম মুখে ভাত খাওয়ানো) ইত্যাদি সামাজিক আচার পালনে নিছক আনন্দ বিনোদনের জন্য 'আলকাপ গানে'র আয়োজন করা হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সামাজিক আচার-নিয়ম পালনে সুস্থভাবে জীবনযাপনের আশায় নিজস্ব উদ্যোগে 'আলকাপ গানে'র আয়োজন করে থাকে। আবার ধর্মীয় উৎসবে 'আলকাপ গান' আয়োজনে পূজা উদ্‌যাপন কমিটি বা হিন্দুদের মধ্যে প্রভাবশালী কোন বিশেষ ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা দান করে থাকে। 'আলকাপ গানে'র কলা-কুশলীরা ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের। তাঁদের কেউ কেউ পেশায় কৃষক, আবার কেউ বা ব্যবসায়ী।

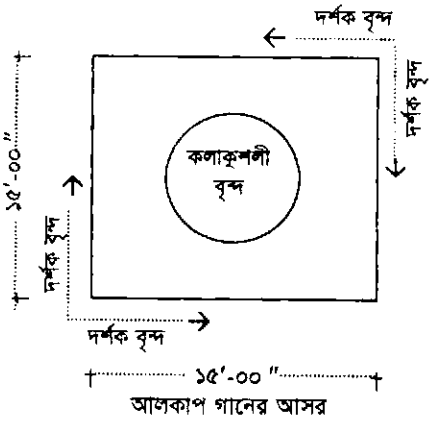

আলকাপ গানের আসর
লেখচিত্র নং ৯

আসর ও দলের অবকাঠামো : সাধারণত গ্রামে বাড়ীর উঠানে, মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত স্থানে অথবা খোলা মাঠে 'আলকাপ গান' পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই গান পরিবেশনার জন্য ১৫′ × ১৫′ আয়তনের বর্গাকৃতির অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করা হয়। অভিনয় আসরের উপরে ছাউনি হিসেবে সামিয়ানা বা ঢেউ টিন ব্যবহার করার জন্য এর চারকাণে চারটি বাঁশ বা খুটি স্থাপন করে বাঁশের চালা তৈরী করা হয়। অভিনয় আসরের উপরের এ ছাউনি মাটি থেকে প্রায় ৯′(ফুট) উচ্চতায় হয়ে থাকে। 'আলকাপ গানে'র অভিনেতারা আসরের কেন্দ্রে বৃত্ত রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করে আসন গ্রহণ করে আর এর দর্শক অভিনয় আসরকে ঘিরে চতুর্দিকে অবস্থান করে (লেখচিত্র নং ৯)। আলোর উৎস হিসেবে মঞ্চের চারকোণে চারটি হ্যাজাক লাইট বা বৈদ্যুতিক আলোর সুবিধা থাকলে বৈদ্যুতিক বাল্ব ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সরকার, কাইপ্যা (কাপিয়াল), দুই থেকে চারজন নাচিয়ে (ছোকরা) এবং প্রায় সাত জন পাইল-দোহার নিয়ে একটি আলকাপ গানের দল গঠিত হয়ে থাকে। দলের মধ্যে যিনি সরকার প্রধানত তিনিই দলের গানের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়াও তিনি দলের জন্য অভিনয়ের নির্দেশক ও প্রশিক্ষকের কাজ করে থাকেন। অভিনয়ের সময় তিনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে থাকেন। পাশাপাশি মূল দোহার হিসেবে গানের পাইল ধরার নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এবং কখনও কখনও কোন বিশেষ চরিত্রের ভূমিকায়ও অভিনয় মঞ্চে আবির্ভূত হন। দলের মধ্যে 'কাইপ্যা' হলো কৌতুক মাষ্টার। তিনি মূলত সংলাপাত্মক অভিনয়ের প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন (চিত্র নং ২০)। আর নাচিয়েরা সাধারণত গানের ও নাচের অংশে এবং স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পাশাপাশি এরা গানের দোহার হিসেবেও ধুয়া ধরে থাকে। এছাড়া দলের তিনজন পাইল, তিন জোড়া ডুগি-তবলা বাজিয়ে থাকে এবং বাকী দুইজন দুই-জোড়া-জুড়ি বাজিয়ে থাকে। এরাও প্রয়োজনমত বিভিন্ন অভিনেয় চরিত্রে অংশ নিয়ে থাকে। দলের ম্যানেজার সাধারণত অভিনয়ে অংশ নেন্ না। তিনি প্রধানত দলের বায়না গ্রহণ এবং স্থান ও তারিখ নির্ধারণের দায়িত্বে থাকেন।

আলকাপ গানে কাইপ্যা চরিত্র, চিত্র নং ২০

আলকাপ গানের অভিনয় : গানের শুরুতে কিছুক্ষণ দ্রুতলয়ে কনসার্ট (যন্ত্রসংগীত) চলতে থাকে। ঠিক এর পরপরই দলের সমস্ত অভিনেতারা অভিনয় আসরে কেন্দ্রে বৃত্তাকারে আসন গ্রহণ করেন। যন্ত্রসংগীত শেষ হওয়া মাত্রই সরকার মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বরস্বতী দেবীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বন্দনা গান শুরু করেন। বন্দনা গানের প্রার্থনা সংগীতে পর্যায়ক্রমে হিন্দু দেবতাদের : ব্রহ্মা, কার্তিক, দূর্গা, কালি, মহামায়া ও তারা কে আহ্বান করা হয়। বন্দনা গীতের শেষে স্বরস্বতী, শিব, দলের ও দেশের মঙ্গলার্থে জয়ধ্বনি গীত পরিবেশন করা হয়। 'আলকাপ গানে'র বিষয় মৌখিকভাবে রচিত বলে অভিনয়ের সময় মঞ্চে ইম্প্রোভাইজ করার প্রচুর সুযোগ থাকে। এর অভিনয় সাধারণত রাত দশটার দিকে শুরু হয়ে ভোররাত পর্যন্ত থাকে। তবে ক্ষেত্রে বিশেষে কখনও কখনও দিনের ভাগেও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এর প্রতিটি পালা বা অংশ এক থেকে তিন ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে আর এরূপ তিন থেকে চারটি পালা নিয়ে আলকাপ গানের অভিনয় পরিবেশিত হয়ে থাকে।

নাচিয়ে : নাচিয়ে বলতে সাত থেকে আট বছর বয়সী কিশোরদেরকে বোঝায় যারা পুরোনো নাচিয়েদের কাছ থেকে ৫/৬ বছর ধরে নাচিয়ের তালিম নিয়ে একজন দক্ষ নাচিয়ে হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সাধারণত বিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত এই সব কিশোর বালকেরা নাচিয়ে হিসেবে অভিনয় করে থাকে (চিত্র নং ২১)।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা : পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্ত্রী চরিত্রে রূপদানকারীরা শাড়ী ও ব্লাউজ এবং নারী সাজের প্রসাধন সামগ্রী (গ্রামে গঞ্জের সহজলভ্য উপাদান) ব্যবহার করে থাকে (চিত্র নং ২১)। কাইপ্যার ক্ষেত্রে সাদা ধূতী, সাদা গেঞ্জী বা ফতুয়া এবং সঙ্গে একটি গামছা রাখেন। আর বাকী অন্যান্য অভিনেতাদের সবাই সাদা ধুতী এবং জামা অথবা পাঞ্জাবী পরিধান করে থাকে। এই অভিনয়ে ঐতিহাসিক কোন পোশাক ব্যবহার করা হয় না। প্রত্যেক অভিনেতারাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁদের নিত্যব্যবহার্য পেশাক হিসেবে ধুতি পরিধান করে থাকে। তবে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বিশেষে বিশেষ চরিত্রের ক্ষেত্রে পোশাকের সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। ফলে দেখা যায় 'কাপ'এর পরিবেশনায় যিনি রাজার চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন তিনি জরির কাজ করা রঙিন আলখেল্লা এবং নীচে ধুতি ছাড়া আর কিছুই পরিধান করেন না। আবার একজন বৃদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করার সময় পাইল দোহারদের একজন তাঁর

আলকাপগান, চিত্র নং ২১

Dhaka University Institutional Repository

ধুতিকে শাড়ির মতো শরীরে উপরের দিকে পেঁচিয়ে মাথা ঢেকে ঠিক বৃদ্ধাদের মতো করে ধুতিকে ব্যবহার করেন। রানী চরিত্র থেকে পারশ্য নারীর চরিত্রে রূপদানের জন্য চোখে একটি সানগ্লাস এবং গলায় একটি মাফলার পেঁচিয়ে অনায়াসে চরিত্রের পরিবর্তন করে থাকেন।

প্রপস্ : আলকাপ গানের অভিনয়ে খুব সামান্যই প্রপস্‌ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- রাজ সিংহাসন বোঝাতে; সাধারণ চেয়ার, থালা ভর্তি খাবার বোঝাতে; পিতলের তৈরী বড় ঝাঁঝ, ভরা কলসী বোঝাতে; 'বায়া'(বাদ্যযন্ত্র) ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আলকাপ গানের অভিনয় উপাদান সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল :

১) বর্ণনাত্মক অভিনয়-গীত : দোহার দল ও বাদ্যযন্ত্রীর পরিচালনায় বাদ্যযন্ত্র সহকারে নাচিয়ের (ছোকরা) দ্বারা একক নৃত্য-গীত (খেমটা) পরিবেশিত হয়ে থাকে যা বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই নৃত্য-গীতের গানের কথাগুলি প্রেম বা ভালোবাসা বিষয়ে উত্তেজক শব্দ দ্বারা গঠিত। নাচিয়েদের পরিবেশিত এসব ভাড়ামী পূর্ণ নাচ দর্শকদেরকে যথেষ্ট আন্দোলিত করে থাকে (চিত্র নং ২১)।

২) সংলাপাত্মক অভিনয় গদ্য ও গীত : মূলত লঘু উপহাস বা ব্যাঙ্গাত্মক রচনার সংলাপাত্মক অভিনয় গদ্য ও গীত ডুয়েট বা ফাস নামে পরিচিত। এর মধ্যে কাইপ্যা ও একজন নাচিয়ে (ছোকরা) প্রধান দুটি ভূমিকায় অংশ নিয়ে থাকে। ডুয়েট বা ফাস এর অভিনয় বিশ মিনিট থেকে চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। অভিনেতাদের মধ্যে কে-কে ডুয়েট বা ফাসে অভিনয় করবেন সে ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এর সংলাপের অংশগুলি মঞ্চে অভিনয়ের সময় উপস্থিত ভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে বলে ইম্প্রোভাইজ (Improvise) করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সংলাপের ভাষা গদ্য-পদ্য উভয় আঙ্গিকেই হয়ে থাকে। কোন চরিত্রের গীত অংশের পূর্বে প্রায়ই 'তাইতো বলি' শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। ডুয়েটে প্লট এর গঠন সাধারণত একজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ লোকের মধ্যকার মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যদিও শেষের দিকে তাঁদের মতানৈক্য ঐক্যমতে গিয়ে পৌঁছে।

আলকাপগান, চিত্র নং ২২

এছাড়া ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্ণ, হাস্যোদ্দিপক নাট্যাংশ নিয়ে হল 'কাপ'। প্রায় এক থেকে দুই ঘন্টা ধরে এর অভিনয় চলতে দেখা যায়। ডুয়েটের মতো দলের গুরু বা সরকার কর্তৃক মৌখিকভাবে রচিত এবং অভিনয় মঞ্চে প্রচুর উপস্থিত অভিনয় করার সুযোগ রয়েছে। ভাষার গঠনের দিক থেকে এটি গদ্য ও গীত সংলাপ উভয় প্রকৃতির হয়ে থাকে।

ডুয়েটের একটি কাহিনী সংক্ষেপ উদ্ধৃত করা হলো :

> এক নববধূ তাঁর দাদা শ্বশুরকে গিয়ে নালিশ করল যে তাঁর নাতি বাড় ছেড়ে চলে গেছে। নানা নাতির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে কিছু সমস্যা পাড় হয়ে শেষ-মেষ দাদা নাতির সাক্ষাৎ পেলো। দাদা নাতিকে বাড়ি ত্যাগ করার কারণ জানতে চাইলে নাতি জানাল যে, তাঁর স্ত্রী নাকি তাঁকে স্বামী সম্বোধন করেছে। সে কারণে শোকে দু:খে, লজ্জায় সে গৃহ ত্যাগ করে। দাদা বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করে অবশেষে নাতিকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। স্বামী (নাতি) ঘরে ফিরলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় কৌতুকপূর্ণ ঝগড়া হয় এবং তারা আবার ঐক্যমতে পৌঁছে।[৮২] (চিত্র নং ২১ ও ২২)

ডুয়েটের মধ্যে কাইপ্যার ভূমিকার সাথে যোগীর গানের ভর্তৃদাস চরিত্রের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। ডুয়েটে কাইপ্যা যেমন উপস্থিত অভিনয়ের দ্বারা গদ্য সংলাপ-পদ্য সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে অভিনয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন ঠিক তেমনি যোগীর গানে ভর্তৃদাস চরিত্রও হাস্য-রসাত্মক কৌতুকপূর্ণ উপস্থিত অভিনয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ পালাটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

---

[৮২] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka 2000, Pg.306

Dhaka University Institutional Repository

৩) বর্ণনাত্মক অভিনয় পদ্য : আলকাপ গানে সরকার গানের প্রতি লাইনের অন্তে মিল যুক্ত যে পদ্যাংশ ছড়াকারে বর্ণনা করে যান তাই-ই হল বর্ণনাত্মক অভিনয় পদ্য। এর ছড়াগুলি সাধরণত একটি বিশেষ ছন্দে এবং শুধুমাত্র তবলার বাদনের ছন্দে ছন্দে পরিবেশন করে থাকে। এই ছড়ার বিষয় কখনও সরকার বা তাঁর গুরু কর্তৃক মৌখিকভাবে রচিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে ছড়া বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন- জোর করে ধান কাটা, আধুনিক পোশাকের উগ্রব্যবহার, শিক্ষা ব্যবস্থা ও আদব-কায়দা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

যে সব বিষয়কে কেন্দ্র করে 'আলকাপ গান' পরিবেশিত হতে দেখা যায় তা নীচে বর্ণনা করা হল :

ক) মিথ্ বা পুরাণ বিষয় : রামায়ণ, মহাভারত বা পদ্মাপুরাণকে কেন্দ্র করে আলকাপ গানের অভিনয় অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

খ) ঐতিহাসিক বিষয় : মোঘল সম্রাট, গৌড় শাসক ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে আলকাপ গানের অভিনয় দেখা যায়।

গ) সামাজিক বিষয় : সমাজের গরীবদের উপর শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন, গ্রাম্যজীবন, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে নিয়ে আলকাপ গানের অভিনয় বেশি দেখা যায়।

একটি সামাজিক 'কাপ' এর কাহিনী সংক্ষেপ নীচে উদ্ধৃত করা হল :

> এক দেশে ছিল এক রাজা। সে তাঁর প্রহরী, মন্ত্রী এবং রানী'কে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "কোনটির মূল্য বেশি, বুদ্ধিমত্তা নাকি জ্ঞানার্জন? " প্রহরী ও মন্ত্রী রাজাকে খুশী করার জন্য 'জ্ঞানার্জন'কে সমর্থন করল; কেননা রাজা ও বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষা জ্ঞানার্জনকে সমর্থন করেন। রানীকে জিজ্ঞেস করলে রানী 'বুদ্ধিমত্তা'কে সমর্থন করল। রানীর কাছ থেকে অপছন্দমূলক উত্তর শুনে রানীকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে রানী তাঁর বেশভূষা পরিবর্তন করে পারস্যের রমণীর সাজে রাজার রাজপুরীতে ফিরে এসে রাজ-বাগানের মধ্যে একটি দোকান খুলে বসলেন। প্রহরী, মন্ত্রী ও রাজা প্রত্যেকে রানীর দোকান দেখা মাত্রই বেআইনীভাবে রাজার বাগানে দোকান দেওয়ার অভিযোগ করলে রানী সন্ধ্যায় তাঁদের প্রত্যেককে খুশী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। সন্ধ্যায় প্রহরী রানীর ঘরে আসলে প্রহরীর সাথে নেচে গেয়ে রানী তাঁকে আপ্যায়ন করলো। এরপর মন্ত্রী আসলে প্রহরীকে চেয়ারের উপর বসিয়ে কাপড় দিয়ে তাঁকে লুকিয়ে রাখলো। এরপর মন্ত্রী আসলে মন্ত্রীকেও নাচ-গানের দ্বারা আপ্যায়ন করার পরে রাজা আসলে মন্ত্রীকে প্রহরীর গায়ের উপরেই কাপড় দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর রাজার সামনে এমন ভান করলেন যেন জীবনেও কখনও ঘোড়া দেখেননি। এরপর রাজাকে 'ঘোড়া দেখতে কেমন' তাঁর বর্ণনা দিতে অনুরোধ করলেন। ঘোড়ার বর্ণনা করতে গিয়ে রাজা ঘোড়ার মতো হয়ে হাটা শুরু করলে রানী তাঁর পিঠে চড়ে বসলেন। এই দৃশ্য দেখে প্রহরী ও মন্ত্রী তাঁদের হাসি আর চেপে রাখতে পারল না। রাজার ঘোড়া হওয়ার অবস্থা দেখে তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। রানী তাঁর মুখোশ উন্মোচন করলেন। অবশেষে রাজা স্বীকার করলেন; "বুদ্ধিমত্তা সত্যিই জ্ঞানার্জন অপেক্ষা বেশি মূল্যবান।"

প্রতিযোগিতামূলক আলকাপ : দুটি আলকাপ গানের দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক 'আলকাপ গানে'র অভিনয় অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় যা পাল্টা-পাল্টি নামে পরিচিত। এসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুটি দলের সরকার ঠিক করে নেন্ কে কোন বিষয়ের পক্ষ অবলম্বন করবেন। যেমন- রাধা-কৃষ্ণ, শিব-দুর্গা, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি দলের সরকার যদি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ের মধ্যে রাধা'র পক্ষ নেন্ তবে প্রতিপক্ষের সরকারকে অবশ্যই কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে হবে। আলকাপ গানের দুটি দলের প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে একপক্ষ অপর পক্ষকে সাধারণত নির্ধারিত বিষয় ভিত্তিক ধাঁ-ধাঁ ধরে বা প্রশ্ন করে থাকে। অপর পক্ষের সরকারকে সেই ধাঁ-ধাঁ বা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে পুনরায় ধাঁ-ধাঁ বা প্রশ্ন করে যেতে হয়। কোন পক্ষের নেতৃত্বদানকারী সরকার যদি প্রতিপক্ষের ধাঁ-ধাঁ বা প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে প্রশ্নদাতাপক্ষের সরকার মঞ্চে এসে দর্শক শ্রোতাকে প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেন এবং তারা জয়ী বলে ঘোষিত হন। তাঁদের জয় দলের বিজয় বলে গণ্য করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক আলকাপ গানের ধাঁ-ধাঁ বা প্রশ্নগুলি সাধারণত গানের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে।

আলকাপ গানের উৎস ও সময় সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একেবারেই অনিশ্চিত। প্রদ্যোত ঘোষ দেখিয়েছেন যে, 'আরবী' শব্দ থেকে আলকাপ শব্দের আগমন।[৮৩] গানের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা আলকাপ গান রচনা করেন। আলকাপের পরিচয় সম্পর্কে আলকাপ শিল্পী গোপালচন্দ্র মণ্ডল (চণ্ডীপুর, ফারাক্কা) বলেন- আলকাপ শব্দটি 'আলকাটা কাপ' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। 'আল' মানে সীমানা (জমির আল), আর 'আলকাটা কাপ' এর অর্থ সীমাহীন হাসি-তামাসা বা অ-সংযত রঙ্গ রসিকতা। আবার প্রখ্যাত আলকাপ ও গম্ভীরা শিল্পী বিশু পণ্ডিত (বিশ্বনাথ পণ্ডিত, ইংলিশ বাজার,

---

[৮৩] শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, আলোচনা ও সংগ্রহ, কলিকাতা, ২০০০, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

মালদা) বলেন যে, আলকাপের 'কাপ'গুলি যেহেতু আগে ছোট ছোট ছিল, সেহেতু সীমায়িত অর্থে 'আলকাপ' নামকরণ।[৮৪]

উপরোক্ত মতামতগুলি ছাড়াও আলকাপ শিল্পীদের সমধিক আলোচিত এবং বহু 'কাপ' এর মধ্যে পরিস্ফুট 'আলকাপ' শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায় তাহল; ব্যঙ্গমূলক বা বিদ্রুপাত্মক অভিনয় রীতি। এখানে 'আল' অর্থে 'হুল' এবং 'কাপ' অর্থে 'কৌতুক' বা 'প্রহসন' বোঝানো হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অবশ্য মোঘল সম্রাট আকবরের দরবারের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞকে এই রীতির স্রষ্টা হিসেবে মনে করে থাকেন।[৮৫] অপরদিকে এক সময়কার খ্যাত অভিনেতা ও লেখক সৈয়দ মোস্তফা সিরাজ বলেন, "বাংলা শব্দ 'আল'এবং 'কাপ' থেকে 'আলকাপ' শব্দের উৎপত্তি, যার উদ্দেশ্য হাস্য-তামাশা করা।" 'শিবের গাজন' রীতির লোক অভিনয়ের সাথে এর উৎপত্তিগত মিল রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। কেননা পূর্বে 'আলকাপ গানে'র মধ্যে শিবের উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রদর্শন স্বরূপ ছড়া গাওয়া একটি নিয়মিত এবং প্রচলিত রীতি ছিল এবং 'গম্ভীরা গান', 'আলকাপ গানে'র একটি আহরিত রীতি বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ মনে করেন "সং যাত্রার সাথে আলকাপ গানের বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অভিনয়ের গঠনগত কাঠামোর দিক থেকে উভয়ের মধ্যেই নৃত্য-গীত-ছড়া, হাস্য-রসাত্মক উপাদানগুলি বর্তমান। আবার আলকাপ গানের মধ্যে 'কাইপ্যা' চরিত্রের আঙ্গিকগত দিক থেকে সং যাত্রার পুরুষ অভিনেতার সাথে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যগত মিল লক্ষ্য করা যায়। এমনকি নামের ক্ষেত্রেও 'কাইপ্যা' চরিত্র আলকাপ গানে 'সং' নামে পরিচিত। এ ছাড়াও 'আলকাপ গান' ও 'সং যাত্রা'র গানের সুরের মধ্যে ও যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অভিনয় কাঠামোর দিক থেকে মালদহ এর গম্ভীরা গানের সাথে আলকাপ গানের যথেষ্ট মিল রয়েছে।"[৮৬]

এছাড়াও বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে আলকাপ গানের মতোই 'আলকাচ্' নামে অন্য আরেকটি রীতির অভিনয় অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এর অভিনয় স্থান বা মঞ্চ আলকাপ গানের অভিনয় মঞ্চের মতোই। তবে 'আলকাপ' এর অভিনয় মঞ্চ মাটি থেকে প্রায় ১৮ ইঞ্চি উঁচু হয়ে থাকে। বর্গাকৃতির উঁচু অভিনয় মঞ্চ ক্রমশ ঢালু হয়ে একটি অনতি সরু পথ দ্বারা সাজ ঘরের সাথে যুক্ত থাকে। 'আলকাচ্' এর পাইল দোহারেরা অভিনয় মঞ্চে গোল হয়ে বসে ঠিকই কিন্তু চরিত্রদের প্রবেশ প্রস্থান সাজ ঘর থেকে মঞ্চে এবং মঞ্চ থেকে সাজ ঘরে হয়ে থাকে। এর বিষয় বা কাহিনী আলকাপ গানের 'ডুয়েটে'র কাহিনীর মতোই।[৮৭]

আলকাপ গানের কাইপ্যা চরিত্রের সাথে 'যোগীর গানে'র যোগী ও ভর্তৃদাস, গম্ভীরা গানে নানা ও নাতীর সংলাপাত্মক অংশ, রয়ানী গানে মূল গায়েন ও তাঁর সহযোগী পরিবেশিত প্রক্ষিপ্ত অভিনয়ের যথেষ্ট মিল রয়েছে। সংলাপাত্মক অভিনয় উপাদানের ক্ষেত্রে এদের তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় একই রকমের।

'বাংলা লোকনাট্য পালাগান' সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, এর প্রতিটি নাট্যরীতির কলাকুশলীরা ছিলেন গ্রাম্যজীবনের অথবা শহুরে জীবনে অভ্যস্ত নয় এমন শ্রেণীর লোক যাদের সহজ সরল মনের চিন্তা ও বিশ্বাসে লালিত হয়ে এসেছে এই সকল বিভিন্ন নাট্যরীতি। এসকল নাট্যরীতি শুধুই আনন্দ বিনোদনের জন্য পরিবেশিত হলেও এর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত রীতি ও আচার-প্রথাজনিত ধর্মভীতি এবং বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে চায় ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের প্রচারণা। তাই হয়তো এর প্রতিটি পালাতেই সারাংশ হিসেবে কোন না কোন নীতিবাক্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়। এই নীতিবাক্যগুলি ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনের জন্য শিক্ষামূলক বিষয় হিসেবে সংযোজিত হয়ে থাকে। এই সূত্র ধরে লোকনাট্যকে মাধ্যম হিসেবে আশ্রয় করে শিক্ষামূলক তথ্য প্রচারের ধারায় 'ইসি বাংলাদেশ' নামে একটি বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

৩.২.১৫. সচেতনতামূলক কার্যক্রমে পালাগানের ব্যবহার (ইসি বাংলাদেশ)

জনগণের খুব কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষ প্রচারণা চালানোর জন্য অনেকে বাংলা লোকনাট্যের বিভিন্ন নাট্যরীতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করেন। তাই বর্তমানে দেখা যায় লোকনাট্যের বিভিন্ন রীতির

---

[৮৪] পূর্বোক্ত

[৮৫] মুহম্মদ আবু তালেব, "লোকনৃত্য: গম্ভীরা ও আলকাপ", বাংলাদেশের লোকশিল্প, সোনার গাঁও, ১৯৮৮, পৃ. ৯১

[৮৬] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka, 2000, Pg. 307

[৮৭] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশনার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এনজিও তথা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই পালাগান নাট্যরীতিকে প্রচারণা-মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে Traditional Folk Performance নাম দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে (চিত্র নং ২৩)। এরূপ একটি এনজিওর নাম 'ইসি বাংলাদেশ'। সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ইসি বাংলাদেশ যেরূপে পালাগান ব্যবহার করে থাকে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল-

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে পালাগান, চিত্র নং ২৩

সচেতনতামূলক কার্যক্রমে বাংলা লোকনাট্য পালাগানের ব্যবহার ও সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গী প্রসঙ্গে ইসি বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জনাব শিহাব শাহীন বলেন-"আমরা বাঙালী। আমাদের রক্তে মিশে হাজার বছরের নাট্য ঐতিহ্য। ঢোলের শব্দ শুনলেই মনের ভেতরে একটা দোলা দিয়ে যায়। এই 'দোলা'টাকে আমরা কখনও দেখিনি। কিন্তু আমাদের অনুভবে তা অতিপরিচিত। গ্রামে গিয়ে লোকনাট্যের আসরে বসলে মনের ভেতরের সেই 'দোলা'টা পুরোপুরিই অনুভব করা যায়। বর্তমানে পাশ্চাত্তের নাট্য কৌশল যদিও অনেক শক্তিশালী, এর পাশাপাশি বিভিন্ন মিডিয়া কভারেজ দিচ্ছে আমাদের টোটাল্ জনগোষ্ঠিকে। তারপরও আমাদের রক্তের সাথে মিশে থাকা লোকনাট্যের টান্ পৃথিবীর সমস্ত কভারেজ মিডিয়াকেও হার মানায়।"[৮৮]

সাংগঠনিক উদ্দেশ্য : ইসি বাংলাদেশের সাংগঠনিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, "প্রতিটি দেশের প্রতিটি জাতির লোকনাট্য উপাদানগুলির এক একটি রীতি হল তাঁদের এক একটি শক্তিশালী মিডিয়া। আমাদের দেশে লোকনাট্যের বিভিন্ন রীতি দিন দিন অবহেলা অযত্নে, যথাযথ চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রতিনিয়তই এগুলোর সংরক্ষণ ও অনুশীলন দরকার। অন্যদিকে আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নাটককে পেশাগত দিক হিসেবে বিবেচনা করা সহজ পথ নয়। এক্ষেত্রে অনেক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে আমাদের নাট্যকর্মীরাও দিন দিন নাটকের প্রতি আগ্রহও হারিয়ে ফেলছে। তাই এসব দিক বিবেচনা করে নিজের ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে নাট্যধারার ক্রমবর্ধমান গতিকে ফিরিয়ে আনতে, সর্বোপরি মনের তাগিদে এবং সুযোগ আছে বলেই আমরা আমাদের লোকনাট্যের বিশাল সম্পদের সম্ভারকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি মাত্র। তবে ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়াকে নিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।" এ যাবৎ ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশের প্রায় অর্ধশত ছেলে-মেয়ে (তরুণ নাট্যকর্মী) বিভিন্ন সময়ে ইসি বাংলাদেশের সাথে চুক্তিভিত্তিক খণ্ডকালীন কাজ করে আসছে।

পৃষ্ঠপোষকতা : পালাগান তথা বাংলা লোকনাট্যকে মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে 'ইসি বাংলাদেশ'র পরিচালিত সচেতনায়নমূলক কার্যক্রমগুলি সাধারণত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এসকল কার্যক্রমগুলি বিদেশী অর্থ সাহায্যপুষ্ট এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। সরকার কর্তৃক প্রণয়নকৃত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতাধীন এরূপ একটি কার্যক্রম হল BINP (Bangladesh Integrated Nutrition Project) এবং BINP এর অধীনে সোস্যাল মোবিলাইজেশনের একটি কর্মসূচী হল IEC (Information, Education & Communication)। এসকল প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় থেকে IEC কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব চাওয়া হলে 'ইসি বাংলাদেশ' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মসূচী-প্রস্তাব জমা দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে তা বাস্তবায়নের অনুমতিপত্র পেয়ে থাকে। এভাবেই ইসি বাংলাদেশ লোকনাট্য কেন্দ্রিক বিভিন্ন কার্যক্রমের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকে।

জন সচেতনায়নে পালাগান ব্যবহারের উদ্দেশ্য : জনসচেতনায়নে লোকনাট্যের অন্যান্য রীতি ব্যতিরেকে পালাগানকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেবার পেছনে যে সব উদ্দেশ্যকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে সেগুলি নিম্নরূপ-

ক) নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত পালাগানের পাণ্ডুলিপির সহজপ্রাপ্যতা এবং সহজলভ্যতা।
খ) পালাগানের জন্য পালার শিল্পীদের সহজে পাওয়া যায়।

[৮৮] সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শিহাব শাহীন, প্রোগাম কো-অর্ডিনেটর, ইসি বাংলাদেশ, লালমাটিয়া, ঢাকা, জুন ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

গ) কম সংখ্যক শিল্পীদের দ্বারা পালাগান পরিবেশন করা সম্ভব।
ঘ) খরচ কম।
ঙ) সেট প্রপসের ঝামেলা নেই।
চ) পালাগানের আনুষাঙ্গিক উপাদান (যেমন- ঢোল, করতাল, জিপসী, মন্দিরা ইত্যাদি) সহজে বহন যোগ্য।
ছ) কিন্তু দর্শকের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।
জ) নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে পরিবেশিত পালাগানের সংক্ষিপ্ত বা প্রলম্বিতকরণ শুধুমাত্র পালাকার বা মূল গায়েনের উপর নির্ভর করে।

এ প্রসঙ্গে জনাব শিহাব শাহীন আরোও জানান, পালাগান দিয়ে মূলত আইস ব্রেকিং হয়। গানের মধ্যে এমন এমন Message আছে যা সে (Target People) বুঝতে পারে না। কিন্তু সে (Target People) ছন্দের সাথে সাথে থাকে। এর ফলে যতক্ষণ পালাগান চলতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যগুলি (Information) শুনতে পায়। যা তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে আন্দোলিত করে থাকে। যদিও এর প্রভাব সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী। একজন পালাকার যখন কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে একটি পালা লিখে থাকেন তখন তিনি কতগুলি বিষয়কে নির্ভর করে পালাগানের কাহিনীটি বেঁধে থাকেন। ফলে পালার মধ্যে একটা Message Domination Factor কাজ করে। পালার মধ্যে Message Dominator হিসেবে Key Word গুলিই পালার দর্শককে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আন্দোলিত ও প্রভাবিত করতে সাহায্য করে।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে পালাগান, চিত্র নং ২৪

পালাগানের পরিবেশন প্রস্তুতি : পালাগানের পরিবেশনের পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে পালাগানের প্রস্তুতি পর্ব অর্থাৎ রিহার্সল চলতে থাকে। ঢাকা থেকে পরিবেশনযোগ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এরপর কলাকুশলীদেরকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করে মাইক্রোবাসযোগে নির্ধারিত এলাকায় পৌছানো হয়। নির্ধারিত এলাকায় পৌছে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্থানীয় এনজিওর সহায়তায় স্থান (Spot) নির্ধারন করে পালাগান পরিবেশন করা হয়ে থাকে। পালাগান পরিবেশনার জন্য বরাবর প্রফেশনাল ঢুলীদেরকে চুক্তি ভিত্তিতে আনা হয়ে থাকে। আর অন্যান্য কলাকুশলী অর্থাৎ মূল গায়েন ও পাইল-দোহার সংগ্রহের ব্যাপারে 'ইসি বাংলাদেশ' বিভিন্ন গ্রুপের নাট্যকর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যশিক্ষার্থীদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

পোশাক : মূল গায়েন মেরুন রঙের এক রঙা লুঙ্গি, ফতুয়া ও কাধে একটি উত্তরীয় ব্যবহার করে থাকে। আর দোহারেরা সাধারণ যেকোন ছাপার লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া (মূল গায়েন অপেক্ষা হালকা মেরুন রঙের) ব্যবহার করে থাকে। দোহার দল একই সাথে বাদ্যযন্ত্রীর কাজও করে থাকে।

অভিনয় কাঠামো : সাধারণত জনবহুল এলাকায় (যেমন- বাজারের পাশে খোলা মাঠে, স্কুল মাঠে অথবা প্রভাবশালী কারোও বাড়ীর উঠানে) যে কোন সমতল ভূমিতে এই গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। পরিবেশনার জন্য মাইক ব্যবহার করা হয়। আসরে মূল গায়েন দোহারদের সম্মুখভাগে একা একটি মাইকষ্ট্যাণ্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। দোহারবৃন্দ তাঁর পেছনে একসারিতে (একলাইনে) দাঁড়িয়ে গানের পাইল ও ধুয়া ধরে থাকে (চিত্র নং ২৪)। দোহারবৃন্দের সামনে (মূল গায়েনের পেছনের সারিতে) দুই থেকে তিনটি মাইকষ্ট্যাণ্ড থাকে। মূল গায়েন গান পরিবেশনের সময় সার্বক্ষণিকভাবে দেহের মধ্যে একটি ছন্দ ধরে রাখেন। কিন্তু ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর মতো চরিত্র থেকে চরিত্রান্তরে যান না বা তাঁর গায়ের উত্তরীয়র সামান্যতম ব্যবহারও করেন না। তবে তিনি গান পরিবেশনায় দোহারদের সাথে খুবই সামান্য পরিমাণে সংলাপের ব্যবহার করে থাকেন। সংলাপের দ্বারা মূল গায়েনকে সাহায্য করার জন্য দোহারদের মধ্যে কাউকে নির্দিষ্ট করে রাখা হয় না। সমস্ত পালার পরিবেশনার সময় ৩০মিনিট থেকে ৪০মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। এর মধ্যে মাত্র ৪-৫ বার মূল গায়েন ও দোহারদের মধ্যে কয়েকটি শব্দের গদ্য সংলাপের আদান-প্রদান হয়ে থাকে বলে পালা পরিবেশনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঠিক করে নেয়া হয়; দোহারদের মধ্যে কে মূল গায়েনের সাথে সংলাপাত্মক ক্রিয়ায় অংশ নেবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রপস্ : এই পালাগানের পরিবেশনায় কোন রকম প্রপসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না।

'ইসি বাংলাদেশ' পরিচালিত আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনায়নমূলক পালাগান পরিবেশনায় ব্যবহৃত অভিনয় উপাদান সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি নীচে উদ্ধৃত করা হল :

পরিবেশিত পালার নাম: সোনাই কন্যার পালা
রচনা : হাফিজ রেদু

গায়েন : প্রথমে বন্দনা করি সৃষ্টিকর্তার নাম।
যার কৃপায় মানুষ হইয়া দুনিয়ায় আইলাম।
পশ্চিমে বন্দনা করি উথাল পদ্মা নদী,
তোমায় ছাড়া নাইগো পদ্মা বাংলা মায়ের গতি।

দোহার : ই - ই - ই . . . . . .

গায়েন : পূবেতে বন্দনা করি সকালের লাল সুরুজ,
তুমি আমায় স্বাধীনতার রক্ত মাখাদরুদ।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পাহাড়,
তোমার উঁচু মাথা আমার চেতনার আহার।

দোহার : আ - আ - আ . . . . . .

গায়েন : দক্ষিণে বন্দনা করি উথাল সুমুদ্দুর।
তোমার রূপের নাইরে সীমা দেখি যতদূর।
গুরুরও চরণে আমার মাথাটা লুটাই।
দশের তরে শ্রদ্ধাভরে ছালামও জানাই।

দোহার : আ - আ - আ . . . . . .

সুরান্তর

গায়েন : (ও . . . ও) ছালাম জানাইলাম জানাইলাম দশের চরণে,
এই ছালাম পৌছায় দিয়ো দেশের জনগণে।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল জাতি ভাই।
আমরা সবাই এক বাঙ্গালী কোনই বিভেদ নাই।

দোহার : ছালাম জানাইলাম. . . . . দেশের জনগণে।

গায়েন : সুখে দুখে সকল কাজে মিলে মিশে থাকি।
দেশ ও দশের কাজ করি ভাই কাঁধে কাঁধ রাখি।

দোহার : ছালাম জানাইলাম. . . . . দেশের জনগণে।

গায়েন : এই আসরে আছেন যতো জ্ঞানী গুণীজন।
করেন দোয়া মন খুলিয়া করি নিবেদন।

দোহার : ছালাম জানাইলাম. . . . . দেশের জনগণে।

গায়েন : পদ্মা পাড়ে ছিলো যে এক সোনাইও সুন্দরী।
নাম রাখিল বাপ ও মায়ে অতি আদর করি।

Dhaka University Institutional Repository

দোহার : ছালাম জানাইলাম. . . . . দেশের জনগণে।

গায়েন : আমি যে এক অধম গায়ান হাফিজ আমার নাম।
সোনাই কন্যার কিসসা লইয়া গানটা বান্ধিলাম।।

কথা : *আমার জন্মভূমি সোনার বাংলা। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা অবারিত ফসলের মাঠ নদীর বুকে পাল তোলা নৌকা । গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, বুক ভরা আশা, মুখ ভরা গান, কি নাই আমাগো? নদীর নাম রূপসী পদ্মা, বুক জুড়ে তার উত্তল ঢেউ, সেই পদ্মা পাড়েই বাড়ী আমার সোনাই ক্যান্যার। তার রূপ আর গুণের জুড়ি মেলা ভার। আশপাশের দশ গেরামে রইটা যায় তার নাম। তারে লইয়াই আমার আইজকার পালা। সুধী সমাজ শোনেন তাইলে আমার সোনাই কন্যার পালা।*

গায়েন : (ওরে) সোনাই কন্যা তোমায় মনে লইয়া,
গান বান্ধিলাম তোমায় মনে লইয়া।।

সোনাই কন্যার রূপের কথা কি বলিব আমি
চাঁদের রূপও তাহার কাছে হার মানে জানি।
কাঁদলে মেয়ে অমাবশ্যা হাসিলে পূর্ণিমা
গায়ের বরণ দুধে আলতাগো হায়রে মতির গহনা।।

দোহার : সোনাই কন্যা. . . . . মনে লইয়া।

গায়েন : চুল যেন তার মেঘের কালো অমাবশ্যার রাত
কোমর ও ছাড়িয়া পড়ে মাপলে পঞ্চ হাত।
সেই চুলেতে মাখে কন্যা সুবাসিত তেল
খোপার মাঝে গুইজা রাখেগো হায়রে গোলাপ-জবা-বেল।।

দোহার : সোনাই কন্যা. . . . . মনে লইয়া।

গায়েন : ভুরু তাহার বাঁকা চাঁদ ভাই নয়ন মনোহরা
সেই চোখেতে কাজল মাখে ভুবন পাগল করা,
চাইলে পরে সেই চোখেতে পরাণে তীর হানে
তাহার চোখের এই মহিমাগো হায়রে সর্বলোকে জানে।।

দোহার : সোনাই কন্যা. . . . . মনে লইয়া।

গায়েন : নাকটা তাহার তোতা পাখির ঠোঁটের মতো জানি
সেই নাকেতে সোনার নোলক আছে যে একখানি।
ঠোঁটখানা তার যেন জলে ফোটা পদ্মফুল
তাহার কথা কি বলিব গো হায়রে পাইনা আমি কুল।।

দোহার : সোনাই কন্যা. . . . . মনে লইয়া।

গায়েন : গলায় তাহার সোনার মালা কানে মতির দুল
কাঁধের পরে ঝুলে থাকে বেনি করা চুল।
হাত দুখানি দেখতে যেন কচি লাউয়ের লতা
মুখে ফোটে সকল সময় গো হায়রে কত মধুর কথা

দোহার : সোনাই কন্যা. . . . . মনে লইয়া।

Dhaka University Institutional Repository

গায়েন : দোলনায় দোলে সোনাই কন্যা পা দুখানি নড়ে
আলতা রাঙ্গা পা দুখানি সবার নজর কাড়ে,
সে পায়েতে নুপুর তাহার বানর ঝর বাজে
তাই দেখিয়া রাজার কন্যাগো হায়রে সদাই মরে লাজে

দোহার : সোনাই কন্যা. . . . . মনে লইয়া।

গায়েন : গুনে সে যে গুণবতী তাহার জুড়ি নাই
দশ গেরামে তাহার নামে ধন্য ধন্য তাই,
মায়ে তারে ডাকে মণি বাপে ডাকে সোনা
কি বলিব তাহার কথাগো হায়রে যেন চাঁদের কোণা।

দোহার : সোনাই কন্যা. . . . . মনে লইয়া।

গায়েন : মোহন মিয়া উত্তর গায়ের তালুকদারের ছেলে
সোনাই কন্যার রূপ দেখিয়া তাহার পরাণ ভোলে।
ঘটকও পাঠাইয়ারে মোহন বিয়ার কথা কয়
ফাগুন মাসে চৌদ্দ তারিখ গো হায়রে বিয়ার দিনও হয়।।

দোহার : সোনাই কন্যা. . . . . মনে লইয়া।

গায়েন : ফাগুন মাসের গরম হাওয়া সবার গায়ে লাগে
মোহন মিয়া সোনাই কন্যা শুধুই রাত্রি জাগে।
কখন আইবো সেই শুভক্ষণ বর বধুর সাজে
দশ গেরামে সেই না বিয়ার গো হায়রে মধুর সানাই বাজে।

দোহার : সোনাই কন্যা. . . . . মনে লইয়া।

কথা : *সোনাই কন্যা আর আর মোহন মিয়ার মিয়া। যেমন কন্যা তেমনই তার বর। বিধাতা পাঠাইল তারে এক সাথে গাঁথা নয়নের অঙ্গ যেমন নয়নের পাতা।। সময় বইয়া যায়। বিয়ার দিন ঘনাইয়া আসে। যথারীতি বিবাহ পূর্ব কার্য শুরু হয়। মুখে মিষ্টি আর গায়ে হলুদ।*

সুর : কন্যা সাজিলরে, কন্যা সাজিলরে।।
নতুন বউএর সাজে কন্যা সাজিলরে।।

গায়েন : বরের ঝিয়ারী আসে হলুদ মেন্দি নিয়া।

দোহার : কন্যা সাজিলরে. . . . . .

গায়েন : সোনাই কন্যা বসে আসি পিড়ি পাড়িয়া।
মাথায় দেয় ধান দুর্বা মুখে হলুদ তেল।
বরপক্ষ কন্যা পক্ষ চলে রঙের খেল।
হাতে এবার মেন্দি দেবে খোলে কন্যার মুঠ।
কন্যার হাতে কিযে দেখি সবাই হইল চুপ।
পাওখান ধরিল যেই আলতা বিদার তরে।
পায়ের তালুর ভ্যাস দেখিয়া সবাই কাঁপে ভয়ে।
গোটা গোটা কি দেখা যায় হাত পায়ের তলে।
সবাই অবাক কেউ বোঝেনা রোগটারে কি বলে।

Dhaka University Institutional Repository

(এবার)বন্ধ হইল বিয়ার বাদ্য সবাই গেল ফিরে।
সোনাই কন্যা কান্দে শুধু একা বসে নীড়ে।
সোনাই কন্যায় ধরছে এবার কিযে অচিন রোগ।
তাহার কাছে গেলেই সবার হবে যে দুর্ভোগ।
কেউ যায় না তাহার কাছে ভয়ে পালায় দুরে
নানান কথা যায় যে শোনা সারা গেরাম ঘিরে।
সবার মনে একটাই ভয় এবার কিযে করে
এইনা অসুখ এই গাঁয়েরই আবার কারে ধরে।।
সোনাই কন্যার বাবা মায়ে করে হায়রে হায়
কন্যারে লইয়া এবার আমরা কোথায় যাই।।

সুরান্তর
বাপে কান্দে মায়ে কান্দে কান্দে বনের পাখি
বৃক্ষলতা কান্দে আরো কন্যার কান্দন দেখি।।
কি করিব কোথায় যাবো দারুণ দুখের মাসে
সোনাই কন্যার দুঃখে আমার নয়ন জলে ভাসে।।
বাপে মায়ে সোনাই কন্যায় হাসপাতালে নিয়া
ডাক্তার সাবের কাছে কয় সব কথা খুলিয়া।।

শুনিয়া ডাক্তার সাহেবে সবিস্তারে কয়
পানির দোষে অনেকেরই এমন অসুখ হয়।।

কথা : *ভাইসব তাইলে শুনেন ডাক্তার সাবে কি কথা কইলো*

সুর : সোনাই কইন্যার লাগিরে
সোনাই কইন্যার জীবন গেল বিষেরও জ্বালায়রে

গায়েন : কি কহিল ডাক্তার সাবে শোনেন বিবরণ

একে একে আমি এবার করিব বর্ণন।।
মাটির নীচের অনেক তলে আছে জিনিস ভাই
নাটি তাহার আর্সেনিক আগে শুনি নাই।।
আর্সেনিকটা থাকেরে ভাই মাটির অনেক তলে
তাইতো সেটা উঠে আসে টিউবয়েলের জলে।।
পুকুর খালের পানি উপরে যেহেতু
তাই তাতে ভাই থাকে নাকো আর্সেকিসের হেতু।।

কথা : *তাইলে কি বোঝা গেলো যেহেতু আর্সেনিক মাটির অনেক নীচে থাকে তাই টিউবয়েলের পানিতে আর্সেনিক থাকতে পারে। এজন্য আপনেগো সকল টিউবয়েলের পানি খানা*

সুর : টিউবয়েলের পানিতে ভাই আর্সেনিক থাকিলে
সেই পানিটা কোনো রকম খাওয়া নাহি চলে।।
এই পানি ওই এলাকার যত মানুষ খায়
তাদের দেহে নানারকম অসুখ দেখা দেয়।।
হাত পায়ের তলাতে তার গোটা দেখা যায়
গায়ের চামড়া খসখসে হয় কালো দাগও হয়।।

কথা : *এবং শেষ পরিণতি হইলো মৃত্যু। তবে এই অসুখটা কিন্তু ছোঁয়াচে না। একজনের শরীর থাইক্যা আর একজনের শরীরে ছড়ায় না। টিউবয়েলের পানিতে আর্সেনিক দেখা দিলে আমরা কি করবো ? আর্সেনিক মুক্ত করার কোন উপায় আছে কি? আছে। উপায়টা কি?*

Dhaka University Institutional Repository

সুর : আর্সেনিকের পানিটা ভাই শুদ্ধ করা যায়।
যদি আমরা হাতের কাছে একটা জিনিস পাই।।
আপনার এলাকায় আছে স্বাবলম্বী ভাই॥
তাদের কাছে এক ধরণের বালতি পাওয়া যায়।।
লাল আর সবুজ বারতির মধ্যে এমন যাদু আছে।
আর্সেনিকটা দুর হয় ভাই সেই বালতির কাছে।।
আর্সেনিকের পানিটা তাই করিতে শোধন।
স্বাবলম্বীর বালতির কথা রাখিবেন স্মরণ।।

কথা : *তাইলে স্বাবলম্বীর বালতি জিনিসটা কি? সেডা কিভাবে আর্সেনিক দুর করে ?*

(সাবাবলম্বীর বালতির বিবরণ গায়েনের কথায় বর্ণনা আসবে)

সুর : আহা কি আনন্দরে.....কি আনন্দ...রে.....
স্বাবলম্বীর বালতি পাইছি কি আনন্দরে।
জীবনটারে কাইরা নিতে আইলো চতুর্দিক।।
নিয়ম মতো বালতির মধ্যে পানি দিলে ভাই।
আর্সেনিকটা বলে তখন গেলাম মিয়া ভাই।।
স্বাবলম্বীর বালতির পানি যদি আমরা খাই।
আর্সেনিকের বিষের তবে কোনই ভয় নাই।।
নাইকো কোনো চিন্তারে ভাই নাইকো কোনো ডর।
স্বাবলম্বীর নামটা ধইরা আনন্দ কর।।

সমাপ্ত

পালাগান পরিবেশনার পাশাপাশি গণসচেতনতামূলক তথ্য প্রচারণার জন্য 'ইসি বাংলাদেশ' লোক ঐতিহ্যের অতিপরিচিত এবং জনপ্রিয় কিছু নাট্যকৌশলেরও ব্যবহার করে থাকে। তথ্য প্রচারণার জন্য তাঁদের ব্যবহৃত নাট্য কৌশলটি হল 'সং'। এদের 'সং' এর রয়েছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জানা যায়, নাটোর অঞ্চলের 'যোগীর গান' রীতির যোগী ও ভর্তৃদাস চরিত্রগুলি যে সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাঁদের সংলাপাত্মক জায়গাগুলিতে অভিনয় করে থাকে ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ে দাঁড়া করানো হয়েছে তথ্যমূলক প্রচারণার জন্য দু'জন সংকে। এদের মধ্যে একজন 'যোগীর গানে'র যোগী চরিত্রের মতোই বুদ্ধিমান ও ধৈর্য্যশীল আর অন্যজন ভর্তৃদাস চরিত্রের মতোই অস্থির ও বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও মানসিকতার অধিকারী। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে 'বিআইএনপি'র মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশেষ আইইসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তথ্যমূলক প্রচারণায় জনসাধারণের সাথে ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশন তৈরীতে এই সং এর কৌশলকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তাহল; 'যোগীর গান' 'পালাগান' রীতির সাথে সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র নাট্যরীতি। অথচ 'যোগীর গানে'র ভেতর থেকে নাট্য উপাদানকে বের করে এনে একে নতুনভাবে উপস্থাপন করে উন্নয়নের কাজে লাগানো হয়েছে। আমাদের দেশীয় নাট্য ঐতিহ্য থেকে এটি একটি বড় প্রাপ্তি। এর প্রতি পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অসংখ্য আবিষ্কার ও বিস্ময়কর উপাদান। এর যথাযথ ব্যবহার ও চর্চার দ্বারা আমরা নিজেদেরকে আরও সম্মৃদ্ধ করতে পারি।

'যোগীর গান' নাট্যরীতির থেকে সংগৃহীত নাট্য উপাদানের দ্বারা সং কে যেভাবে তথ্য প্রচারণায় (মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে পুষ্টি বিষয়ে) ব্যবহার হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হল :

প্রথমত: সং -এর কার্যক্রম 'কমিউনিটি আউটরিচ' নামে ব্যবহার করা হয়েছে। সং দু'জন শুরুর আগে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সারা এলাকা প্রদক্ষিণ করে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে থাকে এবং জনগণকে মূল অভিনয় পরিবেশনার বেদিতে সমবেত করে। গ্রাম প্রদক্ষিণকালে এই সং দুইজন বিআইএনপি লোগো কিংবা ক্যাম্পেইন লোগো ও প্রকল্প কর্তৃক ব্যবহৃত আইইসি সামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন শারীরিক কসরতের মাধ্যমে জনগণকে তাঁদের দিকে আকৃষ্ট করে। এর ফলে লোগো এবং আইইসি সামগ্রীগুলি নাটক মঞ্চায়নের পূর্বেই জনগণের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে থাকে (চিত্র নং ২৪)।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য প্রচারণামূলক কাজে 'সং' যেভাবে কাজ করে :
সং দুইজন দুই চরিত্রের বলে এদেরকে ১ম ও ২য় সং বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রদত্ত প্রধান প্রধান তথ্যগুলির প্রতীকী জিনিসগুলি (লোগো) তাঁদের সংগে রাখে এবং তারা সেগুলি তাঁদের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করে। বাদ্যযন্ত্রের শুরু হওয়ার সাথে সাথে সং দুইজন নেচে-নেচে পথ চলতে থাকে।

নীচে সং দুইজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হল :

১ম সং : একটু বোকা প্রকৃতির এবং অধৈর্য্যশীল।

২য় সং : জ্ঞানী প্রকৃতির এবং ধৈর্য্যশীল।

১ম সং : সবকিছুতেই তাঁর কৌতুহল, জানার আগ্রহ ও প্রশ্ন। যা কিছু সে দেখছে সব কিছুই তাঁর কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

২য় সং : ১ম সং এর সব প্রশ্নের উত্তর ২য় সং এর নখদর্পনে এবং ২য় সং ১ম সং এর সব রকম প্রশ্নের উত্তর স্বাভাবিকভাবে ধৈর্য্য ধরে বোঝাতে চেষ্টা করে।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সং, চিত্র নং ২৪

১ম সং : ২য় সং ১ম সং কে যা কিছুই বোঝাতে চায় ১ম সং ২য় সং এর সব কিছুই উল্টো অর্থ করে বুঝতে চেষ্টা করে। একটা কিছু বুঝিয়ে দিলে সে তার উল্টো অর্থ করে ২য় সং কে পাল্টা প্রশ্ন করে।

২য় সং : ধৈর্য্য সহকারে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে, ১ম সং যা বোঝেনা তা তাঁকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করে।

১ম সং : আত্মভোলা, মনভোলা, নিয়ন্ত্রণহীন এমনকি তাঁর কাজ নিয়ে সে প্রশ্ন করে যে, সে এখন কি করছে। আশে পার্শ্বের অবস্থা, পরিবেশ নিয়ে সে প্রশ্ন করে। দৌড়ে এদিক-ওদিক যেতে চেষ্টা করে।

২য় সং : ১ম সং কে সবসময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করে।

গ্রাম প্রদক্ষিণ করার সময় সং দুইজনের সাথে ৩ জন বাদ্যযন্ত্রী থাকে। তাঁদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি হল : ঢোল, কাশ, ঝাঁঝ/ঝাজড় ইত্যাদি। সাজ-সজ্জা হিসেবে মুখে বিভিন্ন বর্ণের ফেব্রিক্স রঙ লাগানো থাকে। এবং এর পোশাক বাহারী রঙের হয়ে থাকে। সং-দের পায়ে নুপুর থাকে।

তথ্য প্রচারণামূলক কাজে তাঁদের প্রচারিত তথ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ-

১) তথ্য : জন্মের আধঘন্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের বুকের শাল দুধ খাওয়ান।
লোগো : শাল দুধ/আধ ঘন্টা

চলার পথে ১ম সং রুগ্ন বাচ্চাদের দেখে মন্তব্য করবে, সে নিজেকে তাঁর সাথে তুলনা করবে, সে নিজে শাল দুধ খায়নি বলে কান্নাকাটি করবে, তখন ২য় সং তাঁকে বোঝাবে। সে চলতে চলতে মন্তব্য করবে।

২) তথ্য : গর্ভের প্রথম অবস্থা থেকেই বেশী বেশী খাবার ও আয়োডিন যুক্ত লবন খাবেন।
লোগো : বাড়তী খাবারের থালা ও আয়োডিন লেখা টিনের কৌটা

যে কোন ছলনায় বাড়তী খাবারের থালা সম্পর্কে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করবে...। সে ছলনা করে আয়োডিনের কৌটা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। যেমন- আয়োডিন কি, না খেলে কি হয়, খেলেই বা কি হয়, আমি (বোকা সং) খেয়েছি কিনা ইত্যাদি। এক সময়ে কৌটা খুলে সে আয়োডিন খাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে বোঝানো হবে আয়োডিন যুক্ত লবন কিভাবে খেতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩) তথ্য : গর্ভবতী মহিলা শারীরিক পরীক্ষার জন্য গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে তিনবার স্বাস্থ্য কেন্দ্র যাবেন।
লোগো : তিন বার/স্বাস্থ্য কেন্দ্র

লোগো'তে তিনবার লেখা দেখে প্রশ্ন করবে, এর তাৎপর্য কি? স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা শুনে সেখানে সে ব্যায়াম করতে যেতে চাবে। তখন তাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গর্ভবতী মহিলার প্রয়োজন সম্পর্কে বোঝানো হবে। সেখানে টাকা লাগবে কিনা সে এসব সম্পর্কে জানতে চাবে।

৪) তথ্য : গর্ভবতী মহিলা সবধরণের ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন এবং নিয়মিত বিশ্রাম নেবেন।
লোগো : বিশ্রাম/ভারী জিনিস

বিশ্রাম শব্দ লেখাযুক্ত লোগো দেখে সে বিশ্রাম নিতে চাবে। তখন তাকে বোঝানো হবে যে, এটা তার জন্য নয়, শুধু মাত্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য। এর পরে সে যখন শুনবে গর্ভবতী মহিলাদের ভারী জিনিস বহন করা নিষেধ তখন সে তার সাথের সব কিছু ফেলে দিতে চাইবে। সেখানে তাকে বোঝানো হবে তুমি তো পুরুষ, গর্ভবতী মহিলা নও।

৫) তথ্য : শিশুর নিয়মিত ওজন মাপাবেন।
লোগো : পাল্লার উপর শিশু

পালাগান নিয়ে ইসি বাংলাদেশের তথ্যপ্রচারণামূলক কার্যক্রমের বাইরেও পালাগানের বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষকরে গণমাধ্যমগুলির আওতায় দেশব্যাপী সর্বশ্রেণীর সকল সাধারণ মানুষদেরকে যোগাযোগের আওতায় আনার জন্যও পালাগানের বিভিন্ন রকমের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরীর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনে কুদ্দুস বয়াতীর পরিবেশিত অংশটি উল্লেখ করা যেতে পারে :

"এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে,
এই দিনেরে নিতে হইবো সেই দিনেরও কাছে ॥
আণ্ডা বাচ্চা পোলাপান শোন দিয়া মন,
স্কুলেতে যাইতে হইবো হইছে নির্ধারণ ॥"

'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে উপরোক্ত টিভি এ্যাডটি সাধারণ মানুষের মধ্যে তখন ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও উল্লিখিত এ্যাডের অংশটি কোন 'পালাগান' নয় তবুও কুদ্দুস বয়াতীর পরিচিতি দেশে ও বিদেশে সর্বসাধারণের কাছে একজন পালাকার হিসেবে। পালাগানের একটি জনপ্রিয় সুরে 'এই দিন দিন নয়'-এর সুর করা হয়েছিল এবং এর সুর করেছিলেন কুদ্দুস বয়াতী নিজেই।[৮৯] তাছাড়া পালাগানের পরিবেশনায় তিনি যে পোশাক ব্যবহার করেন, উল্লিখিত টিভি এ্যাডটিতে তিনি ঐ একইরকম পোশাকই ব্যবহার করেছিলেন (চিত্র নং ২ দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও বিভিন্ন পণ্যের বাজার চাহিদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রেডিও-টেলিভিশনে বিভিন্ন রকম আকর্ষণীয় এ্যাড (সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য) তৈরী করা হয়। এক্ষেত্রেও কুদ্দুস বয়াতী, আব্দুর রহমান বয়াতীর নাম সর্বাগ্রে স্থান পায়। যেমন- কুদ্দুস বয়াতীর পরিবেশিত ঢেউ টিনের এ্যাডটিও পালাগান পরিবেশনার আঙ্গিকে করা হয়েছে।

ইসি বাংলাদেশের তথ্য প্রচারণামূলক কার্যক্রমে পালাগান পরিবেশনা, কুদ্দুস বয়াতী ও আব্দুর রহমান বয়াতীর বাণিজ্যিক প্রচারণায় পালাগানের পরিবেশনার মধ্যে ইসলাম উদ্দিন বয়াতীর পালাগান পরিবেশনার মতো অভিনয় শৈলী, দক্ষতা আর নিপুণতার ছাপ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। তদুপরি এই সকল সচেতনায়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে জনগণের মধ্যে যে একটি সাড়া বা আলোড়ন পড়ে যায় তাঁকে আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। অপরদিকে একজন নাট্য শিক্ষার্থী তাঁর অভিনয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাস্তব চর্চাক্ষেত্র হিসেবে পালাগানের এই সকল কার্যক্রমে অভিনয় অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে নাট্যকর্মীরা একদিকে যেমন জনসংযোগসহ বিভিন্ন নাট্যরীতি ও কৌশলের সাথে পরিচিত হয়ে নিজেকে অভিজ্ঞ করে গড়ে তুলতে পারছে তেমনিভাবে অন্যদিকে এসব নাট্যরীতি চর্চার অভাবে কালের অতলে না হারিয়ে বরং চর্চার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবে বাংলার নাট্যপ্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অনুসারে। লোক পর্যায়ে যারা এসব নাট্যরীতিকে চর্চার দ্বারা লালন করে এসেছে তারাও এগুলিকে নিয়মিত চর্চায় নব উদ্দিপনায় উৎসাহিত হতে পারে।

---

[৮৯] সাক্ষাৎকার গ্রহণ : কুদ্দুস বয়াতী, ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চ, ফেব্রুয়ারী ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

৪. পালাগানের বিষয় ও আঙ্গিক

৪.১. পালাগানের বিষয়

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পালাগানের কাহিনীর সাথে আমাদের গীতিকাগুলির একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এসব গীতিকার আখ্যায়িকাগুলি প্রায়ই পালাগান হিসেবে গেয়। এর পুরো অংশে রয়েছে সাধারণ মানুষের কাহিনী। এর ভেতরে দেবতার হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে। এমনকি হিন্দু-মুসলমানের বা উঁচু-নীচুর ভেদও মানেন্ নি রচয়িতারা। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, "এদের রচনা পদ্ধতিও আশ্চর্য রকম। মঙ্গলকাব্যে হোক, বৈষ্ণব কাব্যে হোক, সর্বত্র কবিরা পুরানো অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধা ছক অনুসরণ করেছেন।...গীতিকার কবিরা কিন্তু উপমা ও অলঙ্কারের ব্যবহারে আগাগোড়া মৌলিক। তাঁদের ভাষা যেমন সরল, ভঙ্গি তেমন অনাড়ম্বর।...এই দুই কারণে সন্দেহ জাগে গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিন্তু তাকে ঘষে-মেজে যথাসম্ভব প্রাচীন সাজে সাজিয়ে একালেই লেখা হয়েছে, একালের অনুযায়ী ব্যঞ্জনা দিয়ে।"[৯০]

সৈয়দ আজিজুল হকের সন্দেহ অমূলক নয়। যেমন- এর প্রমাণ পাওয়া যায় বরিশালে প্রাপ্ত শিব বিষয়ক একটি ছোট পালাগানে। সূর্যের উদয় থেকে মধ্য আকাশে উত্থানের পরোক্ষ-রূপকে সূর্যাই বা শিবাই ঠাকুরের বিবাহ এবং পত্নী গৌরীর সঙ্গে আপন গৃহে যাত্রার কাহিনী বর্ণনার মধ্যে। গৌরী অশ্রুসজল চোখে পতিগৃহে যাত্রা করছেন। সেই মুহূর্তে সূর্যাই সম্পর্কে নববধূ গৌরীর অবিশ্বাস এবং পিতৃগৃহ ত্যাগের যে বেদনা তা এতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে। সংগৃহীত পালাটি 'অতি প্রাচীন'-বলে উল্লিখিত-

গৌরী	:	তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি কাপড়ে দুঃখ পামু।
সূর্যাই	:	নগরে নগরে আমি তাতিয়া বসামু।
গৌরী	:	তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু।
সূর্যাই	:	নগরে নগরে আমি শাখারি বসামু।
গৌরী	:	তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি সিন্দুরের দুঃখ পামু।
সূর্যাই	:	নগরে নগরে আমি বাণিয়া বসামু।...।
গৌরী	:	তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি মা বলিব কারে?
সূর্যাই	:	আমার যে মা আছে মা বলিবা তারে।
গৌরী	:	তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি বাপ বলিমু কারে?
সূর্যাই	:	আমার যে বাপ আছে বাপ বলিবা তারে।...।[৯১]

পালাটি প্রাচীন বলে স্বীকার করলেও এর ভাষা যে একালের তাতে সন্দেহ নেই। এ ধরনের পালাগান চরিত্রাভিনয় রীতি থেকে ভিন্ন পন্থায় পরিবেশিত হয়। পালাগায়ক একক ভাবে কাহিনীটি বর্ণনা করেন এবং উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অংশগুলোতে দোহার বা দোহার মধ্যস্থিত বায়েন অংশগ্রহণ করে থাকেন।

লোকনাট্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর কাহিনী (এর সাথে অবশ্যই তার ভাষা জড়িত)। তারপর এর পরিবেশনা। একই কাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে সেখানকার সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার কারণে ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। যার ফলে পরিবেশন রীতির পাশাপাশি নাট্যকাহিনীর মূল অংশের সাথে জন্ম নেয় তাঁদের পরিবেশনাগত ছোট ছোট শাখা প্রশাখা, ডাল-পালা। এগুলি অঞ্চল ভিত্তিক বিশ্বাস ও সেখানকার সামাজিক আচার-আচরণের উপরই বেশি নির্ভর করে থাকে। এসব আখ্যায়িকার উৎপত্তি সাধারণত সমাজের বয়স্কদের কাছ থেকে মৌখিকভাবে কাহিনী শুনে। স্থানীয় উপাখ্যানগুলির ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে আমরা প্রধান উৎসরূপে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন- ১) সমাজের বয়স্কদের কাছ থেকে মুখে মুখে কোন ঘটনার কাহিনী শুনে, ২) মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার মাধ্যমে।[৯২] কুদ্দুস বয়াতী জানান, 'মহুয়া', 'মলুয়া' এবং 'ফিরোজ খান দেওয়ান' আখ্যায়িকাগুলি কেন্দুয়ার এরশাদুর রহমানের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

---

[৯০] সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, ময়মনসিংহ-গীতিকা চর্চা, মরমনসিংহ গীতিকা, ১৯৯৯ পৃ. ৪২৩

[৯১] ড. সেলিম আল দীন, মধ্য যুগের বাঙলানাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬

[৯২] Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka, 2000, Pg. 271

Dhaka University Institutional Repository

পালাগানের বয়াতীদের পরিবেশনায় যে সমস্ত আখ্যায়িকা পালাগান হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে তার একটি তালিকা নীচে দেয়া হল : ১. কমলা রানী, ২. ফিরোজ খান দেওয়ান, ৩. মলুয়া সুন্দরী, ৪. আয়নামতি, ৫. হালেক বাদশা, ৬. কান বাদশা, ৭. রহিম বাদশা, ৮. ইন্যাক বাদশা, ৯. রতন বাদশা, ১০. কাঞ্চন বাদশা, ১১. সোনাহর বাদশা, ১২. ইমরান বাদশা, ১৩. মতিলাল বাদশা, ১৪. চানফর বাদশা, ১৫. শাহী আরম বাদশা, ১৬. আসমত বাদশা, ১৭. ফুলচান্দ বাদশা, ১৮. জালি আলম বাদশা, ১৯. বাদশা তরমুজ, ২০. জয়নাল মিল্লিক বাদশা, ২১. তাজ মিল্লিক বাদশা, ২২. সেকান্দার বাদশা, ২৩. কারোন বাদশা, ২৪. জাহাঙ্গীর বাদশা, ২৫. হলুদ বাদশা, ২৬. বাদশা আয়নাল হক, ২৭. রত্তন সাধু, ২৮. আমির সাধু, ২৯. আইলসা রাজা, ৩০. ওম রাজা কোম রাজা, ৩১. তালেব সওদাগর, ৩২. সোরাত বানু, ৩৩. অতুলা সুন্দরী, ৩৪. সুন্দর মতি, ৩৫. হরবুলা সুন্দরী, ৩৬. গুলে হরমুজ গেন্দাফুল কন্যা, ৩৭. মধুমালা, ৩৮. বিলকিস রানী, ৩৯. চিমু রানী, ৪০.ডালিম পরী, ৪১. চন্দ্র শেখরা, ৪২. রাজু সুন্দর, ৪৩. আলমাস কুমার, ৪৪. সুখে আলম, ৪৫. রূপ কুমার, ৪৬. আজব লীলা, ৪৭. রাম-বিরাম, ৪৮. সায়ফুল মুলুক, ৪৯. দিল পছন্দ, ৫০. ফিরোজ রোকেয়া, ৫১. মেহের নিগার, ৫২. শীত বসন্ত, ৫৩. বিদ্যা সাগর, ৫৪. মনোয়ার গোলাম, ৫৫. জহর মালা, ৫৬. পালোয়ান খান, ৫৭. সাহেবের বাপ, ৫৮. দেঙ্গু মিয়া, ৫৯. কাগাধারের খেলা, ৬০. জিবর মল্লিক, ৬১. দাতা হাতেম তাঈ, ৬২. দুবোরাজ, ৬৩. গোত্রের হালকী।[৯৩]

উপরোক্ত কাহিনীগুলির বেশিরভাগই রাজশক্তি ও অতিপ্রাকৃত গল্পের উপর ভিত্তি করে রচিত একটি মিশ্রিত রূপ। আর কিছু রয়েছে স্থানীয় লোককথাকে কেন্দ্র করে রচিত। বিষয়বস্তু হিসেবে রাজ-রাজারা ও রূপকথার পরীদের গল্পের মিশ্রিত রূপ নিয়ে গঠিত। সবগুলি আখ্যায়িকাই কল্প-কাহিনী উপকথা বা আখ্যায়িকা রূপে পরিচিত। এ সব আখ্যায়িকার মধ্যে রাজ শক্তি, যেমন- রাজা-রানী, মন্ত্রী, যুবরাজ, রাজার মেয়ে চরিত্রগুলি এবং অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বিষয়, যেমন- পরী, রাক্ষস, দৈত্য চরিত্রগুলির প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। এছাড়াও পারশ্য-হিন্দুস্তানের কিছু সংখ্যক আখ্যায়িকার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন- 'সায়ফুল মুলুক', 'দাতা হাতেম তাঈ', 'ইউসুফ জুলেখা', 'গুলে মনোয়ার', 'গুলে হরমুজ', 'মুসা নবীর জন্ম', 'হারুনুর রশীদ', 'আলমাস কুমার', 'মধুমালা', 'ইন্যাক (ইউনুস)-দিল পছন্দ', 'তাজ মিল্লিক বাদশা' এবং 'জয়নাল মিল্লিক' ইত্যাদি।

অপর দিকে মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মোট ৫৪টি পালা সংকলিত হয়েছে। ড: সেনের সম্পাদনায় Eastern Bengal Ballad: Mymensing (vo.1)- এ মোট ১০টি পালা নিয়ে ১৯২৩ সালে প্রথম খণ্ডে যে পালাগুলি প্রকাশিত হয় সেগুলি উদ্ধৃত করা হল : ১) মহুয়া, ২) মলুয়া, ৩) চন্দ্রাবতী, ৪) কমলা, ৫) দেওয়ান ভাবনা, ৬) দস্যু কেনারামের পালা, ৭) রূপবতী, ৮) কঙ্ক ও লীলা, ৯) কাজল রেখা, ১০) দেওয়ান মদিনা।[৯৪]

দ্বিতীয় খণ্ড : ১) ধোপার পাট, ২) মইষাল বন্ধ (১, ২, ৩), ৩) কাঞ্চন মালা, ৪) শান্তি, ৫) নীলা, ৬) ভেলুয়া, ৭) কমলা রানীর গান, ৮) মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা, ৯) মদন কুমার ও মধুমালা, ১০) সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, ১১) নেজাম ডাকাতের পালা, ১২) দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি, ১৩) সুরৎজামাল ও অধুয়া সুন্দরী, ১৪) ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।[৯৫]

তৃতীয় খণ্ড : ১) মঞ্জুর মা, ২) কাফেন চোরা, ৩) ভেলুয়া, ৪) হাতী খেদার গান, ৫) আয়না বিবি, ৬) কমল সদাগর, ৭) শ্যামরায়, ৮) চৌধুরীর লড়াই, ৯) গোপিনী কীর্তন, ১০) সুজাতনায়ার বিলাপ, ১১) বারভীর্ধের গান। (তৃতীয় খণ্ড- ২য় সংখ্যা)।

চতুর্থ খণ্ড - ২য় সংখ্যা : ১) নছর মালুম, ২) শীলা দেবী, ৩) রাজার ঘুর পালা, ৪) নূরন্নেছা, ৫) মুকুট রায়, ৬) ভারাইয়া রাজার কাহিনী, ৭) আন্ধা বধূ, ৮) বগুলার বারমাসী, ৯) চন্দ্রাবতীর রামায়ন, ১০) মধুমালা, ১১) বীর নারায়নের পালা, ১২) রতন ঠাকুরের পালা, ১৩) পীর বাতাসী, ১৪) রাজা বসন্ত, ১৫) মলুয়ার বারমাসী, ১৬) জীরালনী, ১৭) পরীবানুর হাঁহলা, ১৮) সোনা রায়ের জন্ম, ১৯) সোনা বিবির পালা।

এসব পালার মিশ্রিত জনসমাজ ও জনজীবনের ছবি ভাষারূপ পেয়েছে যাযাবর শ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ জীবন থেকে শুরু করে কৃষিভিত্তিক স্থায়ী জীবনের বিস্তৃত পরিধি পর্যন্ত। এদের কেউ সাপুড়ে, কেউ শিকারী, কেউ মৎস্যজীবী, কেউ মাঝি-মাল্লা, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ কৃষিজীবী। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত পালাগুলো লোকমুখে রচিত ও প্রচলিত।

---

[৯৩] পূর্বোক্ত

[৯৪] ড. আশরাফ সিদ্দিকী, পূর্ববঙ্গ : মমনসিংহ গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০

[৯৫] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত বর্তমানে পালাগানের যে পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাই, তা একদিনের সৃষ্ট নয়। বরং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়েই কাহিনী পরিণত রূপে নির্মিত হয়েছে। জীবিকা-সংগ্রহ রীতির ভিত্তিতে মানুষের সমাজকে যে চারটি পর্যায় (১.আহরণ ও শিকার যুগ, ২. পশু পালন যুগ, ৩. কৃষিযুগ ও ৪. শিল্প যুগ) রয়েছে, তার প্রথম তিনটি স্তরেই শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। এদিক থেকেও পালাগুলোর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে দ্বিধাহীন হওয়া সম্ভব। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর মানুষ, বেদে, শিকারী, জেলে, ওঝা, সাধু সন্ন্যাসী এরা যেমন ধীরে ধীরে এসে মিশে গেছে কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে, তেমনি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ জীবনের ঐতিহ্য সংস্কার ও বিশ্বাসের সূত্র ধরে তুক্-তাক্ যাদু-টোনা-মন্ত্র-ব্রত এগুলোও প্রভাব বিস্তার করেছে কৃষিজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। যার ছাপ গীতিকার বিভিন্ন পালাগুলিতে সুস্পষ্ট।

সমগ্র মধ্যযুগে একদিকে যখন মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান প্রভৃতির চর্চা চলছে, অন্যদিকে তখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে চলেছে নিজেদের জীবনভিত্তিক 'গাথা' রচনার প্রচলন। একই সমান্তরালে সাহিত্যের দুটি ধারা ক্রমশ বিকাশলাভ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সাহিত্যবোধ নিয়ে যারা সাহিত্য রচনা করেছেন বা যাদের জন্য সাহিত্য রচিত হয়েছে তাঁদের কাছে দেব-দেবী ও ধর্মকথাকে বাদ দিয়ে মানুষ তখনও বড় হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু অপর ধারাটিতে মানুষই সব কিছুর উর্ধ্বে। কোন দেবীর স্বপ্নাদেশে নয়, কোন সামন্ত প্রভু বা শাসকের আদেশ বা পুরস্কারের লোভে নয়, বিশেষ কোন ধর্মবোধের দ্বারা তাড়িত হয়েও নয়-বরং গীতিকার কবিরা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে নিজেদের আনন্দ-বেদনার কাহিনী নিজেদের ভাষায় নিজেদের জন্য রচনা করেছেন। এগুলো মানুষের জন্য মানুষের, নিজেদের জীবন কাহিনী-সমৃদ্ধ, নিজেদের তৈরী সাহিত্যকীর্তি। শুধু তাই নয়, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বৈষয়িক সমস্যা সংকটের চিত্র এখানে থাকলেও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তাঁদের হৃদয়ের কথা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগের কথা। যার প্রকাশে সজীব স্পন্দনে গীতিকাগুলো মুখরিত, শত নির্যাতনে নিষ্পেষণেও যার গতি রোধ করা যায় না। গীতিকার পালাগুলোর আবেদন তাই সার্বজনীন।

এ সমস্ত পালায় মানুষের যে জীবন ও সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ হতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এখানে জীবন অনেকটা ধর্মবন্ধন মুক্ত এবং স্বাধীন আবেগের দুর্দম-শক্তি চালিত।' বস্তুত মানুষের ব্যক্তি সত্তার, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা, তাঁর হৃদয়ের অনুভূতির কথা বলা হয়েছে গীতিকার বিভিন্ন পালায়। ব্যক্তি হৃদয়ের সংকট এখানে সমাজকে, গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। ধর্ম ও সমাজের অনুশাসনের বন্ধনে মানুষের হৃদয় ও আবেগ বন্দী নয়। পালাগুলোর প্রায় প্রধান নারী-পুরুষ চরিত্র তাঁদের হৃদয়াবেগকেই গুরুত্ব দিয়েছে, বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলো। মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যান্য ধারায় যখন মানুষ সবেমাত্র দেব-দেবীর আশ্রয়ে সাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে, সেখানে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের, তাঁর হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ও তাঁর স্বীকৃতির তখন প্রশ্নই আসে না। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন পালায় মানুষ বিশেষ করে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ঘোষণা, তাঁর হৃদয়ে অকপট প্রকাশ, তাঁর শক্তিমত্তা, বুদ্ধিমত্তা, প্রেমে একনিষ্ঠা ও ত্যাগে পরাকাষ্ঠার যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। এখানে প্রায় সমস্ত পালাগানই নারীর প্রেম-কাহিনী বিষয়ক। নারীর বিবাহ-পূর্ব প্রণয়, পরিণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, পরিণত বয়সে বিয়ে, সর্বোপরি প্রেমের নিঃসংকোচ প্রকাশ থাকায় ধারণা করা হয়- 'আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তির উপর এই গীতিকাগুলোর সমাজ জীবন মূলত পরিকল্পিত হয়েছিল।'[৯৬] তাই এসব পালায় আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এর কোন কোন কাহিনীতে সে সমাজের সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান-একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে এগুলো সেই সময়ের বা সেই সমাজেরই কাহিনী নয় বরং চিরন্তন গ্রাম বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও তাঁদের সুখ-দুঃখের কাহিনী। এখানে বাল্য-বিবাহ, গৌরীদান প্রথা-এ বিষয়গুলো তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না, একথা ঠিক। বিপরীতে, বরং নারীর মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীন প্রণয়বাসনার প্রকাশ লক্ষণীয়। তাই বলে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তখনও প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সমাজের উচ্চাসনে ছিল নারীর স্থান। বরং দেখা যায় পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা পুরুষের দ্বারা বিভিন্নভাবে হয়েছে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত। নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতানুযায়ী নারীকে পণ্যের মতো বিক্রি করা থেকে শুরু করে, বিনা অপরাধে তালাক দেয়া, দাসীর মতো ব্যবহার করা, মিথ্যে অপবাদে অভিযুক্ত করা, অপহরণ করা, একাধিক বিয়ে করা, নারীর প্রেমের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা ইত্যাদি সর্বপ্রকার অবিচার পুরুষেরা করেছে। এমনকি বিবাহোত্তর, জীবনেও পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি নারীর জীবনকে করেছে দুর্বিষহ, করুণ ও মর্মান্তিক। তা সত্ত্বেও পালার নারী চরিত্রগুলো বিশেষত্ব লাভ করেছে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে, নারী ধর্মের দৃঢ়তায়, প্রেমের একনিষ্ঠায়। প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, তাঁদের ব্যক্তিত্বময়তায়, চারিত্রিক দৃঢ়তায়, প্রেমে-নিষ্ঠায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায় এরা সত্যিই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

'নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব এবং বাংলার দেশজ নাট্যের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস' প্রবন্ধে ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন, "মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য ব্যতিরেকে অধিকাংশ সাহিত্যকর্মে, যেমন- মঙ্গলকাব্য ও ময়মনসিংহ গীতকায়, স্পষ্টভাবে বলিষ্ঠ নারী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সর্পদেবী মনসা ও শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর এর বিবাদের

---

[৯৬] ফাতেমা কাওসার, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চৌত্রিশ বর্ষ সংখ্যা, পৃ. ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনসার উপাসনায় বাধ্য হয়। অপর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বেহুলা, যে তাঁর মৃত স্বামীর গলিত লাশসহ ভেলায় চড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে দ্বিধা করে না এবং দেবতার দরবারে নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে তাঁদের মনতুষ্টি অর্জন করে স্বামী ও দেবরদের জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। অপরদিকে ময়মনসিংহ গীতিকায় ধর্মের উর্ধ্বে যে উদার মানবতাবাদের বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে, তাঁর গভীরেও নারী বিস্ময়করভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। মহুয়া এমনই এক নারী চরিত্র যে তাঁর প্রেমের জন্য সাহস ও একাগ্রতার বলে সকল পুরুষ চরিত্রকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে গেছে। অপর দিকে নাথ-গীতিকায় ডাকিনী (বৌদ্ধ সিদ্ধানারী) ময়নামতির সাক্ষাত মেলে, যে তাঁর সাধনাবলে অসীম জ্ঞান ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু জয় করে এবং জনগণের চেতনায় দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনসা, চণ্ডী, শীতলা ইত্যাদি মাতৃদেবীর উল্লেখিত ধারা একটি অনার্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিহ্ন বহন করে যাকে গুপ্তযুগ হতে শুরু করে প্রায় হাজার বছরের আর্য-সভ্যতার প্রলেপ দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা কঠিন হয়েছিল। তাই গীতিকা ও মঙ্গলকাব্যের উদাহরণ সমূহে নারীদের বিশেষ অবস্থান ও দেবীত্বে রূপায়ন এমন এক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি নির্দেশ করে যেখানে পিতৃতান্ত্রিকতা ও পিতৃঅধিকার সম্পূর্ণরূপে জয়ী হতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব অভিনয়কলার ক্ষেত্রেও নারীদের উপস্থিতি সংক্রান্ত অনুমান ভূল হবে না।"[৯৭] ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা জানতে পারি, সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব থেকেই তিব্বত, কোচবিহার ও কামরূপ হয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের গভীর অরণ্য, পাহাড়, টিলার উঁচু উঁচু স্থানে কৌমভিত্তিক (Tribal-Clan) স্বাধীন অঞ্চলে অস্ট্রালয়েড মঙ্গোলীয়রা সর্ব প্রথম বসবাস শুরু করে। ড. নীহার রঞ্জন রায় যাকে 'মহুয়া', 'মলুয়া'র দেশ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৮] কামরূপ রাজা বর্মার সময় ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র, যা ছিল প্রায় ১০ মাইল প্রশস্ত এবং যা শীতলক্ষ্যার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলবাসী মাতৃতান্ত্রিক কামরূপের প্রতি নামমাত্র আনুগত্য দেখিয়ে নিজেদের ছোট ছোট সামন্ত রাজ্য সৃষ্টি করে চলে। পরে বল্লাল সেন তথা ব্রাহ্মণ বিরোধীরাও শস্য সম্পদপূর্ণ এই অঞ্চলে আসতে থাকে। চলতে থাকে রক্ত মিশ্রণ-বহু গীতিকাতেই যার বর্ণনা পাওয়া যায়। অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর পরে আসে মঙ্গলীয় মাতৃতান্ত্রিক বডো জাতি, যারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কৃষিকর্মে ছিল পারঙ্গম-ভাটি অঞ্চলে তারা বড় বড় আল বেঁধে চাষ করতো। এদেরই উত্তর-পুরুষ ছিল বোকাইনগরে বোকাই কোচ, মদনপুরে মদনা কোচ, জঙ্গলবাড়িতে লক্ষণ হাজরা, এগারোসিন্দুরে বেবুইদ রাজা, যশোদলে গোবর্ধন রাজা, চারিপাড়ায় নবরঙ্গ রায়; সময়ের সঙ্গে যাদের অনেকের পদবিরও পরিবর্তন হয়। এরপরে আসে ব্রাহ্মণ্য শাসন কর্তৃক নির্যাতিত বৌদ্ধ, নাথ, যোগী, বাউল-যাদের কাছে নারী ছিল শ্রদ্ধেয় সাধনার বিষয় এবং সর্বশেষে ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীরগণ-যাদের চোখে ছিল সব মানুষ সমান, ছিল না জাতিভেদ, যাদের অনেকেরই অলৌকিক শক্তি দেখে বহু লোক ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এসব জলা-জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চলে সাপ, বাঘ ও বন্য জন্তুর প্রভাব থাকায় দেবী মনসা ও অন্যান্য আরন্যক অনার্য দেব-দেবীগণ পেয়েছেন প্রাধান্য-যা প্রায় গীতিকাতেই দেখা যায়। পরে হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর কাছে সত্যপীরের মত পীরগণ প্রাধান্য পান। কবি কঙ্ক রচনা করেন সত্যপীরের পাঁচালী। পূর্বাপরই এরা প্রকৃতিপূজারী, আপদ-বিপদকালে চন্দ্র-সূর্য, বৃক্ষ-লতা, পাখ-পাখালি এবং নদী-হাওরকে সাক্ষী রাখে-যা প্রতিটি পালাতেই প্রায় দৃশ্য হয়। তারা ছিল বাস্তববাদী, পরলোকের চেয়ে ইহলোকই তাঁদের কাছে ছিল শ্রদ্ধেয়, প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানকে তারা শ্রদ্ধা করেছে। এই ভূগোলের পরিধি ছিল শ্রীহট্ট কাছার পর্যন্ত বিস্তৃত।[৯৯]

পালাগুলির ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ফাতেমা কাওসার পূর্ব ময়মনসিংহের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশের দুর্গমতা ইত্যাদির কথা বলেন। তিনি বলেন, "ময়মনসিংহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে শাস্ত্র-ধর্মবন্ধন মুক্ত এক উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।"[১০০] এমনকি ব্রাহ্মণবাদী সেন রাজবংশ প্রবর্তিত বর্ণভেদ ও কৌলিণ্য প্রথার প্রভাব থেকেও পূর্ব ময়মনসিংহ মুক্ত ছিল। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা বা রাজনীতি থেকেও পূর্ব ময়মনসিংহ এলাকা বিচ্ছিন্ন ছিল। গীতিকার বিভিন্ন পালায় রাজনৈতিক দিকটি তাই একেবারে অনুপস্থিত। মোটামুটিভাবে স্বয়ম্ভর গ্রাম-সমাজ ছিল। সামাজিক বিভেদ প্রকট ছিল না, মোটামুটি সামাজিক ছিল। একারণে মৈমনসিংহ গীতিকায় পল্লীকবিদের কাছে ধর্মীয় কোন আদর্শ বা সংস্কার বড় হয়ে দেখা দেয়নি, কোন দেব-মূর্তিও তাঁদের সামনে ছিল না। তাঁদের রচনায় শুধুমাত্র রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, তাঁদের হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি ও অভিব্যক্তির কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে যে ধর্মের কথা উচ্চারিত হয়েছে, যে ধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে তাহলো মানব ধর্ম। জাতি-ধম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষই এখানে বড়। হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ-নীতির সামান্য ছাপ থাকলেও চরিত্রগুলোর হৃদয়ের পরিচয়ই গুরুত্ব পেয়েছে। শাশ্বত মানবীয় আবেগ ও মূল্যবোধই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ধর্ম-শাস্ত্র-সমাজ তাঁদের আবেগের অনুসারী হয়েছে মাত্র।

---

[৯৭] ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, সাহিত্য পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা-সাইত্রিশ বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৪৬

[৯৮] নিহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৬

[৯৯] ড. আশরাফ সিদ্দিকী, আমাদের গীতিকা সাহিত্য, সাহিত্য সাময়িকী-যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা-শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর ২০০১

[১০০] ফাতেমা কাওসার, মৈমনসিংহ গীতিকা'র জনজীবন, সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা-চৌত্রিশ বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে মৈমনসিংহ গীতিকার যে গীতিকাগুলি পালাগান রূপে পরিবেশিত হয়ে আসছে, সেগুলির বেশিরভাগের মধ্যে সওদাগরদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রার কোন না কোন রকম বা বিবরণ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। যেমন- পালাগান (বগুড়া অঞ্চল) -সন্যাসীর নির্দেশে যুবরাজ আলমকে বারো বছরের জন্য বাণিজ্যে প্রেরণ, কেচ্ছাকাহিনী গানে (পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চল) ছয় ভাইয়ের বাণিজ্য যাত্রা, মারমা উপজাতিদের পরিবেশিত 'জ্যা' নাট্যরীতিতে মমছম খাঁ সওদাগরের উল্লেখ, রয়ানী গানে চান্দ সওদাগরের বাণিজ্য বিবরণসহ আলকাপ গান প্রভৃতি আখ্যায়িকায় বাণিজ্য যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। ড. আশরাফ সিদ্দিকী পালাগান রূপে পরিবেশিত এসব গাথায় বাণিজ্য যাত্রার বিশ্লেষণাত্মক বিবরণে গাথাগুলির রচনা কাল সম্পর্কে কিছুটা হলেও আমরা অবগত হতে পারি। যেমন- 'গারুয়া পাহাড় হইতে দক্ষিণ সাগর /ঘরবাড়ি নাহি কোন নল খাগড়ার গড়।' বোঝা যায় এসব পথেই গুপ্ত বৌদ্ধ যুগের ব্যবসায়ী সওদাগরগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে বড় বড় সওদাগরী (কখনও জাহাজপ্রতিম) নৌকা ভাসাতেন পূর্ব ও পশ্চিমে-আসাম থেকে মালয়ে ব্রহ্মদেশে-যা বহু গীতিকা পাঠেই অনুমিত হয়। আরও বর্ণনা পাই পূর্বকালে মাহাস্থান ও গাংনগর মেলা হয়ে এসব বাণিজ্য তরী দূর দূর দেশে যেত।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সত্যনারায়নের পাঁচালীতে পাই-

ধনপতি যেয়ে উঠিল নায়।
খুলিল বহর দক্ষিণ বায়॥
সিংহল যাইতে করিল মনে।
বাহিছে তরণী রজনী দিনে॥
কামাখা হইতে ছাড়িল তরি।
আশেপাশে রাখ কতেক গিরি॥
ব্রহ্মপুত্র ছাড়ি লাক্ষাতে পাড়ি।
আসিয়া বাঁধিল বাদাম দাঁড়ি॥
মেঘনাতে ডিঙা ধরিল বলে।
বদর বদর নেয়েরা বলে॥ [১০১]

বেদে যে পণিজাতির, তার উল্লেখ দেখা যায়-যারা ছিল সমুদ্রচারী, নৌবিদ্যা বিশারদ, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী ইত্যাদির বর্ণনায়। সম্ভবত তারাই পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করে ব্যবসা বাণিজ্যে বিপুল খ্যাতির অধিকারী হয়ে বাংলার ঐতিহ্যকে বিশ্ব প্রসারী করে। তারও পরে গুপ্ত যুগে তাঁদের প্রদর্শিত পথেই বাংলার বণিকগণ দেশে দেশে বিস্তার করে চলে বাণিজ্য-ব্যবসা।[১০২]

ত্রয়োদশ শতকে ময়মনসিংহের কবি কানাহরি দত্তের যে মনসামঙ্গল পাওয়া যায় তাতেও এই সমুদ্র যাত্রার বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, 'গুপ্ত ও পাল রাজত্ব বৈশ্য প্রাধান্যের যুগ, তখন বণিকরাই প্রধান ছিলেন।' এ কারণেই দেখা যায়, এ যুগের লোককাব্যের নায়ক রাজা মহারাজা নয়, বণিক চাঁদ সওদাগর, ধনপতি সওদাগর অথবা শ্রীমন্ত সওদাগর প্রভৃতি চরিত্র। উদাহরণ স্বরূপ গীতিকাতে চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দডিঙ্গা মধুকরের বর্ণনা পাওয়া যায় তা উদ্ধৃত করা হল :

পরথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সেই না-এ চলিল লক্ষের সওদাগর॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজু সিজু।
গাঙ্গের দুইকূল ভাঙ্গিয়া বেকা করে উজু॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি।
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা ভাড়ার পাটুয়া।
যেই না-এ উঠাইয়া লইল তাম্বুলের নাটুয়া॥
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শঙ্খচূড়।
সমুদ্রের দুইকূল পাতালে ঠেকে মুড়া॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা অজয় শেলপাট।
যাহার উপর মিলিয়াছে শ্রীফলার হাট॥

---

[১০১] পূর্বোক্ত, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, সাহিত্য সাময়িকী, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ৭ই ডিসেম্বর ২০০১
[১০২] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

তার পাছে বাওয়াইল নামে টিয়াঠুটি।
সেই না-এ ভরে সাধু পাট আর ভুটি॥[১০৩]

এভাবে চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দডিঙ্গার বর্ণনা পাওয়া যায়। চৌদ্দডিঙ্গার বর্ণনার মধ্যে শুধু বিভিন্ন প্রকার নৌকার বর্ণনাই নয়, সে যুগের নৌযাত্রার সঙ্গে যে সব সংস্কার ছিল, এই যেমন- শত শত পাঠাবলি ইত্যাদির বর্ণনাও এসব গীতিকাতে রয়েছে। কোন কোন নৌকা এত বড় ছিল যে গাঙ্গের বাঁকা দুই কূল ভেঙ্গে ভেঙ্গে সোজা করে চলতো, কোন কোন নৌকায় দাঁড়ালে লঙ্কাপুরী পর্যন্ত দেখা যেত। আবার কোন কোন যাত্রায় তারা সস্ত্রীকও যেতেন, নৃত্যগীতের ব্যবস্থা থাকতো। পঞ্চদশ শতকে রচিত 'রাজা তিলক বসন্ত পালা'তে সওদাগরদের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ যুগের সওদাগরদের সেই পর্বত সমান মহান চরিত্র যেন অধোগামী বলে মনে হয়। তারা পরনারীতে মগ্ন হয়েছে এবং তার ফলও তারা ভোগ করেছে। বীর নারায়নের পালাতে আমরা দেখি 'ভরা লইয়া সাধুর ডিঙারে আহা পবনের আগে ধায়...।' এখানেও সাধুদের নারীলোভের চিত্র পাই। প্রায় প্রতি পালাতেই অরণ্য সঙ্কুল বনে নায়ক-নায়িকা পালিয়ে গিয়ে দিন যাপন করে, বন্য প্রানীর সাথে তাঁদের বন্ধুত্ব হয়। এছাড়াও প্রায় প্রতিটি পালাতেই দেখা যায় নায়িকারা প্রকৃতিপ্রেমী, বিপদকালে দেবদেবী নয়, চন্দ্র-সূর্য-তারা, বৃক্ষ-লতা, নদ-নদী, পশু-পাখী, আকাশ-বাতাসকেই সাক্ষী মানে, যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই ধারা-যা প্রায় সকল গীতিকাতেই রয়েছে। তাঁদের কাছে সবার উপরে হল প্রেম। পবিত্র প্রেম। এই প্রেমের কাছেই তারা দায়বদ্ধ-যা বিশ্ব গীতিকার সাথে আমাদের গীতিকাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

গীতিকার বিভিন্ন পালায় নারী চরিত্রের-পুরুষের প্রেমের এই অপূর্ব মহিমান্বিত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে পল্লীকবির সহজ সরল অনবদ্য প্রকাশভঙ্গিতে। সেখানে পল্লীরমণীর জীবনের ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমকাহিনী, তাঁদের করুণ জীবনের বর্ণনা কবিগণ দর্শক-শ্রোতার সামনে উপস্থাপন করতে গিয়ে নারীদের সামাজিক অবস্থান, প্রাত্যহিক জীবনাচরণ, তাঁদের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু বাইরের অত্যাচারের কাহিনী নয়, হৃদয়ানুভূতির উপর নির্যাতনের করুণ কাহিনীও ঠাঁই পেয়েছে এসব পালায়। মানুষ হিসেবে নারীর হৃদয়বৃত্তিজাত আবেগকে উর্ধে স্থান দিয়েছেন পালাকারগণ। সমাজে কিংবা জীবনে না হলেও অন্তত পালাকারদের রচিত গানে নারী তাঁর মূল্য পেয়েছে। গীতিকার নারী চরিত্রগুলো তাই এত উজ্জ্বল ও প্রাণময়।

তবে নারীজীবনের প্রেমকাহিনী মূখ্য বিষয় হলেও আপামর মানুষের বিচিত্র অনুভূতি ও অভিব্যক্তির প্রকাশে পালাগুলো সমৃদ্ধ। রাগ, ক্রোধ, হিংসা ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা মানুষের প্রবৃত্তিরই কুৎসিত অথচ বাস্তব দিক। মানুষের হৃদয়ের প্রেম-ভালোবাসা যেমন সত্য, এই নেতিবাচক দিকগুলোও তেমনি সত্য। কাজেই এগুলোকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পালাকারগণ বহুমুখী ও বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্রগুলোকে দর্শক-শ্রোতার জন্য তুলে আনতে পেরেছেন তাঁদের অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা। সমাজকে, সমাজের মানুষকে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা তাঁদের চারপাশের প্রাত্যহিক জীবন ও জগৎ থেকেই কাহিনী ভাব, ভাষা, চরিত্র ইত্যাদি সবকিছু সংগ্রহ করেছেন। ফলে কোনরূপ কৃত্রিমতা এখানে ঠাঁই পায়নি। অকৃত্রিমতাই পালাগুলোর প্রধান গুণ। কাহিনী নির্বাচনে, ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে প্রতিটি ক্ষেত্রে কবিগণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের গভীরতার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই উল্লেখ করার মত।

বর্তমানে উপরোক্ত সবগুলি গীতিকাই পালারূপে গ্রাম-বাংলায় পরিবেশিত হয়ে আসছে। গীতিকার বেশিরভাগই ধর্ম নিরপেক্ষ প্রেম বিষয়ক। মৈমনসিংহ গীতিকার অবলম্বন সহজ প্রেম। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, "মৈমনসিংহ গীতিকার চরিত্রগুলি হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে, কারণ হিন্দুর সমাজ নীতি যেমন ইহারা স্বীকার করে নাই, মুসলমানের সমাজ নীতিও ইহাদের মধ্যে অস্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ইহাদের যদি কোন পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, ইহারা মানুষ। সেই জন্য ইহাতে উচ্চবর্ণের বলিয়া পরিচিত নায়ক, নিম্নবর্ণের বলিয়া পরিচিত নায়িকার জন্য জীবন উৎসর্গ করে। যেখানে ইহাদের কোন বিশেষ সামাজিক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানেও বিশিষ্ট কোন সমাজের শাসন দ্বারা তাহাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তি দ্বারাই তাহাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।"[১০৪] এছাড়াও এসব গীতিকার মধ্যে নারীর একটি অপূর্ব শক্তির পরিচয় লাভ করা যায়। তাঁদের এই শক্তি প্রেমের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে-প্রেমের জন্য দুঃখ, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ, সর্বসমর্পণ করে নারী যে কি অপার মহিমা লাভ করতে পারে গীতিকাগুলিই তার প্রমাণ।

---

[১০৩] পূর্বোক্ত

[১০৪] সৈয়দ আজিজুল হক, মৈমনসিংহ গীতিকা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫৮

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানেও বাংলা লোকনাট্য পালাগানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অভিনয় করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ রাজশাহী অঞ্চলের 'আলকাপ', ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'বাইদ্যানির গান' বা 'মাইট্যা তামাশা' ও 'ঘাটুগান' এবং রংপুর অঞ্চলের 'ছোকরা নাচ' ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব অভিনয় অনুষ্ঠান (Performance) এ পুরুষ কুশীলব অভিনয় ও নাচের পাশাপাশি গানও গেয়ে থাকেন। কুশীলবদের বয়স ১৪ বছরের কাছাকাছি, এরা শাড়ি ও লম্বা পরচুলা ব্যবহার করে থাকে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বড় চুল রাখেন। ঘাটু গানে সাধারণত চার থেকে পাঁচজন ছেলে সমবেত গান ও বাজনার সাথে নেচে গেয়ে মুকাভিনয় ঢং এ চরিত্রাভিনয় করে থাকে। গানগুলো মূলত আদিরসাত্মক।[১০৫] যেমন-

"বাঁশী বাজে কোন্ বন।
রাধা বইলে বাজে বাঁশী শোন সখীগণ॥
সখীর সহিতে রাই আছিল বসিয়া।
হেন কালে শ্যামের বাঁশী উঠিল বাজিয়া॥"[১০৬]

যদিও এসব অভিনয় অনুষ্ঠান ধর্মীয় আচারের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তবু সাধারণভাবে এর মূল বিষয় হয়ে থাকে রাধা কৃষ্ণের উপাখ্যান। ঘাটু দল গাইতে পারে এমন ছেলেকে দলে নেবার জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকে। এসকল ছেলেরা দলনেতা, যিনি সাধারণত প্রাক্তন অভিনেতাও বটে তাঁর অধীনে তালিম নেয় এবং মাসিক মাসোহারা পায়।

ঘাটুগানের মতো একই পরিবেশনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত 'ছোকরা নাচ' ধর্মীয় আচার সম্পর্কিত নয় বরং আদিরসাত্মক আবেদনের জন্য খ্যাত। ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত বাইদ্যানির গানে 'সং নাচ' অন্তর্ভুক্ত এবং নারী ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রায় আশি বছর আগে পদ্মার পূর্বপারের বাংলায় বাইদ্যানির গান ছিল ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সে সময় বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে মহুয়া উপাদান ভিত্তি করে শখের অভিনয় পরিবেশনার যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, নিম্নে উদ্ধৃত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে লোকগীতি (ঘোষা গান) হতে সেটি অনুমান করা সম্ভব :

"মামু হইল উমারা বাইদ্যা, ভাইগনা বাইদ্যানি
ভাতিজা উঠিয়া বলে চাচা আমি লবজানি॥"[১০৭]

বর্তমানে 'আলকাপ' ও 'বাইদ্যানির গানে' যে সকল নারী কুশীলব অভিনয় করেন, তারা যাত্রা অভিনেত্রীদের মতোই সামাজিকভাবে নিঃগৃহীতা এবং নষ্টা হিসেবেই চিহ্নিত।

লোকনাট্যের শাখা সমূহের মধ্যে 'অষ্টক', 'রয়ানি গান', 'সং নাচ', 'পদ্মাপুরাণ', 'জারী' ও 'ভাসা গান' এ নারী কুশীলবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এসবের মধ্যে 'রয়ানি গান' সম্ভবত আদি হতেই নারী কুশীলব দ্বারা অভিনীত হয়ে এসেছে। রাধা কৃষ্ণ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব উপাখ্যান কেন্দ্র করে পরিবেশিত অষ্টক মূলত ধর্মীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত। 'অষ্টক' দলে সাধারণত চারজন কিশোরী থাকে যারা পুরুষ গায়ক দলের সাথে মুকাভিনয় করে কিন্তু 'অষ্টক' যে শুধু নারী কুশীলব দ্বারাই পরিবেশিত হয় তা নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পুরুষ কুশীলব দ্বারা দল গঠিত এবং পুরুষ ও নারীদের সম্মিলিত দলের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়। অপরপক্ষে 'রয়ানী গান' এ মূল গায়েনের ভূমিকা সাধারণত নারী কুশীলবেরাই পালন করেন। বেহুলা লখিন্দর আখ্যান ভিত্তি করে সর্পদেবী মনসার উদ্দেশ্যে নিবেদনকৃত এসকল অভিনয় অনুষ্ঠান মূলত বরিশাল অঞ্চলেই দেখা যায়। এ অঞ্চলে সূচিত্রা সার্বাগ্য, রাধালক্ষ্মী, মীরা রানী প্রভৃতি মহিলা গায়েনদের নেতৃত্বে কয়েকটি রয়ানি দল রয়েছে। রামায়ণ গান সাধারণত পুরুষ কুশীলব দ্বারা গঠিত হলেও একটি ব্যতিক্রম হল নেত্রকোনার বিভারানী দাস পরিচালিত দলটি।

বেহুলা-লখিন্দর আখ্যান ভিত্তি করে পরিবেশিত অপর একটি অভিনয় অনুষ্ঠান 'ভাসান গান'। উপরোল্লিখিত এসকল নাট্যরীতি একটি বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। তাহল সংগীত। কোন ধর্মীয় আখ্যান যেমন- 'মনসা পালা', 'ভাসান যাত্রা', ইত্যাদি বা ধর্ম নিরপেক্ষ উপাখ্যান বা কাহিনী অথবা প্রেম বিষয়ক যে কোন কাহিনীই পালাগানের বিষয়বস্তু হতে পারে।

---

[১০৫] ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১০৬-৮

[১০৬] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী 'গাঁড়ু গান', বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন : ৫৩, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ১৩০

[১০৭] শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ-গীতিকা, সং-১৯৭৩, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

পালাগানের প্রকৃতি এখানে জীবন্ত, চরিত্রসমূহের জীবন সংগ্রামের সহায়ক শক্তি। মানব অনুভূতির সঙ্গে পরস্পরিত করে উপস্থাপিত হয়ে প্রকৃতি চিত্রায়িত হয়েছে নরনারীর প্রিয়-বিরহকাতর বারমাসী দুঃখ বর্ণনারসূত্রে, প্রকৃতির নানারূপ ব্যবহার সম্পর্কে।

আমরা জানি সমাজের মানুষের উপভোগের জন্যই গ্রামীণ জীবনের কবি কর্তৃক এসব পালা রচিত। সমাজের মানুষের সমর্থন নিয়েই এ-পালাগুলো প্রচলিত হয়ে এসেছে। কাজেই কাহিনীর বাস্তবতা এবং এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল একটি বড় প্রশ্ন। এসব কাহিনীর মধ্যে সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছে-এটা ধারণা করা স্বাভাবিক। কাহিনীর পরিণতিতেও জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশারই ছাপ রয়েছে হয়তো। এভাবেই জনগণের কাছে কাহিনী গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। গায়েন যখন কাহিনী উপস্থাপন করেন তখন সেই কাহিনীর চরিত্র কিংবা বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শক যদি নিজেদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও বাস্তব অবস্থার ঐক্য খুঁজে পায় তাহলে সেই কাহিনীর সাথে দর্শকদের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কাহিনীর চরিত্র-সমূহের যে জীবন-যন্ত্রণা ও সংকট, তার সাথে দর্শক ও কথকের বর্ণনার একাত্মতা ঘটলো কিনা তার উপরেও কাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। গায়েনের বর্ণিত কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের যোগসূত্র এবং একাত্মতা আলোচ্য পালাগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই কার্যকর। পুরুষানুক্রমে এগুলো তাই প্রচলিত হয়ে এসেছে মুখ থেকে মুখে। ড: দীনেশ্চন্দ্র সেনের মতে, "পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, সে সকল অবাধ ও অপ্রতিহত যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে-সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।"[১০৮]

গীতিকার এই পালাগুলি কখনই সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে জনবিচ্ছিন্ন কাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠেনি। কৃষিনির্ভর সামন্তবাদী সমাজ জীবনের প্রায় সর্বস্তরের জনমানবের চিত্রই এখানে রয়েছে। বস্তুত গীতকার বিভিন্ন পালার কাহিনী বিন্যাস এমন যে, সমাজ জীবনের সর্ব পর্যায়ের মানুষ এখানে উঠে এসেছে। কাহিনীর প্রয়োজনেই এরা এসেছে নিজ নিজ ভূমিকায়।

নারী ও পুরুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও রক্তের বন্ধনসূত্রে গড়ে ওঠা সম্পর্কের আওতাভুক্ত সবাই এখানে এসেছে। অর্থাৎ একজন নারী বা পুরুষ তাঁর জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পর্যায়ে যতগুলো ভূমিকা গ্রহণ করে তার সবগুলোই গীতিকার পালায় ঠাঁই পেয়েছে। শুধু তাই নয়, গীতিকার মানুষকে সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থানের দিক থেকে শ্রেণীকরণ করা হলেও দেখা যাবে, তাদের শ্রেণীচরিত্র এক নয়, বহুবিধ এবং বিচিত্র। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে প্রথমেই যে দুটো শ্রেণীচরিত্রের ছবি ভেসে ওঠে, তাহল উচ্চ-শ্রেণী এবং নিম্ন-শ্রেণী। পেশাগত, বংশগত এবং ঐশ্বর্য্যগত দিক থেকে এ ভেদাভেদ গড়ে উঠেছে। সর্বস্তরের জীবন সংবলিত পালাগানের এসব কাহিনী বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী জাতীয় সম্পদ। পীর, ব্রাহ্মণ, শুদ্র, দেওয়ান, জমিদার, নফর, পণ্ডিত, রাখাল, ডাকাত, বেদে-বেদেনী কিষাণ-কিষাণী সবাই মৈমনসিংহ গীতিকার নায়ক-নায়িকা, পাত্র-পাত্রী।'[১০৯] এই বিচিত্র শ্রেণীর জনজীবনকে ঘিরেই পালাগুলোর কাহিনীর বিন্যাস ঘটেছে। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, শিকারী-জেলে, দাস-দাসী সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় রয়েছে এ সমস্ত পালায়।

এ সমস্ত চরিত্র ছাড়াও আরও কিছু চরিত্র কাহিনীর প্রয়োজনে চারপাশে এসছে। দেওয়ান স্ত্রী, উজির-নাজির, বেপারি, রাখাল শ্রেণী, বিচিত্র মাধব, মুরারী চণ্ডাল, মাঝি-মাল্লা, দাসী-বাঁদী এরাও সমাজ অন্তর্গত জনজীবনের একাংশ।

বস্তুত বিভিন্ন পালায় চিত্রিত জনজীবনের যে পরিচয় বিধৃত তা গ্রামীণ সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের। আর তাঁদের চরিত্রায়ণে সমকালীন সমাজ জীবন ও জনমানসেরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। পালাকারদের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে এ সমস্ত চরিত্র চিত্রণে।

লক্ষণীয় যে, পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের প্রতি কবির আকর্ষণ ও সহানুভূতি বেশি। প্রায় প্রতিটি পালা-ই নায়িকা প্রধান এবং তাঁদের চরিত্রই বেশি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'এই পালাগানের নায়িকাগুলির চরিত্র পাঠ করে মনে হচ্ছে যেন অজন্তা গুহার চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ইহাদের লীলায়িত ভঙ্গি ও লাস্যের মনোহরিত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।'[১১০] প্রণয়ে একনিষ্ঠ, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা ছাড়াও শত অত্যাচার ও প্রতিকূল অবস্থাতেও অবিচল থাকার দৃঢ়তা, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও আত্মত্যাগে গীতিকার

---

[১০৮] পূর্বোক্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ-গীতিকা, সং-১৯৭৩, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

[১০৯] আলি নওয়াজ, ময়মনসিংহ গীতিকা, ময়মনসিংহ, ১৯৭৮, পৃ. ৫৬

[১১০] ফাতেমা কাওসার, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র জনজীবন, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চৌত্রিশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৯২-১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

নারী চরিত্রে যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে, জীবনতৃষ্ণার যে ব্যাকুল উদ্দীপনাময় প্রচেষ্টা রয়েছে তা অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রেই নেই। নারীর শক্তি তাঁর প্রেমে, তাঁর নারীধর্মের গৌরবে। সে তুলনায় পুরুষ চরিত্র অনেক নিষ্প্রভ। নারীর দুঃখ বেদনা ও ত্যাগের সঙ্গেই কবি অন্তরঙ্গ হয়েছেন বেশি। তবে পুরুষ চরিত্র চিত্রণেও কবি অমনোযোগ বা প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করেননি। নারীর দুঃখ বেদনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন সত্যি, কিন্তু তাই বলে কোন পক্ষপাত অবলম্বন করেননি।

সমাজের উঁচু শ্রেণীর বা অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে কবিদের তিক্ততাপূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে প্রায় ক্ষেত্রেই। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ এখানে খেয়ালী, অত্যাচারী, অহংকারী নারীলিপ্সু রূপেই চিত্রিত এবং পুরুষ শাসিত সমাজে স্বভাবতই পুরুষ আর তাঁদের খেয়ালীপনা, অত্যাচার ও লালসার শিকার নারী। নারী তাঁদের সে লালসাতুর ইচ্ছাকে চরিতার্থ করে না বলেই পদে পদে বিপদ, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। যদিও এখানে প্রায় প্রতিটি নারীই পরিণত বয়সের। তারা স্বাধীন ও মুক্ত জীবনাকাঙ্খায় বিশ্বাসী, প্রণয় বাসনা ও পরিণয়ে স্বাধীন মাতমত প্রকাশ করছে-কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল। বরং হাজারো বাধা বিপত্তি, রক্তচক্ষুর শাসনে ও নিষ্ঠুরতায়, নির্যাতনে নিপীড়নে নারীর জীবন হয়ে উঠেছে কন্টকাকীর্ণ, বেদনাময়। নারীর জীবনের সেই বেদনার করুণ কাহিনীই ঠাঁই পেয়েছে পালাগুলোতে। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণ ও জীবনাচারণের বর্ণনা অনেকটা কষ্ট কল্পিত। তাঁদের জীবনে বহিরাবরণই কবির কাছে প্রত্যক্ষ, মনোজগতের কোন সন্ধান কবিরা জানেন না। চোখে দেখা কোন ভূস্বামীর চরিত্র ও জীবনযাত্রার চিত্রই জমিদার-দেওয়ান-সওদাগর সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন হয়তো। আসলে অভিজাত শ্রেণীর সাথে রচয়িতাদের ছিল সীমাহীন পার্থক্য, তাই অভিজাততন্ত্রের জীবনধারা তাঁদের কাছে ততোটা সুস্পষ্ট ছিল না।[১১১] বরং সাধারণ চরিত্রগুলো এবং তাঁদের জীবনাচরণ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং অধিকতর সহজবোধ্য ছিল। এজন্য সাধারণ মানুষের জীবন ও চরিত্রায়ণে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন এবং স্বভাবতঃই তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের বর্ণনায়। অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রায়ণ ও জীবনধারা বর্ণনায় এ স্বাচ্ছন্দ্য ধরা পড়ে না। অবশ্য প্রতিটি চরিত্রই স্ব-স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ। জমিদার, দেওয়ান, কাজী, ব্রাহ্মণ, কৃষক, সওদাগর, সাধু-সন্ন্যাসী, মাঝি-মাল্লা, বেদে, জল্লাদ এরা সবাই স্ব-স্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবনাচরণে তাঁদের সামাজিক অস্থানগত দিক থেকে স্বতন্ত্র। বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলো পুরো সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। মা-স্ত্রী-প্রণয়িনী থেকে শুরু করে ভাবী, বোন, সতীন, সৎ-মা সব ধরনের চরিত্রই রয়েছে ভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে। এরা তাই কোন কোন ক্ষেত্রে অভিন্ন হলেও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিত্রিত।

আমাদের সমাজ ও পরিবেশ জীবনের প্রায় প্রতিটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন পালাগানের বিষয় হিসেবে। সমাজের প্রচলিত রীতি, বিশ্বাস-সংস্কারের বিপরীতে দাঁড়া করানো হয়েছে ব্যক্তি মানুষকে। বিশেষ করে দেবী যেখানে সামন্ত শ্রেণীর প্রতিভূ, মানুষের পক্ষে নারী সেখানে মুক্তি, শান্তি ও মানবতার প্রতীক। সমাজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ যান্ত্রিকতার বিরূদ্ধে উচ্চাসনে স্থান দেয়া হয়েছে মনুষ্য প্রেম, মূল্যবোধ ও মানবিকতাকে। যারফলে পালার আবেদন হয়েছে সার্বজনীন। কিন্তু পালাগানের পরিবেশনাগত উদ্দেশ্য বিচার করলে কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। প্রথমত আনন্দ বিনোদন, দ্বিতীয়ত লোকশিক্ষা বা জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কর্ম-সঙ্গীত। কর্ম-সঙ্গীতের দল হিসেবে আমরা ঘাটু দলের সন্ধান পাই। লোকশিক্ষা বা জনসচেতনায়নের উদ্দেশ্যে তারী গান, যোগীর গান, গম্ভীরা গান এবং পালাগান (পূর্ব ময়মনসিং) এর সন্ধান পাই। তবে লোকশিক্ষা ও জনসচেতনায়নে শেষোক্ত দুটির প্রয়োগ বেশি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বাকী নাট্যরীতিগুলি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে, আনন্দ-বিনোদনে এবং বিশেষ উৎসাদিতে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

৪.২. পালাগানের ছন্দ

সার্বিক আকারে প্রযোজনার ছন্দ ধরতে বা বাধতে লোকনাট্যে গান একটি বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এই গানের কথাগুলির বেশির ভাগই পদ -এ তৈরী করা হত। পদ তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, শুনতেও ভালো লাগে। সাধারণত তিন রকম ছন্দের পদ প্রচলিত।[১১২] তার মধ্যে পয়ার নামের ছন্দের ব্যবহারই বেশি দেখা যায়।

পালাগানে বিভিন্ন রীতি পরিবেশনার আলোচনাকালে অভিনয় উপাদান-অংশে ছন্দ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই কিছুটা ধারনা লাভ করেছি। যেমন- সংলাপাত্মক গীত, বর্ণনাত্মক গীত ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনাত্মক গীত যেমন- একপদী চরণের বর্ণনাত্মক গীত, পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাত্মক গীত, পালা অনুসার বা একান্তরমূলক বর্ণনাত্মক গীত,

---

[১১১] ড. আশরাফ সিদ্দিকী, 'আমাদের গীতিকা সাহিত্য', সাহিত্য সাময়িকী-যুগান্তর দৈনিক পত্রিকা, ঢাকা-শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর ২০০১

[১১২] নিত্যানন্দ বিনাদ গোস্বামী , প্রাচীন কাব্যের ছন্দ, বাংলাসাহিত্যের কথা, ১৩৯৯, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

কোরাস বা সম্মিলিত বর্ণনাত্মক গীত। এছাড়াও রাধালক্ষ্মীর দলে 'রয়ানী গানে'র পরিবেশনায় পূর্বেই আমরা গীতের পদ বিন্যাসে তিন ধরনের ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হয়েছি। যেমন- ক) প্রতিটি চরণ শেষে সংক্ষিপ্ত ধুয়া পরিবেশনা হল একপদী ছন্দ, খ) দুই চরণে পরিবেশিত পদ হল দ্বি-পদী ছন্দ আর গ) তিনটি চরণ সমন্বয়ে গঠিত পদ হল ত্রিপদী ছন্দ। এছাড়াও পালাগানের ছন্দ বিচারে আরও কিছু নাম শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- পালাগানে ছন্দ আলোচনায় আমরা প্রায়ই 'পয়ার' এর ব্যবহার পেয়ে থাকি। এখানে পয়ার এর বৈশিষ্ট্য হল : পয়ার এ দুই পদের অন্তেমিল থাকে এবং দুটি সম্পূর্ণ চরণে বাক্য পূর্ণতা পায়। পয়ার এর ছন্দগত বৈশিষ্ট্য ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রা। যেমন-

কলির ব্রাহ্মণ আর। বলির ছাগল।
ভালোমন্দ জ্ঞান নাই। প্রশ্রয় পাগল॥[১১৩]

এছাড়াও পয়ারের মাত্রাগত বিভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- লঘু ত্রিপদী ছন্দ : ৬ + ৬ + ৮ = ২০ মাত্রা। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ : ৮ + ৮ + ১০ = ২২ মাত্রা অথবা ৮ + ৮ + ১২ = ২৮ মাত্রা প্রভৃতি। যেমন-

লঘু ত্রিপদী :

চিনিতে না পারি না করো চাতুরী
বেহুলা বট গো তুমি।
দেহ পরিচয় জুড়াক হৃদয়
তোমার শাশুড়ী আমি॥[১১৪]

দীর্ঘ ত্রিপদী :

কহেন বেহুলা সতী করো বীর অবগতি
মোর সম নাই অভাগিনী
সায় সদাগর পিতা অমলা আমার মাতা
মোর নাম বেহুলা নাচনী॥[১১৫]

লক্ষ্যণীয় হল, ত্রিপদী ছন্দের প্রতি পংক্তিতে তিনটি করে পদ রয়েছে; লঘু ত্রিপদীর তিন পদের মাত্রাসংখ্যা ছয়, ছয় ও আট এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর তিন পদের মাত্রাসংখ্যা আট, আট ও দশ অথবা আট, আট ও বারো। এইরকম বিভিন্নমাত্রা বৈচিত্যের পয়ার পালাগানে লক্ষ্য করা যায়।

আর মিত্রাক্ষরে প্রত্যেক পংক্তির শেষে একটি করে পূর্ণ যতি থাকে। ফলে এক-এক পংক্তিতেই এক-একটি ভাব প্রায় শেষ হয়ে যায়। পাশাপাশি মিত্রাক্ষর/ অমিত্রাক্ষর শব্দগুলিও এ প্রসঙ্গের আলোচনা যোগ্য। মিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্তির শেষে একটি করে পূর্ণ যতি থাকে। সুতরাং এক-এক পংক্তিতে এক-একটি ভাব প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়। যেমন-

মনের দুঃক্ষু মিটিয়াছে মিটিয়াছে আশা
দেখিলাম বন্ধুর মুখ মনের ছিল আশা।
সুখেতে থাকো গো বন্ধু সুন্দর নারী লৈয়া,
সুখে করো গিরবাস জনম ভরিয়া।
না লইয়ো না লইয়ো বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম,
তোমার চরণে আমার শতেক পরমান।
এই না ঘাটেতে আছে পাতার বিছানা
সুখেতে রজনী দোয়ে করেছি বঞ্চনা।
মনে না রাখিয়ো রে বন্ধু সেই দিনের কথা
আর না রাখিয়ো মনে সেই মালা গাঁথা।
রাতের নিশি আনিশুনি তোমার বাঁশির গানে

---

[১১৩] নিত্যানন্দ বিনাদ গোস্বামী , প্রাচীন কাব্যের ছন্দ, বাংলাসাহিত্যের কথা, ১৩৯৯ বাংলা, পৃ. ৩৯
[১১৪] ঐ
[১১৫] ঐ, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

অভাগিনীর কথা বন্ধুরে না রাখিয়ো মনে।[১১৬]

অথবা,
সুরনদী ধারা বহে হিমাচল পুরে।
সেই তটে তপ করে মঙ্গল অসুরে।
ষট্ ঋতু সমান পবন মন্দগতি।
নিশি দিন তপ করে নাই অন্যমতি।[১১৭]

কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে পংক্তির অন্তে বা মধ্যে যে কোনো স্থানে পূর্ণ যতি স্থাপিত হতে পারে। এর এক-একটি ভাব এক-একটি পংক্তিতে সমাপ্ত না হয়ে একাধিক পংক্তিতে প্রবাহিত হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পংক্তি লঙ্ঘক বা প্রবাহমান পয়ার নামে অভিহিত করা যায়। যেমন-

কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোয়াইয়া
ভ্রাতৃপদে, কেন আর ডরিব রাক্ষসে।
রঘুপতি, সুরনাথ সহায় যাহার
কী ভয় তাহার প্রভু এ ভবমণ্ডলে।[১১৮]

পালাগান পরিবেশনে মূল গায়েন তাঁদের ধরাবাধা কয়েকটি সুরেই পরিবেশন করে থাকেন। তাঁদের পরিবেশিত জনপ্রিয় কয়েকটি সুর হল : 'বিনোদ সুর', 'বাদ্যানীর সুর', 'ভাইট্যাল সুর', 'পাইন্যা সুর', 'মেঘা সুর', 'ভেল্যুয়া সুর', 'উড়াইন্যা সুর', 'মইষাল সুর', 'চমক সুর', 'কীর্তন সুর', 'ভাষান সুর', 'বিলাপ সুর' ইত্যাদি। এর প্রতিটি সুরের আবার বিভিন্ন তাল ও লয় রয়েছে। যেমন- 'পয়ার তাল', 'তিতাল' (ত্রিতাল), 'চৌতাল' বা 'চবুতারা', 'খ্যামটা তাল', 'লয় তাল', 'ঢিলা তাল' ইত্যাদি।[১১৯]

৪.৩. পালাগানে কাহিনীর গঠন-কাঠামো (ইতিবৃত্ত)

পালাগানের কাহিনীর ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রথম পর্যায়ের প্রণিধান যোগ্য বিষয় হল তার মধ্যে বর্ণিতব্য চরিত্রগুলি। চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য অনেকটা সরল রৈখিক। অর্থাৎ যে রাজা করবে সে রাজার মতোই আচরণ করবে। এমনিভাবে জমিদার, পীর, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, দেওয়ান, জমিদার, নফর, পণ্ডিত, রাখাল, ডাকাত, বেদে-বেদেনী, কিষাণ-কিষাণী ইত্যাদি চরিত্রের সমাবেশে পালাগুলোর কাহিনী বিন্যাস ঘটেছে। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, শিকারী-জেলে, দাস-দাসী সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় রয়েছে এ সমস্ত পালায়। প্রকৃতি ও পরিবেশের নানারকম উপাদান যেমন- পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, গাছ-পালা, পশু-পাখী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় পালাগানের বর্ণনায়। এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু উপাদান যেমন- পাখী, বন্যজন্তুর সাথে আখ্যায়িকার মধ্যকার বিপদগ্রস্থ কেন্দ্রিয় চরিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তারা সাধারণ মানুষের অনুভূতি সম্পন্ন সম্পূর্ণ মানবিক চরিত্রের আচরণ করে থাকে (যেমন- নেত্রকোনা অঞ্চলে 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালাগানে-'পাহাড়িয়া কউয়া-ময়না পাখী', বগুড়া অঞ্চলের 'নাছিমনের বনবাস' পালাগানে-'বিরামকল পাখী')। এসব সরল রৈখিক বৈশিষ্ট্যের চরিত্র সমন্বয়ে পালাগানের কাহিনী বা আখ্যায়িকাগুলি রচিত হয়ে থাকে। এখানে যে ব্যাপারটি উল্লেখ্য তাহল, বয়াতীরা প্রায়ই তাঁদের অভিনীত পালার কাহিনীগুলিকে ইচ্ছেমত রূপান্তর সাধন করে থাকেন। বয়াতীরা যে কোন উৎস থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে অভিনয়ের সময় মুখে মুখে অক্ষরবৃত্ত/মাত্রা ছন্দের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কাহিনীর সংযোজন বা বিয়োজন করেন। হয়তো দেখা গেল তিন দিনের একটি পালা দুই ঘন্টার মধ্যেই গেয়ে শেষ করে দেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কাহিনীর যে বর্ণনা করে থাকেন তাহল পরিবেশিত পালার সংক্ষিপ্ত রূপ। আর ঐ একই পালা যখন দীর্ঘ সময় নিয়ে পরিবেশন করেন তখন পালার অভিনয়ে প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনাসহ অভিনয় পরিলক্ষিত হয়। পালাগানের বেশির ভাগ কাহিনীই মিলনাত্মক। অর্থাৎকিনা পালাগানের পরিবেশনায় কাহিনীর যে অবস্থা থেকে শুরু হয়, বিভিন্ন ঘটনা-পরম্পরার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শেষে কাহিনীর সেই শুরুর প্রথমাবস্থার মধ্য দিয়েই ঘটনার শেষ হয়ে থাকে। -এটা হল কাহিনীর মিলনাত্মক দিক (লেখচিত্র

---

[১১৬] নিত্যানন্দ বিনাদ গোস্বামী, প্রাচীন কাব্যের ছন্দ, বাংলাসাহিত্যের কথা, ১৩৯৯ বাংলা, পৃ. ১০৬-৭
[১১৭] ঐ, পৃ. ১১০
[১১৮] ঐ, পৃ. ১১০
[১১৯] মোহাম্মদ সাইদুর, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন : ৫০ (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

নং ১১)। যেমন- 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালার কথাই ধরা যেতে পারে। এর কাহিনীর শুরুতে ঘটনার কোন টানা-পাড়েন বা সমস্যা থাকেনা। সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করছে -এটা হল কাহিনীর প্রথমাবস্থা। কাহিনীর মধ্যে একটি মাত্র আকাঙ্খা দিয়ে ঘটনার যাত্রা শুরু হয়। আকাঙ্খাটি ছিল, 'ধর্মরাজের মা, তাঁর ছেলেকে বিয়ে করিয়ে মৃত্যুর পূর্বে বৌমাকে (পুত্রবধূ) আশীর্বাদ করে যেতে চান। এখান থেকেই কাহিনীর ঘটনার শুরু। এই পালার কাহিনীর মধ্যে রয়েছে এক-একটি ছোট ছোট ঘটনা। এসব ঘটনা কাহিনীর সামগ্রিক গতিকে কখনও কখনও আপতঃভাবে বাধাগ্রস্ত করে আবার কখনও এগিয়ে দিয়ে কাহিনীর সামগ্রিক গতিকে গতিশীল করে সমগ্র পরিবেশনাকে সামনের দিকে এগিয়ে

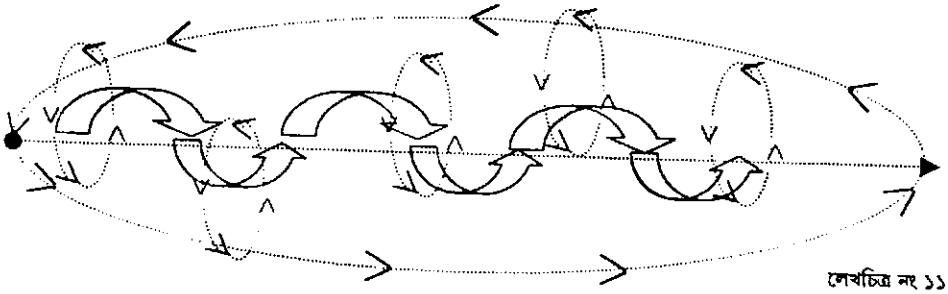

লেখচিত্র নং ১১

নিয়ে যায়। অপরদিকে পালাগানে কিছু কিছু কাহিনী লক্ষ্য করা যায় যেগুলি বিয়োগান্তক। যা কখনওই কেন্দ্রিয় চরিত্রদের মিলনকে সুচিত করে না (লেখচিত্র নং ১২)। যেমন- ঘাটু গানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক উপাখ্যান, ময়মনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া পালা' ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য নাটকের কাহিনীতে সাধারণত দ্বন্দ্ব ভিত্তিক ঘটনা লক্ষ্য করা যায় যা দর্শকের মধ্যে টান টান উত্তেজনা তৈরী করে। মূল কাহিনীর সমান্তরাল কোন ঘটনার পরিবর্তে সমগ্র নাট্যকাহিনীর মধ্যে অনেকগুলি সমান্তরাল চরিত্রের

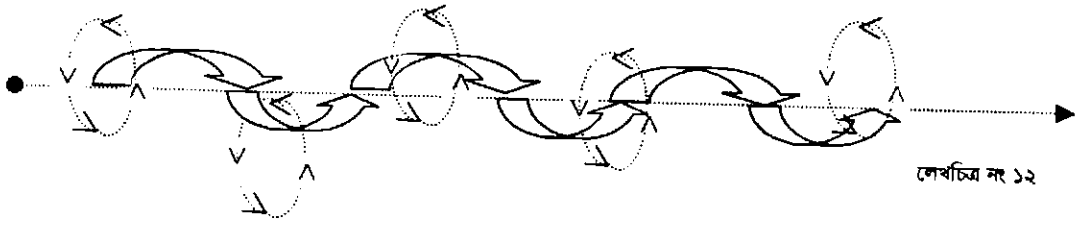

লেখচিত্র নং ১২

সমাবেশ ঘটে থাকে। এর সমগ্র কাহিনীর গঠন অনেকটা ত্রিমাত্রিক আয়তনের (লেখ চিত্র নং ১৩)। মাটি থেকে কোন বৃক্ষে চড়ে আবার নেমে আসার মতন। মাটি থেকে বৃক্ষে চড়ে সর্বোচ্চ পর্যায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত অবস্থা হল কাহিনীর প্রস্তুতি পর্ব। বৃক্ষের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান হল কাহিনীর চূড়ান্ত অবস্থা বা ক্লাইমেক্স। এ সময় দর্শকগণ টান টান উত্তেজনার মধ্যে থাকে। এর পরবর্তী অবস্থা হল কাহিনীর পরিণতির দিকে অর্থাৎ fall down। প্রদত্ত লেখচিত্রের সাহায্যে তা দেখান যেতে পারে-

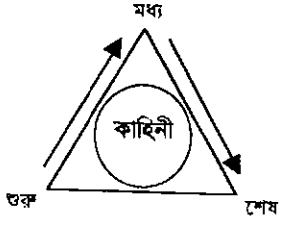

লেখ চিত্র নং ১৩

কিন্তু পালাগানের কাহিনীর মধ্যে কোন চূড়ান্ত অবস্থা থাকেনা। যার ফলে দর্শকের মধ্যে কোন টান টান উত্তেজনা বিরাজ করেনা। প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে এর দর্শক পরিবেশনার দ্বারা কি আস্বাদন করে থাকে? এর উত্তর হল রস। পাশ্চাত্যে দ্বন্দ্ব ভিত্তিক ঘটনার জটাজালের বিপরীতে পালাগানে কাহিনীর ঘটনাগুলি আবর্তিত হয় উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। যেমন- এখন যে রাজা পরোক্ষণেই সে ফকিরে পরিণত হল, আবার এখন যে ফকির (ভিখারী অর্থে) মুহূর্তের মধ্যেই সে রাজা হয়ে গেল। ঘটনার এরূপ আবর্তন অনেকটা নদীর ঢেউ বা তরঙ্গের মতোই উঁচু-নীচু রেখায় গতিশীল (লেখচিত্র নং ১১ দ্রষ্টব্য)।

উপরের ছকে লক্ষণীয় বিষয় হল, ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রচলিত (চর্চিত) কোন লোকনাট্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রীতিতে অভিনীত হচ্ছে। এখানে শুধুমাত্র অভিনেয় উপাদানগুলিরই পরিবর্তন ঘটছে। এছাড়াও কাহিনী, ধর্ম বা পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতি কারণে অভিনয় উপস্থাপনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন- খুলনা পাইকগাছার ভাসানগানে সমস্ত পুরুষ চরিত্র মহিলারাই করে থাকে। এখানে পুরুষ কোন অভিনেতা নেই। আবার পূর্ব ময়মনসিং এর পালায় কোন মহিলা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.১. প্লট বা ইতিবৃত্ত বিচার

নাট্যকাহিনীর প্লট বা ইতিবৃত্ত বিচার আলোচনায় নাটোর অঞ্চলের 'পদ্মাপুরাণ গানে'র ইতিবৃত্ত সম্পর্কিত আলোচনা নীচে তুলে ধরা হল :

লোকনাট্যে কাহিনীর প্লট বা ইতিবৃত্ত বিচার আলোচনায় কাহিনীর অবস্থা বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে কারণে আলোচানার সুবিধার্থে শুরুতে নাট্যকাহিনীর অবস্থা বিচার সম্পর্কে আলোচনা করা হল। লোকনাট্যের ক্রিয়া অনুসারে অবস্থার বিচার করা হয়। এখানে 'ক্রিয়া' বলতে আমরা নাট্যকাহিনীর ঘটনাকে বুঝে থাকি। একটি ক্রিয়াকে পাঁচ ভাগে ভাগ করলে এর যে রূপ দাঁড়ায় প্রদত্ত ছকে তা দেখানো যেতে পারে-

আরম্ভ	প্রযত্ন	প্রাপ্তিসম্ভব	নিয়তফলপ্রাপ্তি	ফলাগম

নাট্যকাহিনীর এ অবস্থাগুলির সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

১. আরম্ভ : এটি নাটকের প্রথমাবস্থার নাম। এই আরম্ভ হচ্ছে একটি নাটকের ক্রিয়ার শুরু এবং আকাংখার জন্ম।
২. প্রযত্ন : নাটকের যে অংশ জুড়ে সিদ্ধি লাভের জন্য আকাংখাকে লালন পালন করা হয় সেই অংশটি হল প্রযত্ন অবস্থা। অর্থাৎ আকাংখার চেষ্টা।
৩. প্রাপ্তিসম্ভব : নাটকের সিদ্ধি লাভ বা ফলাগমের জন্য আকাংখাকে লালন পালন করার ফলে ফলাগম লাভের যে সম্ভাবনা দেখা দেয় সেই অংশটি হল প্রাপ্তিসম্ভব।
৪. নিয়তফলপ্রাপ্তি : নিয়তফলপ্রাপ্তি নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। যেমন: মনমোহন ঘোষ এর মতে, নিয়তফলপ্রাপ্তিতে ফলাগম নিশ্চিত হয়ে যায়। অপরদিকে Concept of Ancient Indian Theatre -এ Cristophare Byreski উল্লেখ করেছেন যে, নিয়ত = Suppression = দমিত হওয়া। সুতরাং নিয়ত ফলপ্রাপ্তি হল আকাংখার দমন হওয়া।
৫. ফলাগম : প্রাপ্তিসম্ভবে আকাংখা পূর্ণ হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দেয় নিয়তফলপ্রাপ্তিতে সে সম্ভাবনা দূর হয়ে যায় এরূপ মেনে নিলে ফলাগমে আকাংখার পূর্ণতা যথেষ্ট যুক্তি যুক্ত মনে হয়।

অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড নাট্যক্রিয়ার একটি সম্মিলিত রূপ হল একটি নাট্যকাহিনী। এক্ষেত্রে আমরা, নাট্যক্রিয়া = নাট্যকাহিনীকে বুঝবো। নাট্যে ক্রিয়ার কাঠামো হল এই পাঁচটি স্তর। তবে সব নাট্যকাহিনীতেই যে এই পাঁচটি অবস্থা থাকবে এমন নয়। যে কোন ক্রিয়ার আরম্ভ থাকবে, ফলাগম অবশ্যই থাকবে তবে অন্যান্যগুলি ধারাবাহিকভাবে নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ আরম্ভ থেকে শুরু হয়ে নিয়তফলপ্রাপ্তিতেও শেষ হতে পারে। আবার আরম্ভ থেকে শুরু হয়ে যদি নিয়ত ফলপ্রাপ্তি না থাকে তবে প্রযত্ন ও প্রাপ্তি সম্ভবের দ্বারা নাটক পূর্ণতা পায় না।

অবস্থা → / অর্থপ্রকৃতি/প্রকরী ↓	আরম্ভ	প্রযত্ন	প্রাপ্তাশা	নিয়তফলপ্রাপ্তি	ফলাগম
বীজ					
বিন্দু					
পতাকা					
প্রকরী					
ফলাগম					
সন্ধি →	মুখ	প্রতিমুখ	গর্ভ	বিমর্ষ	নির্বহন

এখানে অর্থপ্রকৃতি/প্রকরী হল লোকনাট্যের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। ক্রিয়ার প্রকৃতি হল নাট্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা। নাটকের বিভিন্ন অবস্থায় এই অর্থপ্রকৃতি বিভিন্নরূপে নাট্যক্রিয়াকে প্রভাবিত করে সমস্ত নাট্যকাহিনীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। নাট্যক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থায় অর্থপ্রকৃতিগুলির কার্য সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

Dhaka University Institutional Repository

১. এখানে বীজ হল মূল আকাংখা যাকে ভিত্তি করে কার্য সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ যেখান থেকে ক্রিয়ার আকাংখার পূর্ণতা পায় 'ফলে' গিয়ে।
২. বিন্দুর উদ্দেশ্যই হল ক্রিয়ার বাধাকে অপসারিত করা। বিন্দু হল পানির ফোঁটার মত। এই বিন্দু কখনও মূল কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় আবার মূল আকাংখার পূর্ণতার প্রয়োজনে কার্যকে থামিয়ে রাখে।
৩. প্রকরী হল নাটকের মধ্যকার ছোট ছোট ঘটনা। যেমন- গাছের পাশ্বের ঝোপ ঝাড়ের মতো। মূল কার্যকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাসঙ্গিক টুকরো টুকরো ঘটনার জন্ম দেয়, যা মূল প্লটকে বাধা দিয়ে অথবা গতিপ্রাপ্ত করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।
৪. পতাকা একটি সাব প্লট। এর বিস্তৃতি অনেকটা এরকম যেন মনে হয় যে মূল প্লটের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এখানে পতাকাই যেন আলাদা পরিণতি টানতে চায়, যেন একটি গাছকে অবলম্বন করে পেঁচিয়ে ওঠা লতা-গুল্মের মত।
৫. ফলাগম হল আকাংখার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

বাংলা লোকানাট্যে কোন একটি ক্রিয়ার পাঁচটি অবস্থা থাকতে পারে। আবার প্রত্যেক অবস্থার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তবে শুধুমাত্র কার্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে। আর সন্ধির ক্ষেত্রে, আরম্ভ অবস্থাকে নিয়ে মুখসন্ধি। মুখ সন্ধিতে বীজ বপন করা হয়। প্রতিমুখ সন্ধিতে বীজকে লালন করা হয়। আকাংখার পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করা হয়। গর্ভে প্রাপ্তিসম্ভব অর্থাৎ প্রাপ্তিসম্ভব অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় গর্ভ সন্ধিতে। বিমর্ষ সন্ধিতে নিয়তফলপ্রাপ্তির অবস্থা বিরাজ করে। আর নির্বহন সন্ধিতে ফলাগম ঘটে থাকে। তবে সব সন্ধিতেই কম-বেশি বিন্দুর ব্যবহার রয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মাপুরাণ গানের অবস্থা বিচারে 'অর্থপ্রকৃতি ও সন্ধি'র বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে 'পদ্মাপুরাণ গান' এর কাহিনী সংক্ষেপ নীচে উদ্ধৃত করা হল :

কাহিনী সংক্ষেপ : পদ্মাপুরাণ গান-নাটোর অঞ্চল

একটি সুন্দর দিনে শিব ত্রিশুল হাতে করে কমল বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। চারদিকের সুন্দর ফুল যেন হরিপদের উৎসর্গের জন্য। এ সময় দূর্গার কথা মনে করে তাঁর বীর্য স্খলিত হয়। তখন শিব নারদের পরামর্শে সেই বীর্য গগন মন্দিরে স্তুতি দেয় এবং পঞ্চবেতের পাতে রাখে। সেই ধন পাতালে বাসুকীর হাতে পড়লে বাসুকী নাকের কাছে নিতেই গর্ভবতী হয়ে যায়। যথাসময়ে জন্ম হল। নাম রাখা হল জয় বিষহরি। পদ্মার জন্মের পর শিব পদ্মার যোগ্য বর কোথাও না পেয়ে মনিগোসাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের রাতে পদ্মার নাগদণ্ড মনিগোসাইকে দংশন করে।

বিধবা হয়ে মনসা নেতার সাথে যুক্তি করে ইন্দ্রপুরীতে যায়। সেখানে মানস কামনা ব্যক্ত করে। ইন্দ্রমনি তাকে বর দেয়। মনসা নাচ ভঙ্গের দ্বারা উষাবালা-উষাবালীকে লক্ষীন্দর-বেহুলারূপে মর্তে প্রেরণ করে। লক্ষীন্দর চম্পক নগরে চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সনকার গর্ভে এবং বেহুলা নিছনী নগরে সায়বেনের স্ত্রী অমলার গর্ভে জন্ম নেয়। লক্ষীন্দরের জন্মের পর সনকা গণক দ্বারা লক্ষীন্দরের রাশি ভাগ্য গণনা করে জানতে পারে যে, বিবাহ রাতে লক্ষীন্দরকে সাপে কাটবে। তাই, আরও বেশী আদর-স্নেহের মমতায় বড় হয় লক্ষীন্দর। বেহুলা, লক্ষীন্দর বড় হয়। চাঁদ সওদাগর ছেলের জন্য কন্যা দেখতে নিজেদের ব্রাহ্মণকে পাঠায়। ব্রাহ্মণ বেহুলার খবর নিয়ে আসে। চাঁদ সওদাগর বেহুলাকে লক্ষীন্দরের যোগ্য কনে নির্বাচনে পরীক্ষা করে লোহার কলাই ভেঁজে খাবার যোগ্য করে দিতে বলে। বেহুলা তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দেয়।

বেহুলাকে লক্ষীন্দরের বউ করে চম্পক নগরে নিয়ে আসে। বিয়ের রাতে সাপে কাটবে, সে কারণে পূর্ব নির্মিত লোহার বাসর ঘরে বেহুলা লক্ষীন্দরকে থাকতে দেয়া হয়। পদ্মাদেবী লোহার বাসর ঘরে সাপ ঢোকার কোন ছিদ্র না পেয়ে বিশ্বকর্মাকে ডেকে এনে একটি ছিদ্র করায়। কালীনাগকে পাঠিয়ে দেয় লক্ষীন্দরকে দংশনের জন্য। বেহুলা লক্ষীন্দরের রূপ দেখে কালীনাগ তাঁকে বিনা কারণে দংশন করতে পারে না। মনসা দেবী মশা পাঠিয়ে দেয়। লক্ষীন্দরের গায়ে মশা পড়লে লক্ষীন্দর পাশ ফিরে শোবার সময় কালীনাগের মাথায় লাথি লাগে। সেই ক্ষোভে কালীনাগ দংশন করে। লক্ষীন্দর মারা যায়। বেহুলা লক্ষীন্দরকে নিয়ে কলার ভেলা ভাসায়, মৃত স্বামীকে জিইয়ে আনার জন্য। বেহুলার যাত্রা পথে প্রথমে দেখা হয় গোঁদার ঘাটায়। সেখানে গোঁদার চার বউ থাকতে সে বেহুলাকে বিয়ে করতে চায়। বেহুলা রাজী না হলে সে পানিতে ঝাপ দেয় বেহুলাকে ধরার জন্য। মনসার বরে গোঁদার ভারে গোঁদা বেহুলাকে ধরতে পারে না। এরপর কুক্কুর ঘাটায় কালিকা কুক্কুর লক্ষীন্দরের পঁচা মাংসের গন্ধ পেয়ে পানিতে ঝাপ দেয়। সেখানেও মনসার বরে কুক্কুরের পা কামড়ে ধরে কুমীর। এরপর জগাতী ঘাটায় প্রথমে বেহুলাকে ছলনাকারিনী বলে মনে করলেও পরে বেহুলার সতীত্বের পরিচয় পেয়ে তাঁকে সেখান থেকে সসম্মানে ছেড়ে দেয়। এরপর বোয়ালিয়া ঘাটায় বোয়াল মাছ সুযোগ বুঝে লক্ষীন্দরের একটি মালাই চাকী গিলে ফেলে। এরপরে বেহুলা নেতা ধোপানীকে দেখতে পায়। সেখানে কাপড় কাঁচার সময় পাশে তাঁর ছেলে তাঁকে বিরক্ত করে বলে একটি চড় দিয়ে ছেলেকে মৃত বানিয়ে নিশ্চিন্তে কাপড়

Dhaka University Institutional Repository

কাঁচে। কাপড় কাঁচা শেষে ছেলের পিঠে চাপর দিয়ে আবার জ্যান্ত করে নিয়ে যাবার সময় বেহুলা নেতা ধোপানীকে মাসীমা বলে উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে। নেতা ধোপানীর কাপড় কেঁচে দেয় বেহুলা। কাপড় কাঁচায় বেশি পরিশ্রমের কারণ জানলে দেবতারা দেবসভায় বেহুলাকে ডাকে। নেচে গেয়ে দেবতাদের খুশী করে বেহুলা তাঁদেরকে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে। ইন্দ্রমণি নেতা ধোপানীকে দিয়ে মনসাকে ডেকে আনে। মনসা প্রথমে অস্বীকার করলে বেহুলা শাড়ীর আঁচল খুলে কালী নাগের কাটা পুচ্ছ দেখায়। মনসা আর অস্বীকার করতে পারে না। মনসা লক্ষীন্দরকে জিইয়ে দেয়। সে দাঁড়াতে পারে না বলে দৈব বলে বোয়াল মাছের পেট থেকে মালয়চাকী বের করে পুনরায় লক্ষীন্দরের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনে।

ফিরে এসে বেহুলা ছলনার আশ্রয় নেয়। সে ডোম সেজে সনকার কাছে যায়। কৌশলে সে লোহার বাসর ঘর খুলে প্রমাণ করে ছয় মাস আগের তেলের প্রদীপ এখনও জলন্ত। খাবার এখনও খাবারযোগ্য। সনকা চিনতে পারে বেহুলাকে। বেহুলা চাঁদ সওদাগরের সাথে কথা বলে। যদি সে মনসাকে পূজা দেয় তাহলে সে তাঁর হারানো সব কিছু ফিরে পাবে। চাঁদ সওদাগর মনসাকে পূজা দেয়। চাঁদ সওদাগর লক্ষীন্দরসহ তাঁর হারানো ছেলেদের এবং অন্যান্য সব কিছু ফিরে পায়। ফলে মনসার পূজার প্রচলন ঘটে। আর বেহুলা লক্ষীন্দর রথে চড়ে স্বর্গে চলে যায়।[১২০]

নাট্যকাহিনীর পাঁচটি অবস্থার সংজ্ঞা অনুসারে প্রত্যেকটিকে পর্যায়ক্রমিক সংখ্যান্তর বিন্যাসের দ্বারা 'পদ্মাপুরাণ' কাহিনীর অবস্থা বিচার করা যেতে পারে-

যদি,

আরম্ভ	⟶ ১ম হয়	কারণ আরম্ভ এ একটি ক্রিয়ার শুরু এবং আকাংখার জন্ম লাভ করে। অর্থাৎ অবস্থা বিচারে আরম্ভ প্রথমাবস্থা।
প্রযত্ন	⟶ ২য় হয়	কারণ প্রযত্ন নাটকের অবস্থা বিচারের দ্বিতীয়াবস্থা। প্রযত্নে আকাংখা পূরণের চেষ্টা চলে। অর্থাৎ আকাংখাকে লালন করা হয়।
প্রাপ্তি সম্ভব	⟶ ৩য় হয়	কারণ যেহেতু এটি তৃতীয় অবস্থা এবং প্রযত্ন অবস্থায় আকাংখা পূরণের চেষ্টার ফলে প্রাপ্তিসম্ভব অবস্থায় আকাংখা পূরণের সম্ভাবনা দেখা দেয়।
নিয়তফলপ্রাপ্তি	⟶ ৪র্থ হয়	কারণ এ অবস্থায় আকাংখা পূরণের সম্ভাবনার পরিবর্তে আকাংখার দমনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নিয়তফলপ্রাপ্তির এ অবস্থায় মনে হয় আকাংখা পূরণ যেন আর সম্ভব নয়। অর্থাৎ অবস্থা বিচারে নিয়তফলপ্রাপ্তি ৪র্থ তম।
ফলাগম	⟶ ৫ম হয়	কারণ অবস্থার বিচারে সর্বশেষ অবস্থা হল ফলাগম।

পদ্মাপুরাণের উল্লিখিত কাহিনীতে পদ্মাদেবীর পূজা চাওয়া বা পূজা পাবার আকংখা তাঁকে আন্দোলিত করে এবং নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দেয়। অবস্থার বিচারে প্রথমাবস্থা 'আরম্ভ' হল পদ্মাদেবীর পূজা পাবার ইচ্ছা। পূজা পাবার জন্য নেতার সাথে পরামর্শ এবং কৈলাসালয়ে রাজা ইন্দ্রমণির কাছে নিজের মনোবাসনার কথা খুলে বলা থেকে নাচ ভঙ্গ দোষে বেহুলা লক্ষীন্দরেকে স্বর্গ থেকে মর্তে প্রেরণ পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা 'প্রযত্নে'র অন্তর্ভুক্ত। কেননা পদ্মাদেবী তাঁর আকাংখাকে লালন করেছে আকাংখা পূরণের আশায়। বেহুলা লক্ষীন্দরকে যেহেতু পদ্মাদেবীর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য স্বর্গ থেকে মর্তে পাঠায়, তাই বেহুলা লক্ষীন্দরের বিয়ে পদ্মাদেবীর মনে আশার সঞ্চার করে পূজা প্রচলন পাবার জন্য। এক দিকে চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সোনেকা পদ্মার উপাসক, পদ্মার উপাসক হিসেবে বেহুলা পুত্রবধূ রূপে যখন চাঁদের ঘরে এলো তখন পদ্মা চাঁদের শক্তিকে খাটো করার এবং নিজের শক্তিকে বড় করার একটি মস্ত সুযোগ পেল। তাই ধরা যায়, বেহুলা লক্ষীন্দরের বিয়ে 'প্রাপ্তিসম্ভব'। কিন্তু পদ্মার আশাকে কিছুটা ব্যহত করে। তাই চাঁদ সওদাগরের লোহার বাসর গড়ানোর সিদ্ধান্ত থেকে লোহার বাসর গড়া পর্যন্ত 'নিয়তফলপ্রাপ্তি'। লক্ষীন্দরকে সাপ দিয়ে দংশানোর জন্য লোহার বাসর ঘরে ছিদ্র খোঁজা 'প্রযত্ন'। সূতানালী সাপের বাসর ঘরে ঢুকে যাওয়া 'প্রাপ্তিসম্ভব' এবং লক্ষীন্দরকে দংশন করতে কালীনাগের অপরাগতা প্রকাশ করা 'নিয়তফলপ্রাপ্তি'।

বেহুলার ভাসান যাত্রা থেকে শুরু করে সোনেকা কর্তৃক বেহুলাকে চিন্‌তে পারা পর্যন্ত পদ্মাদেবী বেহুলাকে সাহায্য করে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন উপায়ে এগুলি সবই তাঁর আকাংখাকে ফল লাভে পরিণতি দানের জন্য চেষ্টা, যা 'প্রযত্ন' বলে পরিচিত। বেহুলাকে লক্ষীন্দরের কথা জিজ্ঞেস করার মধ্য দিয়ে চাঁদ সওদাগরের নমণীয় মনোভাব প্রকাশ পায়, যাকে 'প্রাপ্তিসম্ভব' বলা চলে। এবং শেষে মনসার ঘটের প্রতি চাঁদ সওদাগরের পূজা দেয়া মনসা দেবীর মনোস্কামনাকে পূরণ করে তাই পদ্মাপুরাণে চাঁদ কর্তৃক পদ্মাদেবীকে পূজা দান 'ফলাগমে'র অন্তর্গত।

---

[১২০] সাক্ষাৎকার গ্রহণ : পঞ্চানন মণ্ডল ও দুষ্টপদ মণ্ডল, দীঘাপতিয়া, নাটোর, জানুয়ারী ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরে উল্লিখিত অবস্থার বিচারে পদ্মাপুরাণ গানের মধ্যে ক্রিয়ার ক্রমপর্যায়ে যেসব অবস্থার বিস্তার ঘটেছে সেগুলি হল-

আরম্ভ → (প্রযত্ন → প্রাপ্তি সম্ভব → নিয়তফলপ্রাপ্তি) → (প্রযত্ন → প্রাপ্তি সম্ভব → নিয়তফলপ্রাপ্তি) →

→ (প্রযত্ন → প্রাপ্তি সম্ভব) → ফলাগম

উপরোক্ত অবস্থাগুলিকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করলে পদ্মাপুরাণ গানের ইতিবৃত্ত বা প্লটের যে চিত্র আমরা পাই তা নিম্নরূপ-

$$১ \rightarrow (২ \rightarrow ৩ \rightarrow ৪) \rightarrow (২ \rightarrow ৩ \rightarrow ৪) \rightarrow (২ \rightarrow ৩) \rightarrow ৫$$

কিন্তু যাত্রাপালা, লাইলী মজনু, ঘাটু গান, হাসান-হোসেনের ঘটনা, জারী গানের ইতিবৃত্ত অনেকটা ব্যতিক্রম। এর প্লট নির্মাণ পাশ্চাত্তের দ্বন্দ্ব বিষয়কে ভিত্তি করে গঠিত। ত্রিমাত্রিক গঠনে তার আকৃতি (লেখ চিত্র নং ১৩ দ্রষ্টব্য)। এর কেন্দ্রিয় চরিত্র শক্তিহীন এবং মৃত্যু শেষে দুষ্ট চরিত্রের পরাজয় দেখান হয়। অবস্থা বিচারে কাহিনী ৪র্থ অবস্থায় এসে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ কেন্দ্রিয় চরিত্রের আকাংখা থেকে যায়। নাট্যকাহিনীর পরিণতিতে হিরো-হিরোয়িন মৃত্যুবরণ করলেও তাঁদের পক্ষে কেউ দাড়িয়ে তাঁদের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করে এবং দুষ্ট চরিত্র ভালো হয়ে যায়।

পালাগানের পালাকারেরা মুখে মুখেই পালা বাধতেন এবং নৃত্য-গীত-সংলাপ-বাদ্যসহকারে ধুয়া যোগে তা পরিবেশন করতেন। ধর্ম নিরপেক্ষ এ সমস্ত পালা নিছক আনন্দ বিনোদনের উদ্দেশ্যেই পরিবেশিত হতো। আবার কিছু কিছু পালা ধর্মভাব দ্বারা যুক্ত। যেমন- 'রয়ানী গান' বা 'পদ্মাপুরাণ গান' বা 'বেহুলা লক্ষীন্দর', 'কিচ্ছা কাহিনী' ইত্যাদি। ধর্মভাব-যুক্ত এসকল গান যে শুধুই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হয় তা নয়। বিভিন্ন উৎসবাদিতে, মেলায় বা বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যেও ধর্মভাব-যুক্ত পালাগান পরিবেশনার ডাক পড়ে। এর পাশাপাশি লোকশিক্ষা, সামাজিক জনসচেতনতা তৈরীর উদ্দেশ্যে উন্নয়নমূলক বেসরকারীর সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন নাট্যদলকে নিজেদের উদ্যোগে পালাগান পরিবেশন করতে দেখি। যেমন- নড়াইল অঞ্চলের 'তারী গান', 'যোগীর গান', 'গম্ভীরা গান' ইত্যাদি।

আমরা দেখি, পালাগান পরিবেশনায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক অংশ নিয়ে থাকে (নাটোর অঞ্চলে 'যোগীর গান', 'পদ্মাপুরাণ গান' পরিবেশনা রীতি দ্রষ্টব্য)। মুসলমান হয়েও পরিবেশনার প্রয়োজনে তারা সাদা ধুতি পরে, মাথায় চন্দনের ফোঁটা-ত্রিশুল আঁকে, গায়ে পইতা-নগুন ইত্যাদি জড়িয়ে পূজায় অংশ নেয়। পালাগানের বন্দনায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পায়। ধর্মভাব মুক্ত বিষয়ের পালাগান ছাড়াও ধর্মীয়ভাব যুক্ত পালাগানও আনন্দ বিনোদনের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। বিনোদনের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত এসমস্ত পালাগানের আয়োজন করা হলেও এদের প্রায় প্রতিটি পরিবেশনার শুরুতে কিছু না কিছু ধর্মীয় আচার বা কৃত্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এসব ধর্মীয় আচার বা কৃত্যের পেছনে রয়েছে তীব্র ধর্মীয়-অনুভূতি বা ধর্ম-ভয় : বিশ্বাস থেকে যার উৎপত্তি এবং ভক্তিভাবে প্রকাশ। এছাড়াও গানের বন্দনায় বর্ণিত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুভূতির মিশ্রণ এই ধর্মীয় ভক্তিভাবকে যেন আরও শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। এসব ভক্তিভাব বা ভয় থেকে মনের মধ্যে জন্ম নেয় প্রচণ্ড মানসিক শক্তি বা ধ্যান, যা আত্মার শুদ্ধতাসহ অভিনেতার মনোযোগকে অভিনেয় চরিত্রে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। পাশ্চাত্য নাট্যপদ্ধতির মধ্যে নাট্যচর্চার কৌশলে মানসিক শক্তির এই (ইচ্ছা) প্রচণ্ডতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[১২১] পালাগান পরিবেশনায় একজন পালাকার তাঁর ঐ প্রচণ্ড মানসিক ইচ্ছা শক্তিকে কোত্থেকে নিয়ে থাকেন এবং কিরূপে এর ব্যবহার করে থাকেন সে বিষয়ে পালাগান উপস্থাপনার মধ্যে আলোচনা করা হল।

---

[১২১] "But to enjoy one's creativity to excess, to fall in love with one's inspiration." - Sonia Moore, The Stanislavski System, Penguin Books, Pg. Foreward xvi.

Dhaka University Institutional Repository

৫. পালাগান উপস্থাপনা

পালাগানের নাট্যকাঠামো যেহেতু দ্বন্দ্ব ভিত্তিক নয় এবং পালাকার পাশ্চাত্য নাট্যমঞ্চের মতো আলোক সজ্জা ছাড়া সেট-শুন্য আসরে একক ভাবে অভিনয় করেন, সে কারণে 'পালাগান উপস্থাপনা' আলোচনায় কলাকুশলীসহ দর্শকের প্রসঙ্গও চলে আসে। পালা পরিবেশনে পালাকার এমন কি করে থাকেন যা দেখে দর্শক পুলকিত হয়, অভিভূত হয় ? এখানে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় ভাবের আদান-প্রদান ঘটে থাকে তা গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয় সম্পর্কিত আলোচনার সুবিধার্থে এ অংশের আলোচ্য বিষয়গুলিকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

১) পালাগানের রস নিষ্পত্তি, ২) পালাগানের অভিনয় কৌশল ও ৩) উৎস সন্ধান।

৫.১. পালাগানের রস নিষ্পত্তি

পালাগানের কাহিনী পাশ্চাত্তের নাট্যকাহিনীর মতো দ্বন্দ্ব ভিত্তিক ত্রিমাত্রিক গঠনের নয়। বরং রসাশ্রিত আবেগের উপর নির্ভর করে তা এগিয়ে চলে সামনের দিকে। পালাগানের মূল গায়েন কোন রকম সেটের ব্যবহার ছাড়াই যৎসামান্য প্রপসের ব্যবহারের দ্বারা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের সামনে কাহিনী বর্ণনার সাথে একের পর এক দৃশ্য উপস্থাপন করে যান। আর দর্শক ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করে মূল গায়েনের পালা পরিবেশনা। তাহলে এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মূলগায়েন একা কিভাবে কোনরকম সেট প্রপস্ এবং আলোর (দৃশ্যসজ্জার ক্ষেত্রে) ব্যবহার ছাড়াই সমস্ত দৃশ্যে অভিনয় করে থাকেন? আর দর্শকেরাও কিভাবে ঐ সেট-প্রপস্ শুন্য দৃশ্য উপভোগ করে থাকেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, এখানে মূল গায়েন যে অভিনয় করে দেখান, দর্শকেরা তা তাঁদের কল্পনায় মেনে নেন্। অভিনেতা তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকে পরিবেশন করে দর্শকের মাঝে তন্ময় ভাব জাগ্রত করে দেন। তিনি শুধু স্থানেরই সাধারণীকরণ নয়, চরিত্রেরও সাধারণীকরণ করেন।

এখানে সাধারণীকরণ হচ্ছে : আসর হচ্ছে একটি বাস্তব স্থান এবং নাট্যিক স্থান হচ্ছে নাটকের অভ্যন্তরস্থ বর্ণিত স্থান। এ দুটি স্থানের মাঝে একটি স্থান সৃষ্টি করাকে সাধারণীকরণ বলে। এটি এমন একটি স্থান যেটা বাস্তব স্থান ও নাট্যিক স্থান থেকে উত্তীর্ণ একটি সাধারণ স্থান যা দর্শক তার কল্পনায় মেনে নেয়। এটি মেনে নেয়া একটি সত্যমূলক স্থান, যেখানে অভিনেতা তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকে পরিবেশন করে দর্শকের মাঝে তন্ময়ভাব জাগ্রত করে দেয়। শুধু স্থানেরই সাধারণীকরণ নয় চরিত্রেরও সাধারণীকরণ করেন অভিনেতা। অর্থাৎ চরিত্রটি বাস্তবও নয় আবার নাট্যিকও নয়। এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে অভিনেতা অভিনয় করেন এবং তন্ময়ভাব সৃষ্টি করেন।[১২২]

পালাগান পরিবেশনায় দর্শকের মনোভাবের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রসের প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন রসের অভিনয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা স্মৃতিকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে অভিনেতা প্রথমে নিজে রস গ্রহণ করেন, তারপরে তা দর্শকের মাঝে সঞ্চারিত করেন। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, লোকনাট্য পরিবেশনায় দর্শকের মনে রস সঞ্চরণের প্রক্রিয়াটা তাহলে কি হবে? এ প্রসঙ্গে রস ও ভাব এর সংজ্ঞাসহ প্রকারভেদ জেনে নেয়া যেতে পারে।

প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ মাঝে মাঝে যে আনন্দের আস্বাদ পায়, সে আনন্দ ও কাব্যানন্দ এক নয়। প্রথমটি লৌকিক এবং দ্বিতীয়টি অলৌকিক। কাব্যানন্দের অলৌকিকত্বের কারণ 'ভাব সমস্বতা'। মনের যে অনুভূতি বিশেষের ফলে এই শুদ্ধ আস্বাদন। আলংকারিকগণ তার নাম দিয়েছেন 'রস'। যারা স্পর্শকাতর, কাব্য অনুশীলনের ফলে যাদের মন আন্দোলিত হয়, কাব্যের অন্তস্থ বিষয়বস্তুতে যারা নিজেদের একাত্ম করে দেয়, এরূপ দর্শকের কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয় দর্শনজনিত অনুভূতি বিশেষ-ই 'রস'। ভাব তন্ময় চিত্তে আনন্দের আস্বাদ রস। আচার্য ভরত বলেন- বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী সংযোগে 'রস' নিষ্পত্তি হয়। রসের মুখ্য অর্থ 'আস্বাদন'।[১২৩] রস আস্বাদিত হয় বলেই আলংকারিকগণ 'আস্বাদন' শব্দের পরিবর্তে 'রস' শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

ভাব হতে রসের উৎপত্তি না রস হতে ভাবের উৎপন্ন হয়। এ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন ভাব বিহীন যেমন রস থাকতে পারেনা তেমনি রস বিহীনও ভাব হতে পারে না। উভয়েই উভয়ের দ্বারা নিষ্পত্তি হয়। আচার্য

---

[১২২] রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসসমীক্ষা, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ৯০

[১২৩] ঐ, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

ভরত এই মত অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন- "ভাব হতেই রস নিষ্পত্তি হয়। রস হতে ভাব নিষ্পত্তির কথা অবান্তর, অযৌক্তিক।"[১২৪] ভাব, বিভাব এবং অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সংস্পর্শে এসেই স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। ভরত বলেন, "যারা কাব্যের অর্থকে আস্বাদিত করায় বা যাদের জন্য কাব্যের অর্থের স্বাদ গ্রহণ করতে সুহৃদপ্রবৃত্তির হয় তাহাই ভাব।"[১২৫] ভাব প্রসঙ্গে আরও অনেক পণ্ডিতদের ও একই মত- আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা যারা কবির অন্তর্গত ভাবকে প্রকাশিত করায় যাদের উপস্থিতির জন্য নানা অভিনয় সংবদ্ধ রস আস্বাদিত হয়। তাদেরকে ভাব বলে।

ভাব প্রথমত দুই প্রকার- স্থায়ীভাব ও ব্যভিচারীভাব। স্থায়ী ভাব ৮ প্রকার এবং ব্যভিচারীভাব তেত্রিশটি। বিভাব ও অনুভাবের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও ভাব দ্বারা রস নিষ্পত্তি হয়। যদিও সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাবে রস নিষ্পত্তি মেনে নেওয়া হয়েছে তবুও স্থায়ীভাবই রসত্বপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু স্থায়ীভাব ৮ টি, তার রস ও ৮টি। অর্থাৎ ৮টি রতি, শোক, হাস্য, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। এই ৮টি ভাব এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বিভৎস ও অদ্ভুত এই ৮টি রস। এছাড়াও রয়েছে ৮টি সাত্ত্বিক ভাব, যেমন- স্তম্ভ (কাশ), স্বেদ (ঘর্ম), রোমাঞ্চ, স্বরস্বাদ (স্বরভঙ্গ), বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয় (মূর্ছা) এই ৮টি সাত্ত্বিক ভাব এবং তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব।[১২৬]

স্থায়ী ভাব থেকে ৮ টি রসের জন্ম লাভ করে, যেমন- রতিভাব থেকে শৃংগারে, শোক থেকে করুণ, ক্রোধ থেকে রৌদ্র, হাসি থেকে হাস্য, উৎসাহ থেকে বীর, ভয় থেকে ভয়ানক, জুগুপ্সা থেকে বীভৎস এবং বিস্ময় থেকে উদ্ভুত রস জন্মলাভ করে। স্থায়ী ভাব বলতে বোঝায় সেই সকল হৃদয়ভাব, যা বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ চিত্ত বৃত্তির দ্বারা বিনষ্ট হয় না এবং যারা তাঁদের স্বীয় রূপ বজায় রেখে চিরকাল চিত্তে অবস্থান করে এবং রস পদবী প্রাপ্ত হয় তাই স্থায়ী ভাব। স্থায়ী ভাব সর্বদাই মনে থাকে। এদের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা যায় না। একটি স্থায়ী ভাবে অনেক ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবও থাকতে পারে।

ব্যাভিচারী ভাব সব সময় মনের মধ্যে স্থায়ী অবস্থান করে না। যেমন: আলস্য। এগুলি যথাযথ কারণের অভাবে হয়তো একবারও উৎপন্ন নাও হতে পারে। আবার এরা আস্বাদিত হলে আর কোন অবশিষ্টই মনের মধ্যে থাকে না। এই স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারি ভাব এদের বাহ্য উপাদান হচ্ছে দুটি; বিভাব ও অনুভাব। বিভাব হচ্ছে রসানুভূতির কারণ। ভরত বলেন- ভাব হল; কারণ, নিমিত্ত, হেতু প্রভৃতি এগুলি সবই এক পর্যায়ের শব্দ। বিভাবের কারণেই আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় জ্ঞাপিত হয়। বিভাবের দ্বারাই বা বিভাবের জন্যই মঞ্চে কার্যের সূত্রপাত ঘটে বা বিভাবের কারণে হৃদয়ের ব্যভিচারী ও স্থায়ীভাবের অনুভূতি অনুভাবের মাধ্যম প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মঞ্চে সব সময়েই ক্রিয়ার মধ্যে বিভাব বা কারণ থাকে। বিভাবের কারণে অভিনেতার হৃদয়ের স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব (অভিনেতা আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের মাধ্যমে বা অনুভাবের মাধ্যমে) প্রকাশ করে এবং তা থেকে দর্শক রস আস্বাদন করে।[১২৭] সংক্ষিপ্ত কথায় এই হলো রস সম্পর্কে আলোচনা কিন্তু রস প্রসঙ্গে সবচেয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে রসের 'নিষ্পত্তি' এর বিষয়ে।

রস নিষ্পত্তি বিষয়ে সাধারণভাবে যে মত রয়েছে তা নিম্ন প্রদত্ত ছকে দেখানো যেতে পারে। মঞ্চে অভিনেতার ক্ষেত্রে সাধারণত :

বিভাব → আলম্বন + অনুভাব + সাত্ত্বিক ভাব
বিভাব → উদ্দীপন

অভিনেতা
↓
ব্যভিচারী ভাব --- (অভিনেতা)
↓
স্থায়ী ভাব — দর্শক
↓
রস — দর্শক

---

[১২৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

[১২৫] ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভরত নাট্যশাস্ত্র-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৩০৫

[১২৬] পূর্বোক্ত, ভরত নাট্যশাস্ত্র-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৩০৭

[১২৭] পূর্বোক্ত, ভরত নাট্যশাস্ত্র-১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ,

আলম্বনের সাথে উদ্দিপন + অনুভাব + সাত্ত্বিক ভাব (অভিনেতা) → ব্যাভিচারী ভাব (অভিনেতা) → স্থায়ী ভাব (দর্শক) → রস (দর্শক)।
অভিনেতা বিভাব, অনুভাব এবং সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব সহযোগে সৃষ্ট স্থায়ী ভাব থেকে দর্শক রস আস্বাদন করে থাকে।

কিন্তু ভট্ট লোল্লট বলেন, অভিনেতা নাটকের যে চরিত্রে অভিনয় করেন, সেই চরিত্রের রস দর্শকের মাঝে স্থানান্তর করে এবং দর্শক তা থেকে রস আস্বাদন করেন। অর্থাৎ, রস হচ্ছে (অভিনেতা) যে চরিত্রে নিমগ্ন → অভিনেতা স্থানান্তর করে রসটাকে দর্শকের কাছে (স্থানান্তর) → রস (দর্শক)। ভট্টশংকুক বলেন, অভিনেতা শুধুমাত্র নাট্যিক ক্রিয়ার একটি মায়া তৈরী করেন মাত্র। দর্শক সেই মায়া থেকে রস আস্বাদন করেন। অর্থাৎ, মঞ্চে উপস্থাপন (illusion of original action) → তা দর্শক (অনুধাবন) দেখে রস অনুধাবন করে → রস (দর্শক)।[১২৮]

সর্বশেষে ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত বলেন, অভিনেতা মঞ্চে স্থায়ীভাব জাগ্রত করেন এবং তাকে সাধারণীকরণ করে দর্শকের মধ্যে একটি তন্ময়ী ভাবের সৃষ্টি করেন। এবং দর্শক সেই তন্ময়ী ভাবের মধ্যে থেকে রস আস্বাদন করে। অর্থাৎ, স্থায়ী ভাব (অভিনেতা) → সাধারণী করণ (মঞ্চ) → তন্ময়ী ভাব (দর্শক) → রস (দর্শক)।[১২৯]

আমাদের লোকনাট্য ও সংস্কৃত বহু বিচিত্র, আঙ্গিক বিষয়বস্তু, মঞ্চ প্রভৃতির কারণে যে রস নিষ্পত্তি প্রশ্নে এই বিতর্ক আমাদের লোকনাট্যকে আরোও সম্মৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে।

লোকনাট্যের রস তত্ত্ব প্রসঙ্গে উপরের আলোচনায় রস নিষ্পত্তি প্রশ্নে ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্তের মতামতকেই যথেষ্ট কার্যকরী বলে মনে করি। কেননা পাশ্চাত্ত নাটকের Climax বা বর্তমান কালের নাটকে যেভাবে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নাটককে গতিশীল করার প্রক্রিয়া রয়েছে লোকনাট্যে সেই অর্থে কোন দ্বন্দ্ব পাওয়া যায়না। এখানে নাটকের শুরুতে একটি আকাংখার জন্মকে কেন্দ্র করে একটি ক্রিয়া আকাংখার পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়। আর তাই, নাটকের কাহিনী এবং বিষয়বস্তুকে রসোত্তীর্ণ করে উপস্থাপন করা লোকনাট্যের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। যথাযথ রস সঞ্চার করাই হচ্ছে নাটকের স্বার্থকতা। কেননা, তাহলেই প্রায় সরল রৈখিক কাহিনী বা বিষয়বস্তু দর্শকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। যেহেতু লোকনাট্যের আসর বা মঞ্চে দৃশ্য সজ্জা, আলোক সজ্জা এবং বাস্তবধর্মী নাটকের ন্যায় রূপসজ্জা নেই (সামন্য কিছু প্রপস্ ছাড়া)। সেহেতু অভিনেতাকে কাহিনী হৃদয়গ্রাহী করতে সম্পূর্ণ ভাবে রস সঞ্চালনের উপর নির্ভর করতে হয়। আর রস সঞ্চালন তখনই সফল হবে যখন অভিনেতা বিভাব নির্দেশিত ক্রিয়ায় সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী এবং সাত্ত্বিকভাবের মাধ্যমে তাঁর স্থায়ীভাবকে অনুভাব দ্বারা প্রকাশ করে দর্শকের মাঝে তন্ময়ীভাবে সৃষ্টি করতে পারে। কেননা তাহলেই দর্শক নাট্যিক স্থান ও বাস্তব আসর ভুলে গিয়ে মাঝামাঝি একটি স্থানে উপস্থাপিত ক্রিয়াকে (বাস্তব চরিত্র এবং নাট্যিক চরিত্রের মাঝামাঝি একটি চরিত্র দ্বারা পরিবেশিত কাহিনী) তাঁর কল্পনার সত্য বলে মেনে নেবে। আর দর্শককে মেনে নিতে এর সাথে সাহায্য করে লোকনাট্যের পূর্বরঙ্গ, প্রযোজনা রীতি, অভিনয় রীতি, পূজা পাঠ, গান, মুদ্রা, আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের জোরাল এবং গতিশীল উপস্থাপনা।

লোকনাট্যের বিভিন্ন প্রযোজনায় উপরে উল্লেখিত ৮টি সংস্কৃত রসের প্রয়োগ ছাড়াও আরও কিছু 'রস' -এর ব্যবহার রয়েছে। এক্ষেত্রে লোকনাট্যের বেশ কিছু প্রযোজনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন: বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে 'শান্ত রসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় বৌদ্ধ নাথ পন্থীদের নাট্যচর্চায়। চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের 'জ্যা' নাট্য চর্চায় তারা 'শৃংগার' ও 'শান্ত' রসের ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া যোগীর গানে 'হাস্য' ও 'শান্ত' রসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে তাঁর ৬জন পণ্ডিত যারা 'ষড়গোস্বামী' বলে চিহ্নিত তারা রস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং গৌড়িয় বৈষ্ণব রীতির সকল নাট্যের মধ্যে সংস্কৃত রসের ব্যবহার পরিহার করেন। তারা পাঁচটি নতুন রসের প্রয়োগ ঘটান। তাঁদের নাট্যের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস এবং ভক্তি রসের প্রাধান্য দেন যা বৈষ্ণবীয় 'পঞ্চরস' নামে খ্যাত। কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্যদেবকে নিয়ে যেসব নাট্য রয়েছে সেগুলির মধ্যে এই ৫টি রসের প্রয়োগ দেখা যায়। অন্য কিছু লোকনাট্যেও এই বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের কিছু কিছু ব্যবহার রয়েছে। যেমন- 'পীরের গান' এবং 'যাত্রা'র বেশিরভাগ উপস্থাপনায়ও 'ভক্তি' রসের প্রাধান্য রয়েছে। তাছাড়া 'সংযাত্রা'য় হাস্যরস। 'মুখনাচ', 'কালীকাচ' রীতির অভিনয়ে 'বীভৎস', 'ভয়ানক', 'বীর' ও 'রৌদ্র' রসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'গোমরীনাচ' নাট্যরীতির অভিনয় 'বীর',

---

[১২৮] পূর্বোক্ত, রসসমীক্ষা, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ৭১-৭২

[১২৯] ঐ, পৃ. ১০৫-১২৩

Dhaka University Institutional Repository

'ভয়ানক', 'বীভৎস' রসের দ্বারা প্রভাবিত। মুসলিম-বীর বা পীর-দরবেশ বিষয়ক লোকনাট্য যেমন-'মানিক পীরের গান', 'গাজীর গান', 'হাসান-হোসেন', 'ইমাম যাত্রা' প্রভৃতির ক্ষেত্রে 'বীর' ও 'করুণ' রসের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়ক কাহিনী যেমন: বর্তমান 'যাত্রা', 'আলকাপ', 'পালাগান' প্রভৃতি নাট্যে 'শৃঙ্গার', 'হাস্য' ও 'করুণ' রসের প্রাধান্যসহ অন্যান্য রসের কমবেশি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিব বিষয়ক কাহিনীতে 'ভক্তি' ও 'হাস্য' রসের প্রধান্য লক্ষণীয়। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনীতে 'শৃংগার রস' ও লীলা বিষয়ক কাহিনীর পরিবেশনায় 'ভক্তি রস' থাকে।

লোকনাট্যের অভিনয় উপস্থাপনার মধ্যে 'রস' যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, রস নিষ্পত্তির বিষয়টিও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর কাহিনীর বিন্যাসের চমৎকারিত্ব তথা কাহিনীর গাথুনির থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো নাট্যক্রিয়ার রস সৃষ্টি করা। রস আস্বাদন করানোর মধ্যেই লোকনাট্য তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে আজও জীবন্ত-প্রাণবন্ত। লোকনাট্যের প্রযোজনারীতি, অভিনয় উপাদান, আসর, পূর্বরঙ্গ সবকিছুর মাধ্যমে পরিবেশনাকে রসোত্তীর্ণ করে প্রয়োগ করা সম্ভব বলেই লোকনাট্য তার নিজস্বতায় স্বতন্ত্র।

৫.২. পালাগানের অভিনয় কৌশল

আলোচ্য 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালাটির অভিনয়রীতি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে, এর মধ্যে বিভিন্ন অভিনয় উপাদানের ব্যবহার, পালার আঙ্গিকগত কৌশল, পালাকারের dilation কৌশল, বর্ণনাকারী থেকে চরিত্রে বা চরিত্র থেকে চরিত্রে দ্রুত পরিবর্তন এবং সর্বোপরি পালা উপস্থাপনে মূল গায়েন কিরূপে বাস্তব আয়তনকে পরিবর্তন করে নাট্যিকস্থানে পরিবর্তন করেন সেগুলি আলোচনা করে তুলে ধরার চেষ্টা করব। বাস্তব স্থানকে নাট্যিকস্থানে রূপান্তরিত করতে প্রথমে তিনি কি চিন্তা করেন; দৃশ্যের শুরুতে মূল সূত্র কোথায় ধরিয়ে দেন; এবং এর প্রক্রিয়া কি; যার ফলে তিনি তাঁর অভিনয়ে দর্শকদের সাথে সহজেই একাত্ম হয়ে যান -এগুলিই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রায় সকল লোকনাট্যের অভিনয় রীতির ন্যায় এই পালাগানেও "পূর্বেকৃত পর্ব" বা পূর্বরঙ্গ রয়েছে। পালার শুরুতেই লক্ষ্য করা যায় দোহারবৃন্দের বাদ্যযন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রচলিত কোন দেশাত্ববোধক গানের কনসার্ট বাজিয়ে থাকেন। এ কনসার্টের মূল উদ্দেশ্য উপস্থিত সকল দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং পালার প্রতি তাঁদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করা। পালাকার যখন মনে করেন দর্শকদের মনোযোগ পরিপূর্ণভাবে পালার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তখনই তিনি মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে একটি বিশেষ ইশারায় যন্ত্রীদলের কনসার্ট থামিয়ে দেন। এরপর পালাকার মঞ্চ ও যন্ত্রসমূহকে (বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়ামকে প্রধান হিসেবে ধরে) ছালাম করে বন্দনা গীতি শুরু করেন। বন্দনা গীতির মধ্যেই ধর্ম নিরপেক্ষতার চরম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। শুরুতেই অর্থাৎ বন্দনার শুরুর কথাটি হচ্ছে -"আমি আর কারে ডাকিবো গো, এসোগো মা স্বরস্বতী"। স্বরস্বতী তাঁদের নিকট সুরের দেবী, বিদ্যার দেবী। এই দেবীর সন্তুষ্টির ওপর সমস্ত পালাগানের সুস্থ্যতা, সুন্দরতা নির্ভর করছে বলে পালাকার ও তাঁর দলের সবাই মনে করেন। এরপরেই পালাকার চারদিক বন্দনা করেন যার মধ্যে পশ্চিমের মক্কা রয়েছে, রয়েছে হযরত শাহজালাল এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর বন্দনা, পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, যেমন- "পিতামাতার চরণ বান্ধলাম বসি এ আসরে, যেও মায়ে দশমাস-দশদিন রাখছিল উদরে" ইত্যাদি। এভাবে বন্দনা গীতের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে বন্দনা এবং পূর্বরঙ্গ শেষ করেন। পূর্বকৃত্য মূলত কাজ শুরু করার আগে সাধারণীকরণের জন্য দর্শকদেরকে একটি ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে বাস্তব স্থান নাট্যিক স্থানে রূপান্তরিত হয়।

পালাকারের এই বন্দনা গীতের মধ্যে দুটো কৌশল থাকে। অথবা এগুলিকে principles -ও বলা যায় যেগুলি তাঁর সমস্ত পালায় লক্ষ্য করা যায়। এর একটি হচ্ছে dilation বা বৃদ্ধি করা বা বড় হওয়া এবং অন্যটি পালাকারের গানের সাথে যন্ত্রীদের সুসমন্বয়তা বজায় রাখা। পালাকার মঞ্চে প্রবেশের পর থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত তাঁর বর্ণনায়, উচ্চারণে, সঙ্গীতে, চরিত্রে এবং তাঁর শরীর ছন্দে সর্বত্রই বড় বড় করে প্রকাশ করে থাকেন। এই dilation তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বা থেকে চারিত্রিক সত্ত্বাকে পৃথক করে তোলে। dilation শুধু বাহ্যিকভাবে নয় বরং ভাবগত দিক থেকেও করা হয়। এই dilation এর কারণেই সমস্ত performance কে আরও বেশি energetic এবং গতিশীল মনে হয়। অবশ্য, গতিশীলতার আরও অনেক কৌশল রয়েছে। এরপর রয়েছে সুর, ছন্দ ও যন্ত্রের সুসমন্বয়তা। শুধু বন্দনা গীতেই নয়, পালায় ব্যবহৃত সকল গানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। পালাকার তাঁর গানের সাথে সকল যন্ত্রীদের একত্রিত করে একসাথে performance এ ঢুকে যায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় তাহল, গানের শুরু এবং শেষ করার কৌশলে, পালাকার গানটির এক সোম থেকে আরেক সোম-এ আসার পূর্ব পর্যন্ত একাই গেয়ে চলেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং একই সাথে যন্ত্রীদেরকে একটি বিশেষ ইশারায় পরিবেশিত গানকে থামিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত রাখেন। দ্বিতীয় সোমে আসার ঠিক আগমুহূর্তে পালাকার তাঁর যন্ত্রীদের সাথে একত্রে নতুন energy নিয়ে এবং শারীরিক-ছন্দের মাধ্যমে performance এ ঢুকে যান। সহজ ভাষায়, যা পুরো পালাটিকে নতুন করে জমিয়ে তোলেন। এবং গানের তাল, লয় এবং মাত্রার সুসমন্বিত গতি আবার পালাটিকে energetic করে তোলে। গানের শেষটাও একই ভাবে একযোগে শেষ করা হয়। পালাগানের পরিবেশনায় মূল গায়েন উপরোক্ত কৌশলগুলি যে প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে থাকেন সে সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

বন্দনা গীতের পর পালাকার দর্শকদের উদ্দেশ্যে গদ্য বর্ণনের দ্বারা পালাপরিবেশন সংক্রান্ত কিছু কথা (যেমন- সুধী দর্শক আমি এখন আপনাদের সামনে কমলারানীর সাগরদীঘি পরিবেশন করবো। তাহলে দেখুন পালা কমলারানীর সাগরদীঘি) বলে পুনরায় গীত ও নৃত্য সহযোগে পালা শুরু করেন। এ গানে দর্শকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং পালার সূচনা পর্ব বর্ণনা করেন-

"সুসং দূর্গা পরে বাড়ি, দূর্গাপুরে ঘর।
ধর্ম রাজা নাম রাখিয়া জানাইলাম খবর।
বান্দে বাড়ি দালান কোঠা, বান্দে সারি সারি।
বাড়িরও ভিতরে গো করলো সোনারও না পুরী।
সভা কইরে আছেন যত ভদ্র শ্রোতাগণ।
কমলারানীর পালা আমি করিব বর্ণন।"

এখানে পালাগানের সূচনা পর্ব বা পালার প্রেক্ষাপটকে তিনি গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন। গানের শুরুতে মূল গায়েন অভিনয় আসরের পুরো জায়গাটুকু সামনে রেখে তাঁর পেছনে বসা পাইল দোহারদের সামনের ঠিক মাঝ বরাবর স্থানে এমনভাবে দাঁড়ান যেন তাঁর সামনে ও দুপাশের দর্শকের কাছে আদর্শ অবস্থান বলে মনে হয়। এই আদর্শ অবস্থান থেকে তিনি তার পরিবেশনার মূল অংশের শুরু করে থাকেন। 'তিনি (মূল গায়েন) কেন এইরূপ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর মূল পরিবেশনা শুরু করে থাকেন'- জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "এই জায়গায় দাঁড়ালে আমি যেমন সবাইকে (সবার মুখ দেখতে পাই তেমনি যেন সবাই আমাকেও দেখতে পায় সেজন্য এইভাবে আমি গানের শুরুতে আসরে দাঁড়াই। এর ফলে আরোও একটি সুবিধা পাওয়া যায়, তাহল; অধিক টেনশনের কারণে অভিনয়ের প্রথম গানের সুর হয়তো একটু বেসুরা হতে পারে বা হারমোনিয়ামের সুর নাও মিলতে পারে, সর্বোপরি পাইল দোহারদেরকে গানের ধুয়া ধরাতে যে ইশারা দেয়া হয় তা খুব কাছ থেকে দেয়া যায়।"

গীতের অংশ শেষ করে যেরূপে বর্ণনাত্মক অভিনয়ে নিজেকে পরিবর্তন করে থাকেন

গান শেষ করার সাথে সাথেই পালাকার গদ্যে বর্ণনা করেন "সুসংদূর্গাপুরে ছিল ধর্মরাজ নামে। "ঐ যে একদিন, ধর্মরাজকে ডেকে বলে: বাবা ধর্মরাজ। এখানে লক্ষণীয় হল, প্রতিটি পরিবেশনার একটি ছন্দ থাকে। এই ছন্দ সমস্ত পরিবেশনার মধ্যে একইভাবে চলতে থাকে। যদি এই ছন্দে ব্যাঘাত ঘটে বা ছন্দপতন ঘটে তাহলে সমস্ত পরিবেশনার উপর তার প্রভাব পড়ে। যেমন- গানের শেষে বর্ণনা শুরু করার ছন্দটি এরূপ- পাইল দোহার ও যন্ত্রীদলের বাদন সহযোগে ধুয়া পরিবেশনা একযোগে শেষ-stop and then narration will be started -এ রকম। এখানে মূল গায়েন যদি বর্ণনা শুরু করতে একমুহূর্ত বিলম্ব করে তাহলেই এর ছন্দ পতন ঘটবে।

বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয়ে পরিবর্তন

ধর্মরাজ (বর্ণনাকারী)-"মা" আমি তোমার একমাত্র সন্তান, আর তুমি আমার মা। তুমি যখন মনে বাসনা নিয়েছো, তখন আমি তোমার মনের কোন আশা অপূর্ণ রাখব না। আমি বিবাহ করবো। কাল বিলম্ব না করে উজিরকে পাঠিয়ে দেব বৈদেশ নগরে। যেখান থেকে হোক আর যেভাবেই হোক আমার জন্য যোগ্য- উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করে আনবে।

মুহূর্তে চরিত্র ভেঙ্গে দিয়ে ধর্মরাজ বর্ণনাকারী হয়ে যায়, বলে-

বর্ণনা : "এই কথা বলিয়া ধর্মরাজ উজীরের কাছে চলে যায়। লক্ষ্য করে দ্যাখে উজীর বসে আছে রাজদরবারে সোফার উপর পা তুলে। উজীরকে বলে-"

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপাত্মক জায়গা : (মূল গায়েন রাজা চরিত্র হয়ে) -উজীর! (ডায়না তাঁর নিজ আসনে বসেই উজীর চরিত্র হয়ে মূল গায়েনের সাথে সংলাপের আদান-প্রদান করে থাকে)।

(এখানে মূল গায়েন বর্ণনাকারী থেকে উজীর চরিত্রে পরিবর্তনের সময় যখন তিনি বর্ণনাকারী হয়ে উজীর সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তখন তিনি বর্ণনা করতে করতে তাঁর কোমরে বাঁধা কাপড়টিকে (মনের মধ্যে কল্পিত) উজীর চরিত্রের মতো করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন। চরিত্র পরিবর্তনের জন্য কাপড়ের এরূপ ব্যবহার তিনি খুবই দ্রুততার সাথে এবং অভ্যস্ত হাতে করে থাকেন। যেক্ষেত্রে কাপড়ের ব্যবহার জটিল হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে তিনি বর্ণনার পরিমান বাড়িয়ে দেন।)

বর্ণনাকারীর বর্ণনা শুধু গদ্যে নয় বা গীতে নয় পূর্বের আলোচনায় আমরা তাঁর গীত ও গদ্যে বর্ণনা লক্ষ্য করেছি। তিনি কখনও কখনও কাব্যেও বর্ণনা করে থাকেন। যেমন: "ঐ যে এক দুই তিন করিয়া মন, কামলার সর্দার রাজদরবারে হাজির হয়ে যায় তখন। ...।"

মূল গায়েনের চরিত্র পরিবর্তনে ডায়নার ভূমিকা

ডায়না মূল গায়েনের (বর্ণনাকারী) ডানে (দর্শকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে) থাকেন বলেই হয়তো তাঁর নাম 'ডায়না' (ইসলাম উদ্দিনের মত অনুসারে)। যেহেতু তিনি ডান দিকে থাকেন সে হিসেবে তিনি মঞ্চের up-right এ অবস্থান করেন। পালাকার যখন এক চরিত্র থেকে অপর চরিত্রে পরিবর্তনের জন্য সাধারনত ডায়নার কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত রেখে বা পাশের দাঁড়িয়ে ডায়নার করা চরিত্রটি ধারন করেন অতঃপর তাঁর সুবিধামত মঞ্চের কোন স্থানে চলে আসেন । তবে মূলগায়েন বর্ণনা শেষ করে সংলাপাত্মক অভিনয়ে যেতে তিনি প্রকাশ্যেই ডায়নাকে অভিনেয় চরিত্রে সম্বোধন করে থাকেন। বর্ণনাকারী সাধারণত ডায়নার চরিত্র ধারণ করার পূর্বে ছেড়ে আসার চরিত্রের শূণ্য স্থানে কাল্পনিকভাবে পূর্বের চরিত্রটিকে দাঁড়া করিয়ে প্রথম সংলাপটি তাঁর উদ্দেশ্যেই প্রদান করেন এবং এরপর সে আবহ ভেঙ্গে দিয়ে পুরো মঞ্চটি তাঁর মত করে ব্যবহার করেন। পালাগান পরিবেশনে শুধুমাত্র সংলাপাত্মক অভিনয়ের অংশে মূল গায়েন ডায়নার সাহায্য নিয়ে থাকে। সংলাপাত্মক অভিনয়ের এই অংশে তিনি সাধারণত বড় বড় অংশগুলি নিজেই করে থাকেন এবং ছোট ছোট অংশগুলির জন্য ডায়নার সাহায্য নেন্। বর্ণনা প্রধান এই পালাগানের অভিনয়ে ডায়না (সংলাপাত্মক অভিনয় অংশে) যে চরিত্রের হয়ে মূলগায়েনের সাথে সংলাপে অবতীর্ণ হন পরক্ষণেই মূল গায়েন নিজেকে ডায়নার কৃত চরিত্রে নিজেকে ধারন করে অভিনয়ের মধ্যে সাবলীলভাবে চরিত্রের পরিবর্তন করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে নীচে একটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে-

(বাসর রাতের দৃশ্যে)

মূল গায়েন (বর্ণনাকারী চরিত্রে) : রাত দশটার দিকে ধর্মরাজ বাসর ঘরে প্রবেশ করে।
-এদিকে, কমলা সোনার বাটায় পান বানিয়ে সোনার পালঙ্কে বসে অপেক্ষা করে স্বামী ধর্মরাজের জন্য।

ক.

(মূল গায়েন কমলার অপেক্ষার বর্ণনার করতে করতে তাঁর কোমড়ে পেঁচানো শাড়ী মাথায় উপরে টেনে দেন এবং দোহারদের ঠিক সামনের বসার উঁচু অংশে মাঝ বরাবরে ডায়নার দিকে মাথা নিচু নতুন বউয়ের মতো মাথায় ঘোমটা টেনে বসে থাকেন।)

ডায়না (ধর্মরাজ চরিত্রে) : কমলা- কমলা। বেগম। ও আমার টিয়া পাখি।
মূল গায়েন (কমলার চরিত্রে) : স্বামী তুমি এসেছো। ছালাম করি। (উঠে দাড়িয়ে ডায়নার দিকে ফিরে নীচু হয়ে ডায়নার পায়ে সালাম করতে যায়)।
ডায়না (ধর্মরাজ চরিত্রে) : ছালাম লাইগতনা।

খ.

(মাথার কাপড় সরিয়ে মূল গায়েন কিছুক্ষণের জন্য বর্ণনাকারী হয়ে গিয়ে বর্ণনা করে... ।)
মূল গায়েন (বর্ণনাকারী) : ধর্মরাজ কমলাকে ডেকে বলে- "কমলা"।

Dhaka University Institutional Repository

গ.

("কমলা" বলার সাথে সাথেই মূল গায়েন 'ধর্মরাজ' চরিত্রে চলে যান। তিনি এই সামান্য সময়ের বর্ণনার মধ্যে দক্ষতার সাথে তাঁর কোমড়ে পেঁচানো শাড়িটি খুলে কাধ হয়ে কোমড়ে পেঁচিয়ে নেন্ এবং ধর্মরাজের চরিত্রে অবতীর্ণ হন।)

মূল গায়েন (ধর্মরাজ চরিত্রে) : আজ আমাদের বাসর রাত, তাইনা ? কিন্তু আজ সারারাত আমরা পাশা খেলা করে কাটিয়ে দিতে চাই। পাশা খেলায় থাকবে দুটো হারজিত। যদি পাশা খেলায় তুমি হেরে যাও তাহলে তুমি তিন দিনের জন্য যাবে বাপের বাড়িতে আর যদি আমি ধর্মরাজ (জাম) পাশা খেলায় হেরে যাই তাহলে তিন দিনের জন্য আমি থাকবো কুত্তা খানার ঘরে। যাও-যাও পাশার গুটি নিয়ে আসো। যাও। (জাম)।

ঘ.

(উপরের সংলাপাত্মক অংশ থেকে বর্ণনাকারীর চরিত্রে আসতে মূল গায়েন ধর্মরাজের চরিত্রের জন্য ব্যবহৃত শাড়িটির বাধন খুলে একটি নিরপেক্ষ সাধারণ পর্যায়ে নিয়ে আসেন)

মূল গায়েন (বর্ণনাকারী চরিত্রে) : ধর্মরাজের কথা শুনে অবাক হয়ে যায় কমলা। সে তাঁর স্বামীকে ডেকে বলে- "স্বামী" (কমলার চরিত্রের অভিনয় শুরু)।

ঙ.

(কমলার চরিত্রে যাবার পূর্বে মূল গায়েন কমলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে করতে তার অভ্যস্ত হাতে দ্রুততার সাথে কোমড়ের শাড়িটিকে খুলে মাথার উপরে নিয়ে আসেন এবং কমলার সংলাপ শুরু করেন...।)

মূল গায়েন (কমলার চরিত্রে) : স্বামী ! এ কি বলছো স্বামী। আজ তোমার আমার পবিত্র বাসর রাত। আজ এ রাতে পাশা খেলায় হেরে যদি আমি আমার বাপের বাড়ি চলে যাই, তাহলে সবাই আমাকে বলবে আমি অপয়া, কলঙ্কিণী। না স্বামী না, এ হয় না।

ডায়না (ধর্মরাজের চরিত্রে) : ধর্মরাজের হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। যাও পাশারগুটি নিয়ে আসো।

মূল গায়েন (কমলার চরিত্রে) : স্বামী! আজ এ পবিত্র রাতে তুমি আমাকে পাশা খেলতে বল না।

ডায়না (ধর্মরাজের চরিত্রে) : এই দেখ আমার হাতের চাবুক। চাপকে পিঠের সাত পাল্লা ছাল তুলে দেব (হাতে দড়ি নিয়ে কমলার গায়ে চাবুক মারতে থাকে।)

মূল গায়েন (কমলার চরিত্রে) : আল্লাগো, আল্লারে! (কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ায় এবং বর্ণনা শুরু করে)।

মূল গায়েন (বর্ণনাকারী চরিত্রে) : অসহায়, নিরূপায় কমলা পাশার গুটি নিয়ে আসে পাশা খেলার জন্য। শুরু হয় পাশা খেলা...।

(এরপর গান শুরু- খেলা লাগিল রে, সোনারই পালঙ্কে খেলা লাগিল রে...।)

পালাগানে মূল গায়েনের চরিত্র পরিবর্তনে ডায়নার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বাসর রাতের উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশকে ক,খ,গ,ঘ ও ঙ এই পাঁচটি অংশে ভাগ করে নিতে পারি। পূর্বেই একটি বিষয় সম্পকে জেনে রাখা দরকার যে, মূল গায়েন যখন কোন বর্ণনা শেষে সংলাপাত্মক অংশে যান তখন বর্ণনার শেষে একটি জাম ব্যবহার করেন। যেমন- ধর্মরাজের পুত্র সন্তান জন্মের খবর পাবার পরে, বর্ণনা-

ধর্মরাজ চলে যায় উজিরের কাছে। গিয়ে লক্ষ্য করে চায় উজির বসে আসে তাঁর দরবারে। বলে উজির ! (জাম)। এখানে বর্ণনার শেষে 'বলে উজির' বলে জাম দেবার সময় মূলগায়েন তাঁর হাতের ইশারায় ডায়নাকে উজির চরিত্র হিসেবে নির্দেশ (stablish) করে দেয়। ফলে যখন ডায়না উজির হয়ে মূল গায়েনের সাথে সংলাপে অবতীর্ণ হয় তখন ডায়নাকে উজির চরিত্র রূপে বুঝতে আমাদের আর অসুবিধা হয়না বা উজির চরিত্র হিসেবে ডায়নার অভিনয়কে অসামাঞ্জস্য বা বেমানান মনে হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে উপরের আলোচ্য 'ক' অংশে মূল গায়েন বর্ণনাত্মক অভিনয় শেষে যখন কমলার সাঁজে মাথায় ঘোমটা টানা কমলা (নববধূ) হয়ে আসরে বসে থাকেন তখন কিন্তু তিনি ডায়নার দিকে কোন চরিত্রে অভিনয় করার নির্দেশযুক্ত ইশারা করেন না। তারপরও ডায়না যখন ধর্মরাজ হয়ে ' কমলা- কমলা। বেগম। ও আমার টিয়া পাখি।' সংলাপটি প্রক্ষেপণ করেন তখন মূল গায়েনের কমলার সাজে অভিনয়ে দর্শকের মনোযোগ আরোও বেশি কেন্দ্রীভূত হয়। 'খ' অংশে মূল গায়েন কমলার চরিত্রের অভিনয় ছেড়ে বর্ণনাকারী হিসেবে কমলার বর্ণনা করেন। এই বর্ণনার ভেতর দিয়ে তিনি 'গ' অংশের ধর্মরাজের চরিত্র ধারণ করেন। ধর্মরাজের চরিত্র ধারণের সময় তিনি বর্ণনা করতে করতে ডায়নার ডান পার্শ্বে চলে যান। তিনি তাঁর বাম হাত ডায়নার মাথার উপরে রেখে 'ধর্মরাজ কমলাকে ডেকে বলে- "কমলা' অংশটুকু বলেই সরাসরি অভিনয় আসরের সামনের দিকে বাম পার্শ্বে (দর্শকের দিক থেকে - right down stage) চলে আসেন এবং কোনাকুনিভাবে ডায়নার মুখোমুখি হয়ে সংলাপে অবতীর্ণ হন। 'গ' অংশের ধর্মরাজের চরিত্র থেকে 'ঘ' অংশের বর্ণনাকারীর চরিত্রে আসতে মূল গায়েন শুধুমাত্র শাড়ীর ব্যবহারের পরিবর্তন করে থাকেন। 'ঘ' অংশের বর্ণনাকারী থেকে 'ঙ' অংশের কমলার চরিত্রে আসতে মূল গায়েন কিন্তু আগের মতো ডায়নার পাশে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত রাখেন না। এক্ষেত্রে বর্ণনার সময়ে তাঁর 'গদ্য-বর্ণন' প্রক্ষেপণের কৌশল এবং তার পূর্বে কমলার প্রতি ধর্মরাজের সংলাপের গুরুত্ব তাঁকে সহজেই 'ঙ' অংশে ধর্মরাজের চরিত্রে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। যদিও সংলাপাত্মক অভিনয়ের প্রধান অংশগুলি তিনি নিজেই করে থাকেন, তদুপরি সংলাপাত্মক অভিনয়ে মূল গায়েনকে সংলাপের সূত্র ধরিয়ে দিতে ও চরিত্র পরিবর্তনে ডায়নার ভূমিকা মোটেও সামান্য নয়।

চরিত্র পরিবর্তনে মূল গায়েন শরীরের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন এনে থাকেন

বর্ণনাকারী শুধু third person এ বর্ণনা করেন না, third person -এ চরিত্রাভিনয়ও করেন। যেমন- "কমলারানী কাঁদতে কাঁদতে কলসী তুলে নিয়ে হাটতে হাটতে (পরিক্রম) চলে যায় সাগর দীঘির পাড়ে। লক্ষ্য করিয়া দেখে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ঐ সাগর দীঘির পাড়ে। মনে মনে বিবেচনা করে হায় কপাল! স্বামী আমার জন্য সাগরদীঘি দিয়েছে, আমি স্বামীর কথা অমান্য করব না। এই বলে কমলা সাগরদীঘিতে নেমে যায়।" এই বর্ণনাটুকু মূলগায়েন কমলা চরিত্রের হয়ে কমলার মত করেই করে থাকেন। বিশেষ করে বর্ণনাত্মক অংশের (বর্ণনা: মনে মনে বিবেচনা করে...) পরের বর্ণনা হুবহু কমলার মত করেই করে থাকেন। এছাড়াও তিনি কয়েকটি চরিত্রের অভিনয়ে শরীরের মধ্যে যে পরিবর্তন এনে থাকেন তা নীম্নে বর্ণনা করা হল :

যেমন- গণকের অংশে তিনি কোমড় বাঁকিয়ে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে (দেখলে মনে হবে বার্ধক্যজনিত কারণে) হাতে একটি পুথির মালা এবং বোগলে একটি বালিশ নিয়ে দরিদ্র পীড়িত বৃদ্ধের মতো চলতে থাকেন যেন তিনি কানেও খুব কম শুনতে পান।

আবার, কালরাজ চরিত্র করার সময় চোখে মুখে প্রচণ্ড হিংস্রতা নিয়ে আসেন। হাত-পা কেমন বড় বড় করে হেলে দুলে চলতে চলতে গলার স্বর বিকৃত করে অভিনয় করে থাকেন।

পরীর চরিত্রে অভিনয় করার সময় তিনি পায়ের পাতার সামনের দিকে 'টো' এর উপরে ভর করে শরীরকে একেবারে হালকা করে পরীর মুভমেন্টগুলি করে থাকেন দেখলে মনে হবে সত্যিই লোকটি যেন বাতাসে ভাসছে।

মূল গায়েন তাঁর কোমড়ে পেঁচানো শাড়ী, বালিস সহ অন্যান্য প্রপস্ যেভাবে ব্যবহার করেন

অভিনয়ে শাড়ির বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। প্রথমে তিনি শাড়িটির একমাথা কোমড়ে পেঁচিয়ে অন্য মাথা সামনের ডান পার্শ্ব থেকে ঘুরিয়ে এনে শরীরের বাম কাধের ওপর থেকে পিছনের ডান পার্শ্ব থেকে নিয়ে আবার পেঁচিয়ে রাখেন। কিন্তু অভিনয়ের প্রয়োজনে তিনি শাড়িটিকে কখনো কমলার শাড়ী, কখনো পরীর ডানা, কখনো কোদালের আচারী, আবার কখনো ডুবন্ত কমলার চুল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বালিশ-এটিরও বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ঘোড়া, চিঠি, কোদাল, মাটির ঝুড়ি, প্রভৃতি। এ ছাড়াও প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করেন। যেমন- পুথির মালাগুলি কখনও পাশা খেলার গুটি, টাকা-কড়ি ইত্যাদি। লোকনাট্যে মুকাভিনয়ের প্রয়োগ রয়েছে। তবে একেবারে শুদ্ধ মুকাভিনয় নয়। অনেকে মনে করেন- লোকনাট্যের অভিনয়ে প্রপসের ব্যবহারের জন্য তাঁদের অভিনয়ে পিওর মাইম ব্যবহৃত হয় না।

যেমন- পরীর চরিত্রে অভিনয়ের সময় মূল গায়েন তাঁর কোমড়ে পেঁচানো শাড়ীর আচলকে দুই হাতে পেছনে উড়িয়ে অভিনয় করেন। পাগলা ঘোড়ার দৃশ্যে তিনি বালিশটিকে দুই পায়ের মাঝখানে রেখে বালিশের সামনের উপরের দিকের কোনার অংশ বাম হাতের মুঠোয় ধরে ডান হাতে দড়ি নিয়ে চাবুকের মতো ব্যবহার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাটি কাটার দৃশ্যে বালিশটিকে কোদালের মতো ব্যবহার করে মাটি কাটার অভিনয় করেন। আবার বালিশটিকে মাটি ভর্তি ঝুড়ির মতো ব্যবহার করে মাটি কাটার কামলাদের অভিনয় করে থাকেন।

ব্যবহারের প্রক্রিয়া

মূল গায়েন সাধারণত যখন বর্ণনাত্মক অভিনয় করেন তখন তা গদ্য/গীত/বর্ণনা যে কোন কিছুতেই হতে পারে। বর্ণনাত্মক এসব অভিনয়ে মধ্যে বর্ণনার সময় তিনি প্রয়োজন অনুসারে তাঁর ব্যবহৃত প্রপস্‌গুলি ব্যবহারের প্রস্তুতি নেন। বর্ণনার অংশ শেষ হলেই তিনি সেগুলির ব্যবহার করে অভিনয় করে থাকেন। যেমন- বিয়ের প্রস্তুতিপর্বে কমলা সাজ-গোজের গানের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

ধুয়া : কন্যা সাজে সাজে গো কন্যা বইসা নিরালায়।

গীত :
হাতে দিল হাত বালা কানে দিল দুল,
পায়ে দিল সোনার নুপুর বাজে ঝুমুর ঝুম।
ধুয়া : ... ।
সাজিয়া গুজিয়া কন্যা মুখে দিল পান,
ঘর থাইক্যা বাহির হইল পূর্ণিমারই চান।
ধুয়া : ... ।

বর্ণনা : কন্যার সাজাগোজা কমপ্লিট (শেষ) হয়ে যায়।

বর্ণনায় আসার পূর্বমুহূর্তে গীত চলাকালে মূলগায়েন যখন "সাজিয়া গুজিয়া কন্যা মুখে দিল পান...।" অংশটি পরিবেশন করেন তখন তিনি ডায়নার কাছে এসে বসে একটি কালো চশমা চোখে পড়েন। আর "ঘর থাইক্যা বাহির হইল পূর্ণিমারই চান" এই চরণটি গেয়ে যাবার ঠিক শেষ মুহূর্তে তিনি চশমা চোখে দর্শকদের দিকে ফিরে গানের ছন্দে সামান্য নৃত্য পরিবেশন করেন, যা দর্শকের কাছে ম্যাজিকের মতো মনে হয়। দর্শক উল্লাসিত হয়। এর ফলে পালার পরিবেশনা যেমন আকর্ষণীয় হয় তেমনি পরিবেশনার প্রতি দর্শকের আগ্রহ আরোও বেড়ে যায়।

অভিনয়ে স্থানের পরিবর্তন

শুধু চরিত্র পরিবর্তনের জন্য স্থানের পরিবর্তন নয়, বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করতেও মূল গায়েন বিশেষ কৌশল ব্যবহার করেন। সাধারণত এক্ষেত্রে পরিক্রমা রীতির ব্যবহার করে থাকেন। অভিনয়ে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে যখন বর্ণনা করেন তখন বর্ণনার মাধ্যমে এবং যখন ১ম ব্যক্তি হিসেবে অভিনয় করে থাকেন তখন পরিক্রমার মাধ্যমে স্থানের পরিবর্তন করে থাকেন।

'গীত' পালাগানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন- টিয়া পাখি হয়ে : "ক্যামন মায়ে কান্তেগো আছে মন্দিরের ভিতরে, তাহার কাছে যাবো গো আমি আল্লা জিজ্ঞাস্ করবার জন্য... বল বল প্রাণের মায়া বলনা আমারে, ... তোমায় আমি মা জানিলাম গো আল্লা এ মায়ার সংসারে... ।" আবার মা বলছে-"শোন শোন প্রানের ময়না বলি যে তুমারে, আমায় তুমি মা ডাকিলে গো আমার বুকে আগুন ধরে ... ।" আবার বর্ণনাত্মক গীত রয়েছে যেমন: "কন্যা সাজে সাজেগো কন্যা বইসা নিরালায়, কন্যা সাজে ...., আরে মুরগ মার্কা নারকেল তেল লয়ে হাতের মাঝে, ঘষিয়া ঘষিয়া কন্যা লাগায় কেশের মাঝে। কন্যা সাজে ... ।" এই বর্ণনাত্মক গীতে লক্ষণীয় হল, এখানে নৃত্যের সাথে সাথে third person এ কমলা সুন্দরীর অভিনয়ও চলতে থাকে।

মূল গায়েন যেভাবে দোহারদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখেন

গায়েনের সাথে দোহারদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি গানের শুরুতে যে লাইনটি তারা (পাইল-দেহারেরা) সমস্ত গান জুড়ে ধুয়া হিসাবে গেয়ে থাকেন, সে লাইনটি মূল গায়েন প্রথমে ধীর লয়ে দোহারদের কাছে তুলে দেন। দ্বিতীয়বারে তিনি গানের প্রথম সোম থেকে দ্বিতীয় সোমে প্রবেশের মুহূর্তে তাঁর যন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে ইশারা মিশ্রিত বিশেষ দেহভঙ্গী করে (হাতের ইশারা, চোখের ইশারা, মাথা অথবা আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা ইত্যাদি) ঢোলকের তেহাই যোগে অত্যন্ত জোরালোভাবে energy নিয়ে দ্রুত লয়ে গান শুরু করেন এবং বাদ্যযন্ত্রসহ সমস্ত দোহারদের নিয়ে Performance এ চলে যান। ঐ একই লয়ে গানের সমস্ত অংশটি

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশন করেন এবং গানের শেষটাও বিশেষ ইশারায় বিশেষত পেছনের দিকে পাইল-দোহারদের উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে ইশারা করে একযোগে থামিয়ে দেন।

প্রপস্

পালাগানে মূল গায়েন প্রপস্ হিসেবে লাল বেনারসী শাড়ি এবং একটি বালিশ ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও চাবুক, গামছা, মালা, চশমা, বাঁশি, ব্যাগ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন।

মূল গায়েন যেভাবে সমস্ত পালার পরিবেশনায় tempo ধরে রাখেন

যে কোন পরিবেশনাকে গতিশীল এবং উপভোগ্য করে তোলার পূর্ব শর্ত হচ্ছে এর Tempo বা গতিময়তা বজায় রাখা। পালাগান পরিবেশনে মূল গায়েন এ ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকেন। এজন্য তিনি energetic জাম এবং নৃত্যযোগে গীত পরিবেশনাকে বেশি প্রধান্য দেন। এছাড়াও সমস্ত পালার ছন্দ নির্ধারণে পালাকার অভিনয়ের পাশাপাশি দর্শকের মনোভাব বুঝে নেন। দর্শকের মনোভাব বোঝার জন্য দর্শক শ্রেণীর রুচি বৈচিত্রের ওপর এবং তাঁদের চাহিদার ওপর নির্ভর করে দর্শকের মধ্যে রস সঞ্চার করেন। মূল গায়েন যদি মনে করেন দর্শকের চাহিদা যদি করুণ রসের হয় তবে করুণ-গীত ও সংলাপের মাত্রা বাড়িয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যান। আবার সরস হাস্যময় কৌতুকধর্মীর চাহিদা মনে হলে হাস্যরসাত্মক গীতসহ কিছু অশ্লীল সংলাপ ও অঙ্গভঙ্গীর মাত্রা বাড়িয়ে দেন। তবে দর্শক ধরে রাখতে যে রসই ব্যবহার করেন না কেন, তার Tempo সব সময় তিনি বজায় রাখেন। এজন্য energy এবং dilation এর সাথে ব্যবহৃত নৃত্যগীত এসবই গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক চরিত্রায়ন, কাহিনী ও পেস্ এর ভেরিয়েশন ইত্যাদি মূল কাহিনী ঠিক রেখে ইচ্ছে মত বাড়ানো যায়, তবে অবশ্যই তা দর্শকের রুচির উপর নির্ভর করে। যেমন- গানের ভিন্নতার জন্য লয় ঝুলিয়ে বা বাড়িয়ে দিলেই হয়। যে কোন অভিনয়ের শুরুটা Energy দিয়ে ধরতে হয়। যেহেতু একটি জায়গা থেকে আরেকটি জায়গার পেস্ আলাদা সে কারণে চরিত্রায়নের জন্য মূল গায়েন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে নিজেকে রিলেট করে নেন্। যেমন- বর্ণনার সময়ে ন্যারেটরের কথাটা কমলার মত করেই বলে থাকেন।

লোকনাট্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় জায়গা হল 'প্রাণ'। উচ্চকীত তেজ, জমাট বাধা গানের সুর, সব কিছু মিলিয়ে 'প্রাণ'টাকে আনা। পরিবেশনায় Studyness থাকে তাঁদের মধ্যে। প্রশ্ন জাগতে পারে, এর দ্বারা 'প্রাণ'কে অভিনয়ের সাথে মেলানো যায় কি করে? ডেফিনিটভাবে স্থানের পরিবর্তনের জন্য পরিক্রমণরীতি ব্যবহার বা ঘুরে 'জাম' দেয়া লোকনাট্যের অভিনয়ে একটি সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে বিবেচিত। যার নির্দিষ্টভাবে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন প্রথমে কথায়, তারপরে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে এই ক্রিয়া হল 'ঘটমান বর্তমান'। অভিনয়ের কষ্টের জায়গায় মূল গায়েন কথার মধ্যেও করুণ রস আনার চেষ্টা করে থাকেন। গানের মধ্যেতো করুণ আসবেই। যেমন- "যাইগা যাইগা প্রাণের বাবা ছাড়িয়া তোমারে"। করুণ অর্থ শরীরকে নিস্তেজ করে কথা বলা নয়। করুণ রসের মধ্যেও Energy নিয়ে কাজ করতে হয়। Space Transformation ছাড়াও হাজার হাজার লোক বোঝাতে পরিক্রমণ রীতি ব্যবহার করেন। পুরো এ্যাকশনকে ভাগ করে এ্যাকশনটা কি তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে সম্পাদন করে থাকেন। যেমন- "এইনা মুখটা দেইখা গো বাবারা ক্ষমা কইরা দিবেন।" এই অংশটুকুর মধ্যে মূল গায়েন গানের শুরুর দিকটা জোরালো করেতো ধরছেনই, তারপর এই গান পরিবেশনের সময় গানের চরণগুলি বলার সাথে সাথে তাঁর মুখের ওপর টেনে দেয়া ঘোমটার কাপড়টিকে সরিয়ে সবার সামনে নিজেকে উন্মোচন করেন। এখানে পুরো গানের অংশটিকে একটি বড় ইউনিট হিসেবে ধরা যেতে পারে। একটি বড় ইউনিট এর এ্যাকশনগুলি পরিষ্কার রেখে তাকে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে অভিনয় করেন। সুর ঠিক করার জন্য আগে আগ্রহভরে বর্ণনা করে তারপর হারমোনিয়ামের সাথে সুর মেলানোর জন্য কথার সাথে হাতের আঙ্গুল দিয়ে হারমোনিয়ামের রিড বাজানোর ভঙ্গি করে গান ধরে থাকেন। দর্শকের আগ্রহকে ধরে রাখার জন্য নতুন-নতুন, মজার মজার তালের সুর ও গান দিয়ে শুরু করেন।

ইসলাম উদ্দীন পালাকার তাঁর এই পালাগানের মধ্যে উপরোক্ত সকল বৈশিষ্ট্য ও নীতি সুচারু রূপে ও দক্ষতার সাথে করে থাকেন। এ কারণেই পালাগান দর্শক নন্দিত হয়ে থাকে। চরিত্র পরিবর্তনের কৌশল হিসেবে আরও রয়েছে দেহভঙ্গীমা ও স্থানের পরিবর্তন এবং ডায়নার কাছ থেকে চরিত্র বদল করা। নারী চরিত্রের জন্য লাস্য এবং পুরুষ চরিত্রের জন্য তাণ্ডব এদুটি ভাব ব্যবহার করে দেহ ভঙ্গীমা পরিবর্তন করে থাকেন। এছাড়া স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যতা তুলে ধরেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব স্থানকে নাট্যিকস্থানে রূপান্তর অথবা ফুলের বাগান, পাতাল বন ইত্যাদি যেরূপে বিশ্বাস করানো হয়

বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি দর্শকের কাছে তাঁর সমস্ত পরিবেশনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। ইসলাম উদ্দিনের কথায়- "যদি সুসং দুগাপুরে ধর্মরাজ থাকতে পারে তাহলে পাতালে কালরাজও থাকতে পারে।"[১৩০] এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা Stage Transformation এ তিনি দর্শকের মনের তন্ময়ভাবকে কাজে লাগান। কথার ভেতরে ছন্দ আছে। এই ছন্দ পরিবর্তনের দ্বারা কথার মধ্যের শক্তিকে ধরে রাখেন। তিনি বলেন- এই শক্তি বাইরে থেকে নয়, তাকে ভেতরগত শক্তি হতে হবে। বাস্তব আয়তন নাট্যিক আয়তনে রূপান্তরিত হয় এই ভেতরগত শক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা।

গানের সুর বেসুরো হলে মূল গায়েন যেরূপে সুর ঠিক করে নেন

মূল গায়েন বাদ্যযন্ত্রের তালে-তালে, নেচে-নেচে নিজের সুর ঠিক করে নেন্। শুরু করাটা হল Definitely শুরু করা। একটি পরিষ্কার জায়গা থেকে, একটি সবল জায়গা নিয়ে ধরে থাকেন।

'জাম' এর ব্যবহার এবং এর গুরুত্বপূর্ণতা

যেই মুহূর্তে বর্ণনা শেষ হয়ে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি 'জাম' ব্যবহার করে চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। 'জাম' ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণত ক্রিয়া পদের শেষ শব্দ গুলির উপর জোর দিয়ে থাকেন।

যেমন- লক্ষ্য করে 'চায়' একটি শব্দ। 'চায়' তার একটি ক্রিয়াপদ। অথবা বর্ণনাকারী হিসেবে ধর্মরাজের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন; "ধর্মরাজ তাঁর মাকে বলে-'মা', তুমি আমার মা, আর আমি তোমার একমাত্র সন্তান...। এখানে তিনি ধর্মরাজ সম্পর্কে বর্ণনা শেষ করে যখনই বলছেন, ধর্মরাজ তার মাকে বলে - মা', এখানে 'মা' শব্দের শেষে মা-আ শব্দ উচ্চারণের সময় 'জাম' ব্যবহার করেন। এখানে লক্ষণীয় হল, 'মা' শব্দটি কোন ক্রিয়া পদ নয়। কিন্তু তিনি এখানে 'মা' শব্দটি ব্যবহার করছেন তার মাকে ডাকা অর্থে। এইদিক থেকে 'মা' শব্দটি একটি ক্রিয়াপদের অর্থ প্রকাশ করছে। তিনি 'জাম' ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ক্রিয়াপদরূপ শব্দের উপর জোর দেন এবং শরীরে তীব্র ঝাকুনি দেন । এরপর এক সেকেণ্ড, দুই সেকেণ্ড-তিন সেকেণ্ড নীরাবতা, তারপর তিনি পরিবর্তিত চরিত্রের অভিনয় করেন। 'জাম' ব্যবহারে বাদ্যযন্ত্রগুলির সম্মিলিত একটি জোরাল শব্দ এবং শরীরের তীব্র ঝাকুনি পরিবর্তিত চরিত্রকে দৃঢ়তা এনে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু শারীরিক পরিবর্তনের ফলে আমাদের কাছে পরিবর্তিত চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে এবং আকর্ষণীয় মনে হয়।

জামের ব্যবহারের আরেকটি উদাহরণ

পালাগানে পরিবেশনে মূল গায়েন চরিত্র থেকে চরিত্রান্তরে যেতে ব্যবহৃত 'জাম' কৌশলটি সম্পর্কে পূর্বেই জেনেছি; 'জাম' শব্দটি হল ঢোল-করতাল-মন্দিরাসহকারে একযোগে তেহাই দেবার ফলে সম্মিলিত-যে জোরালো শব্দ। পালাগানে এই 'জাম' শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বাদ্যযন্ত্রের জামের জোরালো শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মূল গায়েন সমস্ত শরীরে একটি ঝাকুনি দিয়ে এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে পরিবর্তিত করে থাকেন। সাধারণত দুই রকমভাবে চরিত্র পরিবর্তন করে থাকেন। চরিত্র থেকে চরিত্রান্তরে যাবার জন্য মূলগায়েন 'জাম' কৌশলটি ব্যবহার করে থাকেন। দোহারের মধ্যে যিনি ডায়না তিনি নিজের জায়গাতে বসেই তার (মূল গায়েন) সাথে সংলাপে অবতীর্ণ হয়ে কখনও কখনও মূল গায়েনকে জাম ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরী করে দেন। আবার কখনও কখনও মূল গায়েন নিজেই চরিত্র পরিবর্তনে জাম ব্যবহারের ক্ষেত্র রচনা করে চরিত্র থেকে চরিত্রে পরিবর্তিত হয়ে থাকেন। মূল গায়েনের চরিত্র পরিবর্তনে 'জাম' ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নীচে উদ্ধৃত করা হল :

(পাতাল নগরের কালরাজের দৃশ্যে)

'ক'

মূল গায়েন (বর্ণনাকারী চরিত্রে) : পাতাল নগরে ছিলো এক রাজা নাম তার কালরাজ। (এ সময় মূল গায়েন ভয়ংকর হিংস্রতা ও তীব্রতা ফুটিয়ে তুলে কালরাজের চরিত্রে পরিবর্তিত হয়ে পরের বর্ণনাগুলি করতে থাকে)।

বর্ণনা :

---

[১৩০] সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ইসলাম উদ্দিন বয়াতী ও তাঁর দল, টিএসসি সেমিনার (৩য় তলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সে ছিলো ৬৫ হাজার পরী আর ৮০ হাজার দেও-দানবের সরদার। (এর পরের বর্ণনার অংশগুলি ঠিক একজন সাধারণ বর্ণনাকারীর মতোই, যার মধ্যে পূর্বের কৃত চরিত্রের কোন ছাপই লক্ষ্য করা যায় না)।

বর্ণনা:

ঐ যে, পরীদের মধ্যে এক পরী কালরাজকে এসে বলে-

মূল গায়েন (পরী চরিত্রে) : সরদার (জাম)।

ডায়না (কালরাজ চরিত্রে) : কি খবর পরী ?

মূল গায়েন (পরী চরিত্রে) : সুখবর সরদার।

ডায়না (কালরাজ চরিত্রে) : কিরাম্ খবর ?

মূল গায়েন (পরী চরিত্রে) : গিয়েছিলাম সুসংদূর্গাপুরে রাজা ধর্মরাজের ফুলের বাগানে। সেখানে এক অপরূপা সুন্দরীকে দেখে এলাম। নাম তার কমলা।

ডায়না (কালরাজ চরিত্রে) : কমলা ! সে কী নামের কমলা না খাওনের কমলা ?

মূল গায়েন (পরী চরিত্রে) : নামের কমলা হুজুর।

'খ'

মূল গায়েন (বর্ণনাকারী চরিত্রে) : ঐ যে, শুনিয়া বাণী কালরাজ পরীদেরকে ডেকে বলে

মূল গায়েন (কালরাজ চরিত্রে) : পরী ! (জাম)

ডায়না (পরী চরিত্রে) : হুজুর !

মূল গায়েন (কালরাজ চরিত্রে) : কেন, কেন, কেন তোমরা তাকে নিয়ে আসনি ?

ডায়না (পরী চরিত্রে) : সে ছিলো সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা হুজুর।

মূল গায়েন (কালরাজ চরিত্রে) : অন্তঃসত্ত্বা ! তোমরা হয়েছো দেখে পাগল আর আমি হয়েছি না দেখে পাগল। যাও যাও তোমরা আমার 'বাংলা ঘর' দুধ দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। সেখানে আমি দুধ পান করবো আর বসে বসে কমলার ধ্যান করবো। যখন আমি তাঁকে আমার পাতাল নগরে নিয়ে আসতে পারবো তখন আমি আমার ধ্যান ভঙ্গ করবো। যাও যাও যাও। (জাম)-এরপর মূল গায়েন বর্ণনাকারীর চরিত্রে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

মূল গায়েনের অভিনেয় চরিত্র পরিবর্তনে 'জাম' ব্যবহারের কৌশল আলোচনার সুবিধার্থে আমরা উপরের উল্লিখিত অংশকে 'ক' ও 'খ' রূপে দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। 'ক' অংশে মূল গায়েনকে দেখা যায় সে নিজে বর্ণনাকারী থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরীর চরিত্র ধারণে জাম কৌশলটি ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরী করে দেন। যেমন- পরীর চরিত্র ধারনের পূর্বেই তিনি কালরাজ সম্পর্কে, তার ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করছেন এবং সে (কালরাজ) কোন প্রকৃতির, তাঁর বৈশিষ্ট্যও তিনি বর্ণনাত্মক রীতির মাধ্যমে অভিনয় করে দেখাচ্ছেন । তারপর তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করবেন সেই চরিত্রের অভিনয়ের ক্ষেত্র সম্পর্কেও বর্ণনা করেন। যেমন- 'ঐ যে, পরীদের মধ্যে এক পরী কালরাজকে এসে বলে-'। এই বর্ণনার মধ্যে মূল গায়েন যে চরিত্রে পরিবর্তিত হচ্ছেন এবং ঐ চরিত্রে যার সাথে কথা বলবেন তাও উল্লেখ করে দেন। ফলে ডায়নার সাথে মূল গায়েনের পরিবর্তিত চরিত্র ধারনের দ্বারা সংলাপাত্মক অভিনয়ের শুরুতে 'জাম' এর ব্যবহার অভিনেয় দৃশ্যটিকে একটি নতুন আবহ তৈরীতে ও গতি সঞ্চার করতেও সাহায্য করে। 'ক' অংশের মধ্যে ডায়নাকৃত কালরাজ ও মূলগায়েনকৃত পরী সম্পর্কে আমরা মোটামুটি ধারনা লাভ করি। এই ধারনার পরিপূর্ণতা লাভ করে 'খ' অংশে এসে। 'খ' অংশে মূল গায়েনকে কালরাজ চরিত্রে এবং ডায়নাকে পরী চরিত্রে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এই দুই অংশে নাম শব্দ যেমন- পরী, কমলা, অন্তঃসত্ত্বা, কালরাজ ইত্যাদির সাথে 'জাম' ব্যবহৃত হয় বলে পরিবর্তিত চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ধারনের তীব্রতা স্পষ্টরূপেই অনুভব করা যায়।

'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালা লোকনাট্যের অভিনয় রীতির অন্তর্গত মিশ্র রীতি পর্যায়ের। এখানে বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক গীত, গদ্য প্রভৃতি অভিনয় উপাদানগুলি রয়েছে। এর পালাকার শুরু থেকেই গদ্যে বর্ণনা করেন। বন্দনার পরবর্তী সূচনা গীত অংশ এবং ধর্মরাজের জন্য উজিরের পাত্রী খুজতে যাওয়া অংশে বর্ণনাত্মক গীত ব্যবহার করেছেন। আবার এরই মধ্যে গদ্য বর্ণনও ব্যবহার করেছেন। গদ্য বর্ণনা শেষ হবার সাথে সাথেই ডায়নার সাথে সংলাপে অবতীর্ণ হচ্ছেন। এর জন্য মূল গায়েনকে এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে পরিবর্তিত হতে হচ্ছে। এই চরিত্র পরিবর্তনেও রয়েছে দুটো পর্যায়। প্রথম পর্যায় হল : কাহিনীর প্রয়োজনে। যেমন- কালরাজ, পরী, ধর্মরাজ, ধর্মরাজের মা, পাখী, কামলা সর্দার ইত্যাদি। কাহিনীর চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে তিনি পূর্বোক্ত চরিত্রগুলির একটি থেকে অন্যটিতে নিজেকে পরিবর্তিত করেন। দ্বিতীয় পর্যায় হল : নাট্য কাহিনীকে পরিবেশনার প্রয়োজনে অর্থাৎ মূল গায়েনের অভিনয়ের বর্ণনাত্মক দিক। যেমন- কাহিনী পরিবেশনে তাকে কখনও কখনও একটি নিরপেক্ষ জায়গা (চরিত্র) থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করতে হয়, যেখানে তিনি-ধর্মরাজ, কালরাজ বা কমলা এরূপ কোন চরিত্রের নয়। পালাগান পরিবেশনায় এসব চরিত্র পরিবর্তনে কয়েকটি কৌশল রয়েছে। বর্ণনাকারী থেকে অভিনেয় চরিত্রে বা এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে পরিবর্তনের ঠিক শুরুর মূহূর্তে পালাকার কোন রকম সময়ের ব্যবধান না রেখেই এমন জোর দিয়ে সংলাপ উচ্চারণ করেন যাতে পরিবর্তনটি স্পষ্ট হয়। যেহেতু লোকনাট্যে সব কিছুই মোটা দাগে উপস্থাপন করা হয় সে কারণে চরিত্র পরিবর্তনে সমস্ত নারী ও পুরুষ চরিত্রের জন্য দুটো মূলনীতি পালন করে হয়ে থাকে। যেমন- স্ত্রী-চরিত্রের জন্য লাস্য-মমতা এবং পুরুষ চরিত্রের জন্য তাণ্ডব। এ দুটোকেই আবার Dialation এর মাধ্যমে বড় বড় করে ফুটিয়ে তোলা হয়। এছাড়া দ্বিতীয়ত চরিত্র ধারণের সময়ে সংলাপের মাঝে মাঝে কোন শব্দের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়ে উচ্চারণ করে 'জাম' ব্যবহার করে চরিত্রটিকে Energetic করে রাখেন। সাধারণত অভিনয়ে বর্ণনা ও চরিত্রকে আলাদা করার জন্যই 'জাম' ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি 'জাম' performance কে নতুন করে আরও Energetic করে তোলে বলেই পালাগানে 'জাম' এর ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে।

মূল গায়েন যেরূপে অভিনয় আসরটিকে ব্যবহার করেন

বর্ণনাকারী ডায়নার সাথে সাধারণত কোনাকুনি অবস্থানে থেকে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশ নিয়ে থাকেন। যেমন- ডায়না up left (দর্শকের দিক থেকে) এ বসে এবং down right এ মূল গায়েন বা পালাকার। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের অংশটি আলোচনা করে দেখা যেতে পারে:

পরীর দৃশ্যে :

মূল গায়েন (বর্ণনাকারী চরিত্রে) : পাতাল নগরে ছিলো এক রাজা নাম তাঁর কালরাজ। সে ছিলো ৬৫ হাজার পরী আর ৮০ হাজার দেও-দানবের সরদার। *ঐ যে, পরীদের মধ্যে এক পরী এসে কালরাজকে বলে-*

এই বর্ণনার পরে মূল গায়েন Down Right এ গিয়ে *'ঐ যে, পরীদের মধ্যে এক পরী এসে কালরাজকে বলে'* বর্ণনাংশ শেষ করে পরী রূপে পরবর্তী সংলাপাত্মক অংশে চলে যায় যা নিম্নরূপ-

মূল গায়েন (পরী চরিত্রে) : সরদার (জাম)।
ডায়না (কালরাজ চরিত্রে) : কি খবর পরী ?
মূল গায়েন (পরী চরিত্রে) : সুখবর সরদার।.. । ইত্যাদি।

আবার পরীর চরিত্র করতে করতে মূলগায়েন কখনও down left এ চলে আসেন। যেমন- নীচের অংশে পরী চরিত্রে অভিনয়ে মূল গায়েন যখন সুসংদূর্গাপুরে গিয়ে দেখা কমলার রূপের কথা কালরাজের কাছে বর্ণনা করেন তখন তিনি down left এ গিয়ে পরীর চরিত্রে ঐ বর্ণনাত্মক অভিনয় করে থাকেন-

ডায়না (কালরাজ চরিত্রে) : কিরাম্ খবর ?
মূল গায়েন (পরী চরিত্রে) : গিয়েছিলাম সুসংদূর্গাপুরে রাজা ধর্মরাজের ফুলের বাগানে। সেখানে এক অপরূপা সুন্দরীকে দেখে এলাম। নাম তার কমলা।
ডায়না (কালরাজ চরিত্রে) : কমলা ! সে কী নামের কমলা না খাওনের কমলা ?
মূল গায়েন (পরী চরিত্রে) : নামের কমলা হুজুর।

মূল গায়েন (বর্ণনাকারী চরিত্রে) : *ঐ যে, শুনিয়া বাণী কালরাজ পরীদেরকে ডেকে বলে-*
মূল গায়েন (কালরাজ চরিত্রে) : পরী ! (জাম)
ডায়না (পরী চরিত্রে) : হুজুর !
মূল গায়েন (কালরাজ চরিত্রে) : কেন, কেন, কেন তোমরা তাকে নিয়ে আসনি ?
ডায়না (পরী চরিত্রে) : সে ছিল সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা হুজুর।
মূল গায়েন (কালরাজ চরিত্রে) : অন্তঃসত্ত্বা ! তোমরা হয়েছো দেখে পাগল আর আমি হয়েছি না দেখে পাগল। ... ।

আবার পরী চরিত্র পরিবর্তন করে মূল গায়েন যখন কালরাজের চরিত্রে আসেন তখন ঠিক আগের মতো তিনি আর Down Right এ থাকেন না। *'ঐ যে, শুনিয়া বাণী কালরাজ পরীদেরকে ডেকে বলে'* -বর্ণনাত্মক এই অংশটুকু পরিবেশনের সময় তিনি ডায়নার কাছে চলে যান। সেখানে বর্ণনার সময় তিনি নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

কালরাজ চরিত্রে পরিবর্তন করে সোজা Down Centre এ চলে আসেন। কালরাজ হয়ে ডায়নার সাথে সংলাপাত্মক অভিনয়ের বেশির ভাগ অংশ তিনি Down Centre এ থেকেই পরিবেশন করেন।

এই চরিত্র পরিবর্তনে মূল গায়েন নিজের মধ্যে প্রথমে পরিবর্তনটি আনেন্ তাহল- চোখে। এরপর তিনি এই পরিবর্তনকে ছড়িয়ে দেন তাঁর সমস্ত শরীরে। শারীরিক পরিবর্তনের সময় তিনি কখনও তাঁর কোমরের শাড়ীটিকে চরিত্রানুযায়ী ব্যবহার করেন। ফলে চরিত্র পরিবর্তনে ভিন্নতার একটি সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয় দর্শকদের মাঝে। এই পরিবর্তন দর্শকদের মধ্যে যাদুর মতোই আকর্ষণীয় মনে হয়।

পালাগানের অভিনয় কৌশল বিষয়ের উপরোক্ত আলোচনায় অভিনয়ের যে প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে নীচে তুলে ধরা হলো :

- বর্ণনাত্মক গীত-গদ্য, পদ্য এবং সংলাপাত্মক গদ্য এই চারটি অভিনয় উপাদানের বেশি ব্যবহার করে দোহার সহযোগে মূল গায়েন একাই সমস্ত আখ্যানটি পরিবেশন করেন।
- সংলাপাত্মক গদ্য অভিনয়ে কোরাস বা দোহার দলের ডানদিক থেকে প্রথম ব্যক্তিটিকে তাঁদের ভাষায় ডায়না বলা হয়। এর সাথে মূল গায়েন সংলাপাত্মক অভিনয় করেন।
- ডায়না সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে সংলাপাত্মক পরিবেশনাকে চলমান রাখেন। এ সময়ে তাঁর আঙ্গিক অভিনয়ের প্রয়োজন হয় না। বসা অবস্থানে থেকেই তিনি একের পর এক আখ্যান বিবৃত চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সংলাপ প্রদান করেন।
- মূল গায়েন নিজেই আখ্যানে বিবৃত চরিত্রসমূহ আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। বর্ণনা থেকে সংলাপাত্মক অভিনয়ের পরিবর্তনে এবং এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রের পরিবর্তনে বা চরিত্রের স্থান ও কাল অতিক্রমণে মূল গায়েনকে কিছু সুস্পষ্ট নিয়ম অবলম্বন করতে দেখা যায়।

ক) প্রধানতম যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাহল, গায়েনের কণ্ঠের জোরালো উচ্চারণে, শরীরে গতিশীল ছন্দে এবং একই সাথে কোরাস ও বাদ্যযন্ত্রের একযোগে জোরালো রূপে শব্দ বহুল 'জাম' বা তেহাই এর ব্যবহার।

বর্ণনা থেকে চরিত্র ধারন করতে বা চরিত্র থেকে চরিত্রে পরিবর্তন করতে সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় মূলক বর্ণনা বা তাঁর অবস্থান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শেষে একটি শব্দবহুল উক্তির উপর বিশেষ জোরালো উচ্চারণ এর সাথে সাথে যন্ত্রীদল একযোগে তেহাই বা 'জাম' প্রদান করেন। মূল গায়েন তখন তড়িৎ গতিতে তাঁর শরীরে ও পোশাকে কিছু সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশেষ পরিবর্তনের মাধ্যমে চরিত্রাভিনয় করেন।

খ) চরিত্র থেকে চরিত্রে পরিবর্তনে বা চরিত্রের স্থান বা কাল অতিক্রমে পরিক্রমণ কৌশল ব্যবহার করেন, অতঃপর 'জাম' নিয়ে নতুন চরিত্র বা স্থান বা কালের প্রকাশ করেন।

গ) চরিত্র থেকে চরিত্র পরিবর্তনে একটি বিশেষ নিয়ম হচ্ছে; ডায়না যে চরিত্র হয়ে গায়েনের সাথে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশ নেন, পরোক্ষণেই মূল গায়েন সেই চরিত্রের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন বা সেই চরিত্র নিজে ধারন করে ডায়নার সাথে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশ নেন্। মূল গায়েন যদি উক্ত চরিত্রটিকে (ডায়নাকৃত) পরিবর্তন করতে চান অথবা ডায়নার চরিত্রটিকে নিয়ে অন্যকোন স্থান বা কালে যেতে চান সেক্ষেত্রে মূল গায়েন তাঁর এতক্ষণের অভিনীত চরিত্রটি ছেড়ে দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে ডায়নার সম্মুখে গিয়ে ডায়নাকে পেছনে রেখে দাঁড়াবেন। ডায়নাকে স্পর্শপূর্বক 'জাম' প্রদান করে ডায়নার চরিত্রটি নিয়ে আখ্যানের পরর্তী দৃশ্য বা স্থান বা কালে পরিক্রমণ করবেন। অথবা ডায়নার চরিত্রটি নিজে আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে ধারন করে সংলাপ প্রদান করলে ডায়না তড়িৎ গায়েনের পূর্বকৃত চরিত্রটি হয়ে তার সাথে সংলাপাত্মক অভিনয় করেন।

ঘ) চরিত্রাভিনয়ে মূল গায়েন আঙ্গিক অভিনয়ের পাশাপাশি আহার্য্য অভিনয়ও করে থাকেন। ডায়নার কাছ রাখা মালা, চশমা, ফুল, চাবুক, বালিশ, গামছা, বাশি ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী এবং তাঁর পরিধানে বিশেষভাবে জড়ানো শাড়ী ব্যবহার করে তড়িৎভাবে চরিত্রটি আঙ্গিক ও আহার্য অভিনয় করে থাকেন।

- অর্থাৎ সংলাপাত্মক অভিনয়ে মূল গায়েন একাই সকল চরিত্রের অভিনয় করেন। প্রবেশ প্রস্থানমূলক অভিনয় বা অতিরিক্ত কোন অভিনেতার চরিত্রাভিনয়ের প্রয়োজন হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

- বর্ণনাত্মক গীত ও গদ্য-বর্ণনাত্মক অভিনয়ের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে চরিত্রের বর্ণনা তৃতীয় পুরুষে হলেও প্রায়শই গায়েন ১ম পুরুষে আঙ্গিক অভিনয় করেন। এসময়েও মূল গায়েনের কোমড়ে বালিশ, চাবুক, চশমা, মালা প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করেন।

'পদ্মাপুরাণ গান'- নাটোর অঞ্চলের 'অভিনয় কৌশল' সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

- সমস্ত আখ্যানটির পরিবেশনায় রয়েছে কতগুলি দৃশ্যমালার সমষ্টি। বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য,পদ্য এবং সংলাপাত্মক গদ্য এই চারটি অভিনয় উপাদানের নিয়মিত অথচ পর্যায়ক্রমহীন বিন্যাসের মাধ্যমেই এই দৃশ্যমালা রচনা করেন মূল গায়েন। আখ্যান পরিবেশনে এটি একটি সুনিয়ন্ত্রিত রীতি বা কৌশল।
- ধুয়া : প্রতিটি স্বতন্ত্র দৃশ্যের শুরুতে ধুয়া হিসেবে যে দুটি চরণ গাওয়া হয়, তা দৃশ্যটির শেষাবধি পর্যন্ত চলমান থাকে। ধুয়ার এই চলমান রেখার উপরই বিন্যাস্ত হয় অন্যান্য উপাদান সমূহ। দৃশ্যটির মূল বিষয় বা শিরোনাম হিসেবে এই ধুয়া সার্বক্ষণিকভাবে কোরাস কণ্ঠে গীত হয়।
- বর্ণনাত্মক অভিনয় উপাদান : বর্ণনাত্মক গীত এর গদ্য ও পদ্য অভিনয়-উপাদান প্রয়োগে মূল গায়েন তাঁর স্বাধীন ইচ্ছায় একই সুরে বাধা এবং একই ধুয়া ব্যবহার করে আখ্যানের প্রতিটি স্বতন্ত্র দৃশ্যের বিভিন্ন অংশ গীতে পরিবেশন করেন। এবং কোরাস কণ্ঠে নৃত্যযোগে ধুয়া পরিবেশনা চলমান রেখেই গীত অভ্যন্তরে বর্ণনাত্মক গদ্য, পদ্য এবং সংলাপাত্মক গদ্য উপাদান প্রয়োগ করে অভিনয় পরিবেশন করেন। এ সময় মূল গায়েনের কণ্ঠ ও হারমোনিয়ামের সুর সর্বক্ষণ একটি স্কেলে বাধা থাকে। ফলে পরিবর্তন ক্রিয়া সহজ হয়ে ওঠে। কখনো কখনো বর্ণনাত্মক পদ তৃতীয় ব্যক্তিতে প্রক্ষেপিত হলেও আঙ্গিক অভিনয়ে ১ম পুরুষে চরিত্রাভিনয়ের রূপ লাভ করে। এ সময় মূল গায়েন কখনো তাঁর চামড়টিকে বিভিন্ন ইমেজে সামান্য ব্যবহার করে থাকেন। এর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বা বর্ধিত পরিবেশনা। মূল গায়েন দর্শক আকাঙ্খা অনুযায়ী এই উপাদান প্রয়োগে কাহিনীর পরিবেশনা সংক্ষিপ্ত বা বর্ধিত করে থাকেন।
- সংলাপাত্মক গদ্য : বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবর্তনে নতুন চরিত্রের প্রবেশ প্রস্থানের প্রয়োজন হয় না। আবার বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের চরিত্রাভিনয়ে প্রবেশ-প্রস্থান রীতি প্রয়োগ করাও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সাধারণত মূল গায়েন, 'করতাল বাদক' ও 'খোল বাদক' (যে দুজন কুশীলব গায়েন আবর্তিত বৃত্ত পরিক্রমায় সর্বক্ষণ করতাল এবং খোল বাজিয়ে চলেন) এই দুজনের সাথে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবেশন করেন। আখ্যানের যতগুলি চরিত্র রয়েছে তা এই দুই বা তিনজন কুশীলবের দ্বারাই অভিনীত হয়।
- বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয়ের পরিবর্তনে গায়েন ও তাঁর সহঅভিনেতা সংলাপ প্রক্ষেপণে কণ্ঠের একটানা ও জোরালো প্রয়োগ করেন এবং চামড় ও করতাল বা ঢোলের নানাবিধ ব্যবহার করেন। সামান্য দু-একটি প্রপসের এই বহু ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার পরিবেশনায় এক ধরনের নান্দনিক ইমেজ তৈরী করে যা দর্শকের কল্পনাকে কাহিনীর সাথে আরোও বেশি একাত্ম করে তোলে।
- প্রবেশ প্রস্থানমূলক সংলাপাত্মক রীতি প্রয়োগে রয়েছে সহজ ও স্বাভাবিক কৌশল। কিছু কিছু বিশেষ চরিত্র বিশেষ দৃশ্যে পোশাক, মেকাপ এবং আঙ্গিক অভিনয় সহযোগে চরিত্রাভিনয় করেন। আখ্যান পরিবেশনে মূল গায়েন তখন বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য ও সংলাপাত্মক গদ্য প্রভৃতি উপাদান প্রয়োগ করে তাঁর অভিনয় ক্রিয়া উপস্থাপন করেন। আবার সংলাপাত্মক অভিনয়ে মূল গায়েন কখনো অভিনতোর বিপরীতে কোন চরিত্রের সংলাপাত্মক অভিনয় করেন।
- বর্ণনাত্মক গীত : সমস্ত আখ্যান পরিবেশনায় এক ধরনের ভাবারোহী বেগ তৈরী হতে দেখা যায়। এ সময়ে গীতের সুরেলা ছান্দিক ও গতিময় পরিবেশনা এবং ১ম পুরুষে চরিত্রাভিনয় দর্শকদেরকে চরিত্রের সাথে একাত্ম করে তোলে।

পালাগানের অভিনয় কৌশল সম্পর্কিত উপরের আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, এর প্রতিটি পরিবেশনায় মূল গায়েনের (বয়াতী) প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর শক্তি (দৈহিক নয়, মানসিক)। পরিবেশনার সময় সে শক্তিটাকে কিভাবে ধরে রাখছে ? এর উত্তরে আমরা দেখি তাঁর কিছু ব্যবহৃত কৌশলকে। যেমন- গান ধরার সময় সে হারমোনিয়ামের উপর হাত রেখে গান শুরু করে। দোহাররা যে চরণ বার বার গেয়ে থাকবে সে চরনটি মূল গায়েন প্রথমে গেয়ে দেন। এক্ষেত্রে দোহারদের মন্তব্য হল, 'শুধুমাত্র বয়াতীর গান জানা থাকলেই হয় এবং অন্যান্যদের গান জানা না থাকলেও চলে'। মূল গায়েন গান শুরু করলে গানের তাল ধরে দোহারদেরকে পাইল ধরার জন্য বয়াতী তাঁর শরীরের যে কোন অংশের দ্বারা তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। গান পরিবেশনে সব সময় তিনি শরীরের মধ্যে গানের ছন্দটাকে ধরে রাখেন। ঐ ছন্দ ধরেই তিনি কখনও বর্ণনাত্মক-সংলাপাত্মক গীত এবং গদ্য সংলাপসহ বিভিন্ন অভিনয় করে থাকেন। এই অভিনয়গুলি করার সময় তিনি কখনও বর্ণনাত্মক-গীত থেকে চরিত্রে যান বা আবার চরিত্র থেকে বর্ণনাকারীতে তা স্পষ্টভাবে পরিষ্কার করে তোলেন দর্শকদের কাছে। এর জন্য তাঁর দলকে সব সময় সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে রেখে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করতে হয়। নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি কখনো হাত, মাথা, চুল ঝাকিয়ে, হাতের আঙ্গুল, পা ইত্যাদির সাহায্যে কোন Jesture বা কোন ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি বিশেষ ইশারা করে থাকেন। হাস্য, লাস্য ও তাণ্ডবের এ সকল গানে চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে থাকে। প্রতিটি চরিত্রের জন্য আলাদা আলাদা ছন্দ ব্যবহৃত হয়। পুরো জায়গাটা তাৎক্ষণিকভাবে অভিনয় করার উপর নির্ভশীল অর্থাৎ Improvised। কোন চরিত্র, কথা বা কোন সংবাদকে গুরুত্ব দেবার জন্য বাদ্যযন্ত্রীরা ঠিকমত তাল ধরতে না পারলে পালাকার আগে তাল ঠিক করে তারপরে অভিনয় শুরু করে থাকেন। কোন Blocking নেই। নিজেই মূল অভিনেতা, নিজেই পরিচালক, নিজেই নিজের-দর্শক এবং নিজেই সমস্ত কিছু (সবাইকে) পরিচালনা করেন। 'Character Transformation Principle' গুলি তাঁর জানা। মূল গায়েনকে তাই প্রতি মুহূর্তে Energy দিয়ে কাজ করতে হয় এবং দর্শকের মনোভাবের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রসের প্রতিষ্ঠা করে অভিনয় করতে হয়। বিভিন্ন রসের অভিনয়ে তিনি তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা বা স্মৃতিকে স্মরণ করেন।[১৩১] পাশ্চাত্যের অভিনয় কৌশলে দেখা যায় যে, অভিনয় চরিত্র তৈরীতে পূর্ব অভিজ্ঞতা, কল্পনা ইত্যাদির উপর জোর দেয়া হয়। চরিত্র তৈরীতে অভিনেতারা তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগায়।[১৩২] এ সম্পর্কে আধুনিক নাট্যধারার প্রবর্তক 'স্ট্যানিসলাভস্কী'র একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে-"Artists who do not go forward go backward".[১৩৩] এভাবে অভিনেতা (মূল গায়েন) নিজে রস গ্রহণ তারপরে তা দর্শকের কাছে সঞ্চারিত করেন, ফলে বিশ্বাসের দ্বারা বাস্তব আয়তন নাট্যিক আয়তনে রূপান্তরিত হয়।

দূর কথার দ্বারা কম-বেশি দূরে বোঝান যায়। শুধু মাত্র ঢোলের একটি beat এর দ্বারাও চরিত্রের পরিবর্তন করা হয়। যখন যে চরিত্রের হবে মূল গায়েন তখন সে চরিত্রের হয়ে কথা বলেন। গান শেষ হবার সাথে সাথে বর্ণনার কথা ধরেন। তাঁর অভিনয়ে সাধারণত মাথা নীচু করে কোন আবেগের প্রকাশ করতে দেখা যায় না। তাহলে দর্শকের প্রতিক্রিয়া থেকে বিচ্যুতি ঘটবে বলে ইসলাম উদ্দিন বয়াতী জানান। যে কোন ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে তার পূর্বসূত্র আগে বর্ণনা করতে হয়। অনেক কথা বলার পরে দর্শকের দিক থেকে শুধু কথা শুনে বিরক্ত হবার কথা বিবেচনা করে বর্ণনার মাঝে মাঝে কোন শব্দের উপর জোর দিয়ে লম্বা সুর দিয়ে থাকেন।

এছাড়াও 'কাপ' এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে, কোন নতুন লোকালয়ে বা কোন অঞ্চলে চরিত্রের প্রবেশকে বোঝাবার জন্য অভিনেয় চরিত্র মঞ্চের কেন্দ্রে গোল হয়ে বসা বৃত্তের ভেতর থেকে দাঁড়িয়ে বৃত্তের বাইরে চলে আসে এবং অভিনয় শেষ করে পুনরায় কেন্দ্রস্থিত বৃত্তের ভেতরে গিয়ে বসলে চরিত্রের প্রস্থানকে নির্দেশ করে।

কোন এলাকা বা অঞ্চল এবং চরিত্রকে চিত্রায়িত করার জন্য প্রতিটি চরিত্রই জানিয়ে দেয় যে, সে কে এবং কোত্থেকে এসেছে বা কোথায় যাচ্ছে? স্থানের পরিবর্তনের জন্য মঞ্চের কেন্দ্রে দোহার দল কর্তৃক রচিত বৃত্তের চারপার্শ্ব থেকে বাদ্যযন্ত্রের তাল সহকারে পরিভ্রমণের দ্বারা স্থান পরিবর্তন করে থাকে।

প্রচলিত লোকগীতিকে লোক বিজ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে কয়েকটি প্রধান শাখায় ভাগ করেছেন। যেমন- ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর মতে, ১. আঞ্চলিক গীতি, যা অঞ্চল ভেদে বিশেষ বিশেষভাবে প্রচলিত, ২. ব্যবহারিক গীতি, ব্যবহারিক বিবাহ উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে যে গীতি হয়, ৩. হাসির গান হাসির বিষয় নিয়ে গীত হয়, ৪. কর্মসংগীত এবং শ্রম সংগীত যা নানা কৃষিকর্ম, নৌকাবাইচ, ছাদ পিটানো ইত্যাদিতে গাওয়া হয়, ৫. প্রেম সংগীত, বিরহিণী নারীর বিরহী পুরুষের নানা হৃদয় বেদনা ও চিরন্তন প্রেম সম্ভাষণ করতে প্রকাশিত হয়, ৬. বারমাসি, নারীর ১২ মাসের বিরহ বেদনা যে সব গানে (অপেক্ষকৃত দীর্ঘ গীত বিশেষ) প্রকাশিত হয় ইত্যাদি।[১৩৪] উপরিউক্ত লোকগীতির বৈশিষ্ট্য বিচারে পালাগানও লোকগীতির একটি অংশ বিশেষ হিসেবে আলোচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে পালাগানের প্রয়োগের মধ্যে আমরা পূর্বেই কর্ম সংগীত বা শ্রম সংগীত হিসেবে ছাদ পিটানোর কাজে আলকাপ গানের ব্যবহারের প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি।

বাংলাদেশের লোকগীতিগুলো নিছক সংগীত নয়। এতে বাংলা ও বাঙালির হাজার বছরের সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা ও ধ্যান ধারনার ছাপ বিদ্যমান। বাংলাদেশে বিভিন্ন কালে যেসব মানবগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল তাঁদের সাংস্কৃতিক

---

১৩১ সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, টিএসসি সেমিনার, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ইং -ইসলাম উদ্দিন পরিবেশিত 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালাগানে পাখীর তীর মারার দৃশ্যে দর্শকের চোখের পানি ধরে রাখা কস্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন অভিনয়ে ইসলাম উদ্দিনকে সত্যি সত্যিই কাদতে দেখা যায়। এই দৃশ্যের অভিনয় তিনি কিভাবে করেন তা সম্পর্কে ইসলাম উদ্দিনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন : "বাড়ীতে আমারও একটা সন্তান আছে। পাখীর পানের দৃশ্যে আমি যখন পাখীকে আমার সন্তানের মতো দেখি তখন আমার নিজের সন্তানের কথা মনে পড়ে।

১৩২ দ্রষ্টব্য : জিয়া হায়দার, স্ট্যানিসলাভস্কি ও তার অভিনয় তত্ত্ব, ঢাকা, ১৯৯৫

১৩৩ Sonia Moore, THE STANISLAVSKI SYSTEM, London, 1984, Pg. 2

১৩৪ আব্দুল ওহাব সরকার, বাংলাদেশের লোকগীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় লোকগীতিগুলোর মধ্যে ফুটে ওঠে। যেমন- সারিগান এবং নৌকা বাইচের গান ইত্যাদি আমাদেরকে কোন সমুদ্রচারী জাতির সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

এসবই আমাদের দেশীয় নাট্যকৌশল। আধুনিক নাট্যধারার অভিনয় পদ্ধতিতে যে অভিনয় কৌশলের কথা বলা হয়েছে সেই একই প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশের লোকনাট্যে মূল গায়েনসহ অন্যান্য নাট্য কুশীলবেরা চরিত্র নির্মাণের দ্বারা একের পর এক অবিশ্বাস্য রকমের অভিনয় করে চলেছে। এটি এক আশ্চর্য রকম অভিজ্ঞতা। পাশ্চাত্য নাট্যপদ্ধতির পাশাপাশি আমাদের লোকনাট্যের বিভিন্ন রীতির অভিনয়ের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। যদি এর প্রয়োগ ও কৌশলগুলিকে নিয়মিত চর্চা করা যায় তাহলে পাশ্চাত্য নাট্যপদ্ধতির পাশাপাশি আমাদের দেশীয় নাট্যঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত সম্মিলিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বর্তমানের নাট্যচর্চাকে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩. উৎস সন্ধান

পালাগানের কাহিনী, ভাষা বা ছন্দের ব্যবহারে এগুলিকে উনিশ শতকের রচনা বলেই মনে হওয়া সমীচীন। কিন্তু পালাগান পরিবেশনার উপস্থাপন পদ্ধতি বা পালা অভিনয়ে মূল গায়েনের প্রয়োগ-কৌশল, অঙ্গসজ্জা এবং প্রপসের ব্যবহার আমাদের প্রাচীন নাট্যঐতিহ্যের প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে জানতে আরোও আগ্রহী করে তোলে। কেননা পালাগান ও এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রীতিগুলোর অভিনয় পরিবেশনার সাথে বাংলার কিছু কিছু প্রাচীন নাট্যরীতির অভিনয়গত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে গীতবাদ্য নৃত্যযোগে সঙ্গীতের যে সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছিল তার সঙ্গে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল বৃন্দগান এবং বৃন্দবাদ্যের ক্ষেত্রে সে যুগের শাস্ত্রকারদের সযত্ন চিন্তাধারা। শার্ঙ্গদেব পর্যন্ত শাস্ত্রকারেরা শিল্পী সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার 'বৃন্দের' উল্লেখ করে স্পষ্টত ঈঙ্গিত করেছেন যে, মধ্যযুগের পূর্ববর্তীকালে ভারতবর্ষে অর্কেস্ট্রার প্রচলন ছিল।[১৩৫] সেই যুগে গীত-বাদ্য-নৃত্যসহযোগে সঙ্গীত পরিবেশনের রীতির সঙ্গে সঙ্গতি আছে 'গীতগোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আঙ্গিক পরিকল্পনায়। গীতিনাট্য রচনার প্রবণতার মধ্যেও যেন সেই প্রাচীন যুগের সঙ্গীত নৃত্যের বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি আবার এসে মিশেছে মনমোহন বসুর 'গীতিকায়', -জাতীয় রচনায় এবং একালের গীতনাট্যে। অন্যদিকে আউল, ভাটিয়ালী, সারি, জারিগানে গ্রামাঞ্চলের দেশজ সুরের সহজ ধারা বাংলাদেশের মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে চলেছিল স্বচ্ছন্দ বেগে। বাংলাভাষার নিদর্শন চর্যাপদে 'বুদ্ধনাটক' এর উল্লেখ আছে। ১৭ ও ১০ সংখ্যক চর্যায় উল্লিখিত 'বুদ্ধ নাটক' ও 'ডোম্বী' কৃষ্ণাপাদানাম্ এর উক্তি থেকে এই অনুমানের সমর্থন মেলে। চর্যাকারদের কেউ কেউ প্রাচীন বাঙলার নাট্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রাচীন কালে নাট্যমাত্রেই নৃত্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত হতো। বুদ্ধ নাটক বা তুম্বুরু নাট্যে নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে বাধা নেই।[১৩৬] পাল আমলের বৌদ্ধ দেবদেবীদের চিত্র সম্বলিত পুথিতে প্রাচীনকালের বাংলা নাটকে ব্যবহৃত পোশাক, অলঙ্কার, কেশ-সজ্জা, মস্তকাভরণ ও নৃত্যের মুদ্রা, দৃষ্টি, আসন ও পদ বিন্যাসের পরিচয়-সংকেত পাওয়া যায়।[১৩৭]

নাথপন্থী সাধকগণের যোগ সাধনা বা কায়াসাধনার যেসব কাহিনী কাব্যের আকারে রচিত হয়েছে সেগুলো প্রাচীন কালে মৌখিকরূপেই পরিবেশিত হতো। সঙ্গীত ও নৃত্যকলার যুগল সম্মিলনে যে নাট্যরীতি বুদ্ধ নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়, ফয়জুল রচিত গোরক্ষ নাথের নাটে তারই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়-

"নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর।
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর॥
নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরীর রোলে।
কায় সাধ কায় সাধ মাদল হেন বোলে॥
হাতের থমকে নাচে পদ নাহি লড়ে।
গগণ মণ্ডলে যেন বিজুলী সঞ্চরে॥"[১৩৮]

বাঙলা লোকনাট্যের বহুস্থলে পুরুষ রমণীরা আহার্য বা রূপসজ্জা গ্রহণ করে -এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। গোরক্ষ নাথে 'ঘাঘরী'র সজ্জা থেকে ধারনা করা যায়, সে কালের কোনো কোনো নাট্যে এ ধরনের পোশাক প্রচলন ছিল। ঘাঘরী রাজপুতনার রমণীদের পোশাক। 'ঘাঘরীর রোলে' কথা থেকে বোঝা যায় নৃত্যকালে এই পোশাক থেকে কিঙ্কিনীর ধ্বনি উত্থিত হতো-

"নাট করু নাটুয়া তাল বাহ ছলে।
তোহ্মার মাদলে কেন গুরু গুরু বোলে॥"[১৩৯]

নাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নৃত্য-বাদ্য-নাটের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তার প্রমাণ 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে' প্রত্যক্ষ করা যায়। শুকুর মাহমুদের 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে' (১৭০৫) কাহিনীর অংশ হিসেবে নটী, নৃত্য ও নাটের প্রসঙ্গ আছে। সেকালের নৃত্যগীতকুশল রূপজীবী নারী 'নটী' হিসেবেও আখ্যাত হতো।[১৪০] উনিশ শতকের 'নাথ গীতিকা' পালা দেখে গ্রীয়ারসন

---

[১৩৫] জ্যোতির্ময় ঘোষ (সম্পাদিত), বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, পৃ. ৬৩-৬৪

[১৩৬] ড. সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬

[১৩৭] ঐ, পৃ. ৭

[১৩৮] ঐ

[১৩৯] পূর্বোক্ত

[১৪০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

এর উপস্থাপনা রীতির বর্ণনা দিয়েছেন : "চারজন গায়েন পালাক্রমে নাথগীতিকা উপস্থাপন করে। তারা আলাদা আলাদাভাবে পালা করে তা উপস্থাপন করে থাকে। এই পালা পরিবেশনায় হে রাজা, হে ময়না, অথবা হে যম ইত্যাদি ধুয়া ব্যবহৃত হয়।"[১৪১]

নাথসিদ্ধাদের উপাখ্যানগুলো এখনও আমাদের লোকায়ত সমাজে জনপ্রিয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বাংলায় লোকনাট্য হিসাবে 'গোর্খের পালা' এখন পর্যন্ত আপন অস্তিত্বে তার জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছে। প্রাচীন বাংলার নাটগীতির ধারায় যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল প্রভৃতি পাল রাজাদের গাথাও অন্তর্ভুক্ত। 'রংপুর রাজ বংশীয়' তদঞ্চলের 'নিম্নশ্রেণীর' মধ্যে মহীপালের গান উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধি প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। গোরক্ষ নাথ, মীননাথ, গুপীচন্দ্র; ময়নামতি, হাড়িফা, কাহ্নপা, মানিক চাঁদের আখ্যান, পালগীতি, শূন্যপুরাণ ও ধর্ম পূজা-বিধানের ভাষা যত অর্বাচীন কালেরই হোক না কেন, মৌখিক রীতিতে রচিত এসব উপাখ্যান হাজার বছরের পুরানো। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলো যে বৌদ্ধ যুগের ও বৌদ্ধ সমাজের তাতে সন্দেহ নেই।[১৪২]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা নাট্যভিনয় বিভিন্ন লোকাচার ব্রত-উৎসব ও ধর্ম সম্প্রদায়ের কৃত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই রীতি সর্বভারতীয় লোকনাট্যের প্রেক্ষাপটে বিচার যোগ্য। সমগ্র ভারতে আজও বহুক্ষেত্রে কৃত্য থেকে নাট্য স্বতন্ত্র নয়। সেজন্য এতদঞ্চলের নাট্য পরিবেশনায় 'Ceremony' ও 'Performance' এর মধ্যে কোনরূপ সুস্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত হয় না। কারো কারো মতে প্রাচীনকালে দ্রাবিড়দের মধ্যে শিব বিষয়ক উৎসব ও কৃত্যের ধারায় নাট্যের উদ্ভব ঘটেছিল।[১৪৩] ধর্মপূজা ও ধর্মমঙ্গল ধারায় প্রাচীনকালে কৃত্য ও কাহিনী অবলম্বনপূর্বক বাংলা নাট্যরীতির একটি বিশেষ দিক গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, 'ধর্মসাহিত্য রাঢ় অঞ্চলের দান'। ধর্মপূজা মূলত সূর্যপূজা। কালক্রমে এতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ছায়াপাত ঘটে। এককালে এই পূজা আদি-অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমানে এতে ব্রাহ্মণরাও অংশগ্রহণ করে থাকে।

ধর্মমঙ্গল বাংলা নাট্যের আবহমানকালের রীতি অর্থাৎ গায়েন-দোহার রীতিতে পরিবেশিত হয়। এতে একজন মূল গায়েন থাকে। সঙ্গে দু-চারজন 'দোহার'। নৃত্যের জন্য গায়েনের পায়ে ঘুঙুর ব্যবহৃত হয় এবং তাঁর হাতে ধর্মের আশীর্বাদ ও আরোগ্যদানের প্রতীক চামর থাকে। গায়েন নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গি-সহকারে ধর্মমঙ্গলের 'আখ্যানমূলক পদগুলি' পরিবেশন করেন। এই সঙ্গে সামান্য কিছু বাদ্যের ব্যবস্থা থাকে। গায়েনের পদে দোহারেরা 'ধুয়া' ধরে থাকে।

নোয়াখালী অঞ্চলে চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে যে গাজন হয় তাতে দুজন শিব পার্বতীর সাজে শোভাযাত্রা সম্মুখভাগে থাকেন। পুরো গ্রামে তারা ঢাকের তালে তালে নৃত্যগীত-সহকারে অভিনয় প্রদর্শনপূর্বক চড়কতলায় উপস্থিত হয়। এই বিশেষ ধরনের নাট্যরীতি সে অঞ্চলে 'ঢাকী' বা 'ঢাঙ্গি' নৃত্য নামে পরিচিত। এই নৃত্যে ঢাকের ব্যবহার থেকে 'ঢাঙ্গি' নামের উদ্ভব। শিব পার্বতীর চরিত্রে অভিনয় করেন তাঁদেরকেও 'ঢাঙ্গি' নামে অভিহিত করা হয়।

শিবোৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান 'গম্ভীরা'। নানা প্রসঙ্গে 'গম্ভীরা' কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। ধর্মঠাকুরের আসন 'গম্ভীরা-কাঠ' নামে অভিহিত। ওড়িয়া ভাষায় নির্জন প্রকোষ্ঠকে বলা হয় 'গম্ভীরা'। অন্যদিকে শিবের আরেকনাম 'গম্ভীর'। শিব ও ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে গম্ভীরার দুটি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান বিদ্যমান। মালদহে এই অনুষ্ঠানকে 'আদ্যের গম্ভীরা' বলা হয়। গম্ভীরা উৎসবে বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর 'মুখা' বা 'মুখোশ' ব্যবহৃত হয়। মুখোশগুলো নানা চরিত্রজ্ঞাপক। গম্ভীরা মূলত শিব বিষয়ক নাট্য। দিনাজপুর-রাজশাহী অঞ্চলে বর্তমানে প্রচলিত গম্ভীরা দুই চরিত্র বিশিষ্ট এবং তা মালদহের মতো কোনো বিশেষ উৎসবের অঙ্গ নয়। প্রধানত মুসলমানরা 'নানা-নাতি'র চরিত্র অবলম্বন পূর্বক নৃত্যগীতের মাধ্যমে গম্ভীরার অভিনয় অনুষ্ঠান করে থাকে।[১৪৪]

বাঙালীর হাজার বছরের নাট্যচর্চায় যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য রীতি বা প্রয়োগ পদ্ধতিগুলি রয়ে গেছে সাধারণের মাঝে আর বাদবাকী সব নাট্য বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় হারিয়ে গেছে কালের অতলে। পালাগানের প্রয়োগ পদ্ধতি প্রাচীন নাট্যধারার ঐতিহ্যকে বহন করে বলেই তা আজও জনপ্রিয় নাট্যরীতি রূপে বেঁচে আছে শহর ও গ্রামের মানুষের মাঝে-যার পরিবেশনা এখন আর কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং ছড়িয়ে পড়েছে দেশে ও বিদেশে সর্বত্র।

---

[১৪১] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
[১৪২] ঐ, পৃ. ১৪
[১৪৩] ঐ
[১৪৪] ঐ, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

৬. উপসংহার

মানব সমাজে কাল পরম্পরায় লোকমুখে নানা ধরনের উপকথা, গল্পকথা ও আখ্যান প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে এই গল্পকথা বা আখ্যান গীত ও বর্ণনার মাধ্যমে সচরাচর অন্তরঙ্গ আসরে পরিবেশিত হতো। আধুনিক কালের নাট্যে এই ধরনের পরিবেশনাকে 'কথানাট্য' নামে অভিহিত করা হয়। মুখে মুখে প্রচলিত হওয়ায় এর ভাষাও সর্বকালেই সমকালের ভাষারূপে বিবৃত হয়ে এসেছে। এগুলোর চরিত্র, ঘটনা বা পরিবেশনার রীতি প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় অবিকৃত থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে কোথাও প্রাচীনত্ব পরিলক্ষিত হয় না। এগুলো আজও আমাদের গৃহাঙ্গনে পরিবেশিত হয়। এ পরিবেশনা একেবারেই গৃহাঙ্গনের, চার দেয়ালে আবদ্ধ মঞ্চের নয়। দর্শক-শ্রোতার দিক থেকেও এগুলিতে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর শিশু কিশোর, যুব বয়োবৃদ্ধ সাধারণ নারী ও পুরুষের উপস্থিতি বেশি হয়ে থাকে। এ রীতিতে কোনো কাহিনী বর্ণনা ও গীতের আশ্রয়ে একজন প্রধান কথক বা গায়েন দ্বারা দোহার সহযোগে পরিবেশিত হয়। সাধারণত সন্ধ্যার পরে গৃহস্থ বাড়ীর উঠানে কিস্‌সা, শাস্ত্র বা লোককথার আসর বসে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে হারমোনিয়াম, খোল বা ঢোলক, মন্দিরা, চটি, করতাল ইত্যাদি। অনেক সময় মাটির পাত্র বা অনুরূপ বাদ্যযন্ত্রও এতে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নাট্যরীতির ধারাবাহিকতায় পালাগানে একজনমাত্র মূল গায়েনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সংলাপাত্মক অভিনয় অংশে তিনি দোহারদের মধ্য থেকে একজনের সাহায্য নিয়ে থাকেন। পোশাকের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রাচীন নাট্যরীতির ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। 'ঘাঘরী'র ব্যবহারে তিনি অনায়াসে স্ত্রী-পুরুষ যেকোন অভিনেয় চরিত্রে পরিবর্তিত হন। কখনো বৈঠকী রীতিতে, আবার কখনো খোলা মাঠের অস্থায়ী উন্মুক্ত আসরে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে গীতবাদ্যযোগে পরিবেশেন করেন। পালাগুলোতে বিভিন্ন ধর্ম, আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটলেও এগুলোর পরিবেশনা কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায় না। এর শাস্ত্রকথাসমূহ সুনিশ্চিতভাবে অসাম্প্রদায়িক মনেরই সৃষ্টি।

বাংলা নাট্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক ও অভিনয়ের বর্ণনাধর্মিতা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাটক পাঁচালি, লীলানাট, নাটগীত পালা প্রভৃতি প্রধানত মৌখিক রীতিতে সৃষ্ট হয়েছে। আমাদের লোকনাট্যের সাথে পাশ্চাত্যের নাটকের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, পাশ্চাত্য নাটক 'ন্যারেটিভ' ও 'রিচ্যুয়াল' থেকে আলাদা বিশেষ চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ। সেদিক থেকে আমাদের হাজার বছরের নাট্যঐতিহ্য যেন সীমা থেকে অসীমের দিকে ধাবমান কোন গতি, যার শুরু আছে, বর্তমান আছে কিন্তু পরিণতি বা শেষ নেই। নির্দিষ্ট কোন কিছুর সীমায় তাকে আবদ্ধ করা যায় না। বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের অসাম্প্রদায়িক মিলনকেন্দ্র হল আমাদের লোকনাট্য। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা গান, পাঁচালী, লীলাগীত, গীতিনাট্য, নাটগীত, পালা, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর ইত্যাদির বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

লোকনাট্য সমীক্ষা

সাক্ষাৎ গ্রহণকারীর নাম :
স্থান :
তারিখ :

১. নাট্যরীতির নাম।
২. মূল গায়েনের নাম, ঠিকানা, বয়স।
৩. সকল কুশীলবের পেশা ও ধর্ম।
৪. গায়েনের গুরু শিষ্য পরম্পরা।
৫. পৃষ্ঠপোষক (ধর্ম ও শ্রেণী)।
৬. দর্শক (ধর্ম ও শ্রেণী)।
৭. অভিনয়ের উদ্দেশ্য।
৮. কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান/লৌকিক উৎসব উপলক্ষে অভিনীত।

৯. আসরের বিবরণ :
ক) দৈর্ঘ-প্রস্থ, খ) ভূমি হতে উচ্চতা, গ) খুঁটির সংখ্যা, ঘ) "ছাদ", ঙ) দর্শকবৃন্দের অবস্থান, চ) আসরে কুশীলব বৃন্দের অবস্থান (পাইল/দোহার, যান্ত্রিক দল, গায়েন), ছ) সাজঘর (অবস্থান):

১০. দলের গঠন :
ক) গায়েন, পোষাক, ব্যবহৃত সামগ্রী।
খ) যান্ত্রিক দল, সংখ্যা, যন্ত্র, পোষাক।
গ) পাইল/দোহার, সংখ্যা, পোষাক।
ঘ) ছুকরী/নারী কুশীলব, সংখ্যা, পোষাক।
ঙ) অপর কোন কুশীলব, সংখ্যা, পোষাক।

১১. অভিনয়কালীন ক্রিয়া :
ক) গায়েন, খ) পাইল/দোহার, গ) যান্ত্রিক দল, ঘ) ছুকরী/নারী কুশীলব, ঙ) অপর কোন কুশীলব।

১২. অভিনীত পালা সমূহের নাম, রচয়িতা, রচনা শৈলী (লিখিত/মৌখিক, গদ্য/সংলাপ/কাব্য)।
একটি পালার কাহিনী সংক্ষেপ।

১৩. পালাসমূহের অভিনয়ক্রম, কাল।

১৪. পূর্বরঙ্গ :
ক) গদ্যে বর্ণনা, উদ্ধৃতি, বর্ণনাকারী।
খ) পদ আবৃত্তি, উদ্ধৃতি, আবৃত্তিকার।
গ) গীত, উদ্ধৃতি, গায়ক।
ঘ) গদ্য সংলাপ, কুশীলব, উদ্ধৃতি।
ঙ) কাব্য সংলাপ, কুশীলব, উদ্ধৃতি।
চ) গীত সংলাপ, কুশীলব, উদ্ধৃতি।
ছ) নৃত্য, কুশীলব, বৈশিষ্ট্য।
জ) অপর কোন বৈশিষ্ট্য।

১৬. সমাপ্তি, উদ্ধৃতি।

১৭. ব্যবহার হয় কিনা?
ক) প্রবেশ, প্রস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

খ) পোষাক (পরিবর্তন সহ)।
গ) মুখোশ।
গ) দ্রব্য সামগ্রী।
ঙ) রূপসজ্জা।
চ) দৃশ্য সজ্জা।
ছ) ফেরী/প্যালা।
জ) অপর কোন প্রযোজনা গত বৈশিষ্ট্য অথবা দর্শক বৃন্দের ক্রিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

যোগীর গান

পালাগানের অভিনয় উপস্থাপন সম্পর্কিত আলোচনার অতিরিক্ত অংশ হিসেবে 'যোগীর গানে'র অভিনয় পরিবেশনা সংক্রান্ত দিকগুলিকে চিহ্নিত করতে নাটোর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত 'যোগীর গান' পালার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল-

বন্দনা :
মা তুমি স্বরস্বতী মা তোমার রাঙা পদে। (দুইবার)
মা তোমার চরণ পদে মা তুমি স্বরস্বতী॥
তোমার ও চরণপদে তোমার ও যুগল পদে॥...।"

এই গানের উদ্দেশ্য হল স্বরস্বতীকে আহ্বান করা। স্বরস্বতীকে ভক্তি করা। স্বরস্বতী বিদ্যার দেবী। এরপরে একটু ভিন্ন তালে-

বুম বুম ভগবতী, ডাইনে লক্ষ্মী স্বরস্বতী।
ওমা দয়া করে এসো মোর আসরে।
ওমা কৃপা করে এসো মোর আসরে।
এহোতো ফাল্গুনো মাসে, রাম যাবে বনবাসে,
তোমায় আমায় নিয়ে যাবে পাতালে।
দয়া করে এসো মোর আসরে॥

গেয়ে আসরের সবাই একবার থেমে যায়। এর পর আসরের সবাই আবার গান শুরু করে। এই গান ধরে যোগী এবং ভর্তৃদাস দর্শকের আড়াল (এ-কে সাঁজ ঘরও বলা যেতে পারে) থেকে আসরে প্রবেশ করে। গানের চরণটি প্রথমে একবার আসরের সবাই গায়-

"বাপজান ব্রহ্মা ভজন করো, গঙ্গা সাধন করো
নিজনাম, বাপজান॥" (একবার)

গাওয়ার পরেই যোগী ও ভর্তৃদাস একত্রে শেষোক্ত গানের এই চরণটিই আবার গেয়ে থাকে। এ সময় ভর্তৃদাস যোগীর পেছন পেছন লুকিয়ে আসার অভিনয় করে। যোগী তাঁকে দেখতে পায়না। যোগী মাথায় টোপর পড়া থাকে। কপালে ত্রিশুল আঁকা তা নাক পর্যন্ত নামানো থাকে যাকে চন্দনের ফোঁটা বা তিলক বলে। যোগীর বৈরাগীর বেশ, গলায় রুদ্রাক্ষীর মালা, মাথায় জটাধারী, দুই হাতে ও কানে থাকে রুদ্রাক্ষীর মালা। যোগীর গায়ে নগুণ বা পইতা থাকে এবং ষোলনাম ৩২টি অক্ষর নামাবলী ও যোগীর গায়ে থাকে। যোগী ডান হাতে তজবী এবং অগ্নি স্বাক্ষী হিসেবে বাম হাতে একটি জলন্ত মশাল রাখে। মশালটি কাঁচা বাশ, কেরোসিন ও পাঠ দিয়ে তৈরী। আর ভর্তৃদাসের মাথায় গামছা দিয়ে পেচানো এবং কপালের সামনের উপরের দিকে শিঙের মতো গিড় দেখা যায়। এটাকে তারা বৃন্দাবনী চূঁড়া বলে থাকে। বৃন্দাবনে মন্দিরের মাথার উপরে যে চূঁড়া রয়েছে, তার চিহ্ন স্বরূপ ভর্তৃদাসের এই রূপ সাজ। অলংকার হিসেবে পুথির মালা চূঁড়ায় ব্যবহার করে। দর্শকের কাছে কিম্ভুত কিমাকার রূপে উপস্থিত হবার জন্য মুখে, চোখের নীচে (গাঢ় করে), চোয়ালে এবং থুতনিতে জিংক অক্সাইডের সাথে সিঁদূরের মিশ্রণ লাগিয়ে আর সারা শরীরে জিংক অক্সাইডের সাদা গোল গোল ছাপের মধ্যে হাজার পাওয়ার রঙের লাল ছাপ, গায়ে কুড়ি কুষ্ঠির ঘা এর তাজা চিহ্ন হিসেবে তাঁর এইরূপ সাঁজ। ভর্তৃদাসের পরণে লুঙ্গী (কাছা দেয়া অবস্থায়) খুব শক্ত করে বাধা থাকে এবং গায়ে থাকে ছাপার একটি পুরোনো শার্ট। গানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভর্তৃদাসের বাম হাত বুকের সাথে লাগানো থাকে (কারণ তারা মনে করে রোগে ভর্তৃদাসের এক হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল)। আসরে ঢোকার সময় যোগীর পেছনে লুকিয়ে আসে ভর্তৃদাস। কিন্তু গান ধরার সময় তারা দু'জন একসাথেই ধরে। আর তখন যোগী একবারও পেছনে তাকায় না। আঁড়াল থেকে বেরিয়ে যোগী ও ভর্তৃদাস প্রথম গান ধরে-

ব্রহ্মা ভজন করো, গঙ্গা সাধন করো নিজ নাম, বাপজান
রাম ভজন করো, লক্ষণ সাধন করো নিজনাম, বাপজান
বাপজান আসমান ভজন করো, জমিন সাধন করো নিজনাম

Dhaka University Institutional Repository

শিব ভজন করো কালী সাধন করো নিজনাম
বাপজান গুরু ভজন করো, মুর্শীদ সাধন করো নিজনাম

এই গানের প্রতি চরণ গেয়ে যোগী একবার থেমে আবার দু/চার পা সামনে গিয়ে পরের চরণ গায়। ভর্তৃদাস ও যোগীর পেছন পেছন তাই করে। এভাবে থেমে থেমে গানের চরণগুলি গেয়ে আসরে ঢোকে। যোগী ও ভর্তৃদাস আসরে ঢুকে আসরকে ৩/৪ বার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণ করার সময় ভর্তৃদাস বরাবর যোগীকে লক্ষ্য করে এবং দর্শকদেরও লক্ষ্য করে। দর্শকরা মজা পেলে ৩/৪ বার প্রদক্ষিণ করে নতুবা ২/১ বার করেই ভর্তৃদাস এক-একটি উদ্ভট অঙ্গভঙ্গিসহ চিৎকার করে যোগীর পথরোধ করে দাঁড়ায়। তাঁদের মধ্যে সংলাপের যে আদান প্রদান হয় সেগুলি নিম্নরূপ :

যোগী : তুমি কে বাপু। রাস্তা বন্ধ করে আছো? রাস্তা ছাড়ো। আমি চলে যাব।
ভর্তৃদাস : রাস্তা ক্লিয়ার (তখন ভর্তৃদাস ঘুরে পা ফাক করে বলে)।
যোগী : কোন বিপদে পড়লাম। আসলাম একা!
ভর্তৃদাস : আমিও একা (হেসে হেসে হাত পা ছড়িয়ে সামনে এগুতে এগুতে)।
যোগী : তুমি কে? বাড়ি কোথায়?
ভর্তৃদাস : তুমি কে? (পাল্টা প্রশ্ন করে)।
যোগী : আমি যোগী বর। তোমার কেউ আছে?
ভর্তৃদাস : কেউ নেই।
যোগী : কেউ নেই- বাপ, মা, ভাই, বোন?
ভর্তৃদাস : কেউ নেই।
যোগী : তুমি আমার সাথে যাবে?
ভর্তৃদাস : যাবো।
যোগী : আমি গুরু মন্তর দিলে তুমি গুরু মানবে?
ভর্তৃদাস : টেষ্ট করতে হবে।
যোগী : হরিনাম নিতে হবে। হরি নাম দিয়ে মালা জপতে হবে। মহা মন্ত্র দিয়ে...।
ভর্তৃদাস : খালু তুমি আমার কে হও?
যোগী : তোমার মালা, ছালা, ঢোলা, লাঠি সব দিলাম, তো আমি গুরু তুমি, শিষ্য।
ভর্তৃদাস : তুমি গুরু আমি শিষ্য।
যোগী : এখন তুমি ছালাম নিয়ে মালা জপ্‌পে। চল তুইলে দেয়া লাগবি।
(পাইল দোহারদের মধ্য থেকে একজন 'কি হল?' বল্‌লে)।
যোগী : ছালাম করতি হবি।
ভর্তৃদাস : তোরে? ছালাছু তেল সব তোমারে দেব গো। একটু পরে।
যোগী : তাহলে মালা জপা হয়েছে?
ভর্তৃদাস : মালা কি জপে বাপুরে। এই মালা জপলে হবে কি গুরুদেব, জপলে হবে কি?

(মোন মালা কাঠাল তলা, হাল দে লয়ে যায় কাঠাল তলা। পান্তাভাত আইঠে কলা, ছোটা সব গিলে ফেলা, এই বইলে ভই জপরে মালা জপরে মালা জপরে মালা) আবৃতির মতো করে।

যোগী : তোমার মালা জপা হয়ে গ্যাছে?
যোগী : মালা জপা হয়ে গ্যাছে। তাইলে এখন চলো।
ভর্তৃদাস : কোথায় যাবো গুরুজী?
যোগী : ঐ যে আমার সাথে গয়া কাসী শ্রী বৃন্দাবন।
ভর্তৃদাস : গয়া কাসী (যোগী যোগ করে) -শ্রী বৃন্দাবন। আচ্ছা যাবোতো, কত দিনের পথ?
যোগী : ঝট-পট তৈরী হয়ে নাও ঝটপট্। আরে বহু দিনের পথ।
ভর্তৃদাস : এতাদিনের পথে যাবো, এতো দিন ধইরে যে নগর বাসীর সাথে খেলা ধুলা কইলেম। তারে একটা কথা পুসপুট করা ভালোনা?
যোগী : তা-তো ভালোই যখন তাইলে যাও বুসফুস কইরে আসো। তাড়াতাড়ি আসবে আমার কিন্তু অনেক দেরী হইয়ে গেছে।
ভর্তৃদাস : টপ্ কইরে যাবো আর ঝপ্ কইরে চইলে আসব। (আসরটিকে একবার ঘুরে) আরে এই ভাই নগর বাসীরে-
নগরবাসী : নগরবাসীরা সবাই সায় দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তৃদাস : আরে ভাই আমি যাচ্ছি রে।
নগরবাসী : কোথায় যাচ্ছস।
ভর্তৃদাস : ক্যা!
নগরবাসী : আরে এদিক আয় এদিক আয়। সুর তো ভালোই হয়েছে। আরে তোকে তো আশ্চর্য ধরণের লাগছে ব্যাপার কি?
ভর্তৃদাস : পেয়েছি যে-।
(নগরবাসী: তাই? আরে তাই)
ভর্তৃদাস : কিরে ভাই।
নগরবাসী : আচ্ছা তোরে যে ঝোলা মোলা দিছে, হাতে কি দিছে বেড়ী, লাঠি। মাথায় কি বানাছে। পায়ে বেড়ী। তোকে দেখে তো নাটরের হাজতে নিয়ে যাবে।
ভর্তৃদাস : (বোকার মত) তাহলে কি উপায় করব।

(নগরবাসী: শোন তোর গুরুদেবকে যায়া বল, কোন জিনিসের কোন কাম আর কোন জিনিসের কোন নাম। এই যদি বলতে পারে তাইলে যাইস আর নচেৎ ব্রীজ খেলার কম্পিটিশন আছে কিন্তু..)

ভর্তৃদাস : আইচ্ছা আইচ্ছা।
ভর্তৃদাস : এই গুতাজী।
যোগী : কী হলো।
ভর্তৃদাস : আমায় কি কইছেন। বগলে হোলা, মাথায় এই বলদের কি শিং কইছেন হাতে কুত্তা মারা ঠেঙ্গা, এই যে হাতে পায়ে বেড়ী দেখে নাকি নাটোরের জেলে ভইরবে?
যোগী : তা তুলতে পারি তো বাপু। তোমার কি হয়েছে বাপু। তোমার কি হয়েছে?
ভর্তৃদাস : ওরা সব বলতিছে যে দেখ এই যে সমস্ত নগরবাসী ছাড়ে তোর যে গুরুদেব হইছে এই কোন জিনিসের কোন নাম আর কোন জিনিসের কোন কাম, এই যদি বইলতে পারে তাহলে যাইস আর নাহলে ব্রীজ কম্পিটিশন।
যোগী : সব বইলতে পারলে তুমি যাবেতো হে বাপু?
ভর্তৃদাস তা যাই না যাই সেডাতো আমা মুন।
যোগী : তবে রে বইলা দি কান খুইলা শোন।

এর পর ভর্তৃদাস নিজেই গান ধরে-

'ওরে ভোলার মন চল যাই শ্রীবৃন্দাবন', পাইলরা সাথে পাইল ধরে 'চল যাই শ্রীবৃন্দাবন॥' (ধুয়া)। পর্যায়ক্রমে গানটি নীচে দেয়া হল :

বাপজান হাতমে রেড়ুয়া, হাতমে রেড়ুয়া রেড়ুয়া করে ভবে ঠাই,
গুরুজী আ হায় হাতমে রেড়ুয়া ভোল মোনা বাই বাই॥
ধুয়া : ওরে ভোলা মন চল যাই শ্রীবৃন্দাবন।
বাপজান কপালমে ফোটা কপালমে ফোটা ফোটা পড়িয়া ভবে সার॥
ধুয়া : হায় হায় ফোটা পড়িয়া ভবে সার।
গুরুজী আ হায় কপালমে ফোটা দিন-রাতি-বার,
ধুয়া: ওরে ভোলার মন চল যাই শ্রীবৃন্দাবন॥
বাপজান বগলমে ঝুরি বগলমে ঝুলি, ঝুলি করিয়া ভবে সার।
গুরুজী আহায় বগলমে ঝুলি নগর মানিবার॥
ধুয়া: ওরে ভোলা মন চল যাই শ্রীবৃন্দাবন।
বাপজান হাতমে ডাণ্ডা হাতমে ডাণ্ডা, ডাণ্ডা করিয়া ভবে সার।
গুরুজী আ হায় হাতমে ডাণ্ডা সমান করাইবার॥
ধুয়া: রে ভোলার মন চল যাই শ্রীবৃন্দাবন।
বাপজান গায় মে উড়না গায়ে মে উড়না, উড়ন পরিয়া ভবে সার।
গুরুজী আহায় গায় মে উড়না, শ্রী নামাইবার॥
ধুয়া: রে ভোলার মন চল যাই শ্রীবৃন্দাবন।
বাপজান পায় মে নোপুর পায় মে নোপুর, নোপুর পড়িয়া ভবে সার।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুজী আ হায় পায় মে নোপুর, বাজনা শুনিবার॥
ধুয়া: রে ভোলার মন চল যাই শ্রীবৃন্দাবন।

এইতো শুনলে হে বাপু চল যাই।

ভর্তৃদাস : হ্যা, গুরুজী

যোগী : যাওয়া লাগবে না?

ভর্তৃদাস : দেখেন। ছোয়াল পোয়াল শুনতে বইলছে। বিদেয় না দিয়ে যাওয়া যায় নাকি।

যোগী : তাহলে যাও। তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে আস। দেরী করনা।

ভর্তৃদাস : আরে এ ভাই নগর বাসী।

নগরবাসী : কি ভাই নগরবাসী।

ভর্তৃদাস : এদিক শুনরে ভাই।

নগরবাসী : ভাই শুইনে তোই ভাই আমারও তোর সংগে যাইতে ইচ্ছে করছে।

ভর্তৃদাস : চইলে আয়।

নগরবাসী : আমার কাছে। তোই ঐডা গুরু। তোর গুরুদেবকে যাইয়ে বল। ঐ চার কোনে চাইড্যা কি আছে। ভজন সাজন কইরে গেলে কোন বাদ বিসম্বাদ আসে না।

ভর্তৃদাস : চার কোনাতে চাইড্যা দেবতা আছে।
(নগরবাসী উত্তর দেয় "হ্যাঁ-হ্যাঁ")

ভর্তৃদাস : ওরে ভজন সাজন কইত্যে হবে। তাই চলে এসে -কেরে -এ-এ গুতাজী...।

যোগী : গুরুজী।

ভর্তৃদাস : এ গুরুজী। চার কোনে চাইড্যে কি আছে। ওরে ভজন সাজন কইরে গেলে সব বাদ মানে বন্দ।

যোগী : কি বন্দ বাপু?

ভর্তৃদাস : একবারে টোটাল স্টপ।

যোগী : সে কিহে বাপু, একবারে টোটাল স্টপ মানে? কি বাদ বিসম্বাদ?

ভর্তৃদাস : হ্যা-হ্যা, বাদ-বিসম্বাদ। আমি মনে কইছি...(অন্য অর্থপূর্ণ শব্দ বলে)।

যোগী : তুমি খালি উলোট পালোট কথা বইলো। ওরে ভজন সাজন কইরে গেলে সেতো আমারও ভালো। তা ওগে ভজন সাজন কইরে গেলে তুমি যাবেতো?

ভর্তৃদাস : তা যাই কি না যাই সেডা আমার মোন।

যোগী : তাইলে তবে বলি কান খুইলা শোন-

এবার যোগী শুরু করে-

গুরুর নাম ভজন করো-ও
দীন যায় রে গুরুর নাম
জয়দ বাপ এতো গুণ দিয়া নামী
ওরে হাত মর্ত হয়ে যায় হরে হরে
ওরে আসরে কাদাইলাম আমি
ওরে তোমার নামটি লয়ে
জয়দ বাপ পূবেতে বন্দিয়া লইলাম
ওরে ধর্ম নিরাঞ্জন
ওরে তারপরে বন্দিয়া নইলাম
ওরে পথেরও চরণ
ওরে রাস আর ভগ্যল জয়
ওরে রজনী প্রভাত ও কালে
ওরে তার পরে নগর গুরুর
নাম ভজন করে দীন যায়রে গুরুর নাম

জয়দাবাপ উত্তরে বন্দিয়া -
ছেইলা দেবীর ঘাট ও জয়...
ওরে সেই ঘাটেতে স্নান করিলে
ওরে দেহের ক্ষয়নী পায় মাপ ও জয়...

Dhaka University Institutional Repository

জয়দাবাপ পশ্চিমে বন্দিয়া নইলাম
ওরে পারোয়ার মক্কা মো জয়
ওরে আশি হাজার নয় লাখ পীরের
ওরে সেই খানে বানলাম

জয়দাবাপ দক্ষিণে বন্দিয়া নইলাম
ওরে শীর্ণ ক্ষীর সাগরও জয় হরে হরে
ওরে সেই সাগরে বাণিজ্য করে
ওরে চন্দ্র সওদাগর
ওরে গুরুর নাম ভজন ও করো
দীন যায় রে গুরুর নাম

(এরপর একে একে চারদিক বন্দনা)

শিক্ষা গুরুর বন্দনা

ওরে গানে গুরু বইন্দা নইলাম
জয়দবাপ স্বরস্বতী বিনা পতি
ওরে বিদ্যার পতি
ওরে তোমাকে যে মনে করে
ওরে হিন্দু মুসলমান গুরুর নাম ভজন করো।

এই গান গাওয়ার সময় যোগী ও ভর্তৃদাস ঘুরে ঘুরে আসর প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণ করার সময় বিশেষ করে ভর্তৃদাস খুব সুন্দর করে নাচে। যদি তাঁর বাম 'পা'কে (১) ও ডান 'পা'কে (২) ধরি তাহলে তাঁর ব্যবহৃত নৃত্যের যে চিত্র আমরা পাই তা নিম্নরূপে দেখান যেতে পারে-

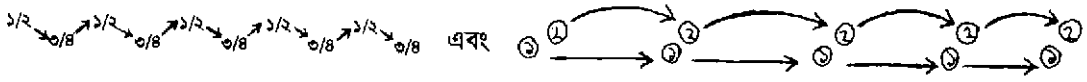

এরূপ ছন্দে পা ফেলে নেচে নেচে ভর্তৃদাস আসরে ঘুরতে থাকে। পাইল দোহারদের গানের চরণগুলি ধরিয়ে দেয় এবং ছেড়ে দেবার আগে নিজে কুঁজো হয়ে পাইল দোহারদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর গান শেষ হবার আগে খোলের তালের বিটগুলি দ্রুত পড়তে থাকে। যোগী এবং ভর্তৃদাস যখন গানের কোন অংশ ভুলে যায় তখন তারা পাইল দোহারদের নিকট থেকে গানের পরবর্তী চরণগুলি জেনে নিয়ে থাকে। বন্দনা শেষে-

যোগী : চল শ্রীবৃন্দাবন।
ভর্তৃদাস : (চেঁচিয়ে ওঠে এবং কোন কিছু দেখে যেন ভয় পয়েছে এ রকম করে বলে) -আর যায়া হলনা।
যোগী : (যোগী তাঁর এরূপ আচরণের কারণ জানতে চেয়ে বলে) কি হয়েছে তোমার কারণ কি?

সে কতগুলো গাছ দেখিয়ে : ঐ যে হাতীর মত লটপট করছে। যোগী: ওগুলি বৃক্ষ। নাম মধুবন। ভর্তৃদাস : মধুর বউ। সাথে সাথে পইলের মধ্য থেকে একজন: ওখানে মধুর বউ হলে কিল্ একটাও পিঠের থেকে নীচে পড়বেনানে। ভর্তৃদাস জানতে চায়, গাছের উপরে ঐ যে সাদা সাদা হলুদ হলুদ ওগুলি কি এবং কেমন করে ফোটে? তারপরে জানতে চায়, ঐ ফুল মানুষের হয় কিনা। সে মানুষের ফুলের ভাল মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে আরোও প্রশ্ন করে-

ভর্তৃদাস : এই বারোডা ফুলের মধ্যে কোন ছয়ডা ভালো আর কোন ছয়ডা খারাপ আর ঐ ভালো ফুলে ছেলে জন্ম নিলে কি হবে আর খারাপ ফুলেই বা ছেলে জন্ম নিলে কি হবে এই সব কথা যদি বলতে পারো তুমি তোমার কান্দে চইড়ে চিৎ কইতে কইতে গোয়াল ঘরে সাইন্ধে যাব আমি।
যোগী : এ কথা সামান্য নয়। এ কথা বলা যাবে না।
ভর্তৃদাস : আমার যাওয়াও তো সামান্য নয়।

এরপর যোগী তাকে পথে যেতে যেতে বলতে চায়। ভর্তৃদাস বলে পথের কথা কতেক সত্য কতেক মিথ্যা। যোগী: গয়া কাশী শ্রীবৃন্দাবনে বলব। ভর্তৃদাস: ওখানে শিয়াল কুত্তার আড্ডা শুনবে কেডা। এখানে দশ বাবু ভাইয়েরা এবং

Dhaka University Institutional Repository

পাচজন মা শকুনেরা শুনবেন বললে পাইল দোহাররা ভর্তৃদাসের এই সব ভুল শুধরে দেয়। ভর্তৃদাস : আপনি বলবেন আমি বুঝব। যোগী জানতে চায় যে সে বুঝলে গয়া কাশী যাবে কিনা-

ভর্তৃদাস : যাই না যাই সেইডা আমার মোন।
যোগী : তাইলে তরে বইলা দি কান খুইল্যা শোন।

যোগীর গান শুরু হয়-

আ-রে শুন শুন শুন রে মন বারো ফুলের ক থা॥ (ধুয়া)
আহা-আ আর কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়
ওরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করলে নারী ব্যাজার হয়রে॥ (ধুয়া)
আ-আর জষ্ঠি মাসে ফুল ফুটিলে বাছা ফুলতে ভালো নয়
আর আষাঢ় মাসে ফুল ফুটিলে বাছা ফুলতো ভালো নয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে বেশ্যা কুলে যায় রে॥ (ধুয়া)
আ-আর ভাদ্র মাসে ফুল ফুটিলে ফুলতো ভালো হয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে অশ্ব যোগ্য হয় রে॥ (ধুয়া)
আর আশ্বিনেতে ফুল ফুটিলে ফুলতো ভালো হয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে পইড়া পণ্ডিত হয়॥ (ধুয়া)
আ-আর কার্তিক মাসে ফুল ফুটিলে বাছা ফুলতো ভালোনয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলের যক্ষ্মা কাশ ও হয়॥ (ধুয়া)
আ-আর অগ্রাহায়ণ মাসে ফুল ফুটিলে ফুলতো ভালোনয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে অংকে কুড়ি হয়॥ (ধুয়া)
আ-আর পৌষ মাসে ফুল ফুটিলে ফুলতো ভালো হয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে জগতকথা কয়॥ (ধুয়া)
আ-আর মাঘ মাসে ফুল ফুটিলে ফুলতো ভালো হয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে মানবের লক্ষণ হয়॥ (ধুয়া)
আ-আর ফাল্গুন মাসে ফুল ফুটিলে ফুলতো ভালো নয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে দেখতে ভালো হয়॥ (ধুয়া)
আ-আর চৈত্র মাসে ফুল ফুটিলে ফুলতো ভালো নয়
সেই ফুলেতে জন্ম নিলে ছেলে চতুর্বেদী হয়॥ (ধুয়া)
ওরে ভোলা মন শোন বারো ফুলের কথা॥

এর পরে যোগী ভর্তৃদাসকে প্রশ্ন করে তোমার গলায় কি এটা?

ভর্তৃদাস : সে হ্যা-হ্যা হ্যা করে হেসে ওঠে। তারপরে বলে তাবিজ।
যোগী : কিসের তাবিজ?
ভর্তৃদাস : বুঝ সুঝের তাবিজ।
যোগী : কেন তাবিজ কেন?
ভর্তৃদাস : কিছু মনে থাকে না।
যোগী : তোমাকে তাবিজ কে দিয়েছে?
ভর্তৃদাস : বউ আমার বউ দিয়েছে।
যোগী : তুমি না বল্লা তোমার কেউ নেই। এখন তোমার বউ এলো কোত্থেকে ?
ভর্তৃদাস : তাহলে কি তোমার বউরে আমি নেব।
যোগী : কখন দিয়েছে?
ভর্তৃদাস : ঐ যখন আমি পানে ব্যবসা কইতাম। তখন আমারে জিগোয় এরে ভাই তোর নামটা কী? আমি বইলেম কি বইল্লে আমি বইল্লাম আমার নাম চানু। ও বইল্ল তোর পিঠে কেনু । তারপর আমি জিগোয়লেম তোর নাম কি? ও বল্ল আফজাল। আমি কিছু বইলতে পারলাম না। তারপর বাড়ী আইলে বউকে বইল্লাম। বউ বইল্ল তুমি নাম জিগোয়ছিলে। কি বইল্ল সে। আমি বইল্লাম আফজাল।...।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর যোগী তাবিজটি খুলে ফেলতে বলে এবং আশ্বাস দেয় যে, তোমারে এই যে ফুলের জ্ঞান দিচ্ছি আর তাবিজ লাগবেনানে। ভর্তৃদাস তাবজ খোলার কথা জানাতে যায় নগরবাসীকে কারণ তার ফুলের জ্ঞান হয়েছে। তখন নগর বাসীকে সে জিজ্ঞেস করে ফুলের পরে কি হয় । নগরবাসী বলে ফল হয়। এ কথা সে মানে। এরপর সে যোগীর কাছে এসে বলে কোন ফল ভালো আর কোন ফুল মন্দ আর ভালো কি হয় আর মন্দ ফলেই বা কি হয়?

ভর্তৃদাস : এই কথা যদি বইলতে পার তুমি তোমারে কান্দে কইরে সীতা বনে যাব আমি।

গান শুরু হয়-

বাচারে পাল্লক দায় আয় বাচারে জনমের কথা কই॥ (ধুয়া)
যখনেতে তোমার মায়ের ঋতু কালও হইল
সকল কাজ দূরে রেখে মা পতি ঘরে নিল
খাট পড়ে পালংক পড়ে না করে আলিস
চারিদিকে পইরে নিল গেরদা আর বালিশ॥ (ধুয়া)
বাপে দিল ধোন কুড়ি মা অঞ্চল পাইতে নিল
একরতি বিন্দু মায়ের উদরে পড়িল
যখনেতে পাইল বিন্দু জননীর উদরে
আর জদ্ধো রঙ্গ থুইয়া বিন্দু লাল রঙও ধরে॥ (ধুয়া)
একদিনে হইলে বিন্দু নিওরিতে টলে
দুই দিনে হইলে বিন্দু রক্তের সংগে মিলে
তিন দিনে হইলে বিন্দু ফেনার আকার হয়
চার দিনে হইলে বিন্দু দেহের সঞ্চয়॥ (ধুয়া)
পাচ দিনে হইলে বিন্দু কাজলের রেখা
ছয় দিনে হইলে বিন্দু শইলের মোহরা
সাত দিনে হইলে বিন্দু হেলা দুলা করে
আট ও দিনে হইলে বিন্দু বেদনা উদরে॥ (ধুয়া)
নয় দিনে হইলে বিন্দু স্তনে পড়ে কালি
দশ দিনের হইলে বিন্দু আখির গঠন গঠে
এক মাসের কালে জ্ঞানে বা না জানে
দুই মাসের কালে লোকের কানে কানে॥ (ধুয়া)
তিন মাসের কালে লহু দলা দলা
চার মাসের কালে হাড়ে ছমচে জোড়া
পাঁচ মাসের কালে পঞ্চ ফুল ফোটে
ছয় মাসের কালে এ যুগ পলটে॥ (ধুয়া)
সাত মাসের কালে ওমা সাতেশ্বরী খায় (বিভিন্ন জিনিস)
আট মাসের কালে মন পবন চিরায়
নয় মাসের কালে নব ঘনাস্থিতি
দশ মাসের কালে পিণ্ডের মুকোটি॥ (ধুয়া)
দশও মাসও দশদিন মায়ের পূর্ণ হয়া গেল
মায়ের উদরে থাইক্যা শিশু ভাবিতে লাগিল
মায়ের উদরে থাইক্যা আমি কইলেম কোন কাম
বিষ নাই ধরিয়া মায়ের মাড়িল বর্জ্য টান॥ (ধুয়া)
মলাম মলাম বইলে মা খাইল পটকান
ওরে শুভ দিনো শুভক্ষণে তোমার জন্ম হইল
চান বদনে সবার সহিত রাধা কৃষ্ণ বল॥
বাচারে পল্লকদাস আয় বাচারে জনমের কথা কই॥ (ধুয়া)

গান শেষে-

যোগী : আমি বল্লাম তুমি শুনলে।
ভর্তৃদাস : চেচিয়ে কে শুই নিয়েছে শুতাজী। কই শুই দিয়েছো-আমি চোর!

Dhaka University Institutional Repository

যোগী : আরে তুমি চোর হবে কেন। আমি বলছি আর তুমি শুনছো।
ভর্তৃদাস : শুনছি?
যোগী : হ্যা। শোন বিন্দু মানুষের হয়। সময় কালে তা তৈরী হয়।
ভর্তৃদাস : বিন্দু খরচ করা ভালো মন্দ আছে নাকি ?
যোগী : ভালোও আছে মন্দও আছে।
ভর্তৃদাস : বিন্দুর খরচ কোথায় হয়। বিন্দু খরচ কইলে কি হয় আর না করলে কি হয় আর কখন কখন ভালো বিন্দু মন্দ বিন্দু হয় এই কথা যদি বলতে পার তুমি তাহলে তোমাকে... বৃন্দা বন লইয়ে যাব আমি।

গান শুরু হয়:

ধুয়াঃ বাচারে পল্লকদাস, আয় বাচারে জনমের কথা কই।

শুন শুন শুন বন্ধু শুন বিন্দু সমাচার
চোখের শতকে বিন্দু লহু যে বান্দার॥ (ধুয়া)
শত বিন্দু লহু বের হয় মজক হইতে
শত বিন্দু ঘাম বের হয় তাহার সঙ্গেতে॥ (ধুয়া)
এই ঘাম লহু বান্দার মনি পয়দা হয়
ইহার মধ্যে একরতি বিন্দু হয় জানিবে নিশ্চয়॥ (ধুয়া)
জুয়ান কালেতে মনি বাড়ে অতিশয়
যতেক করচ বাছা ততই নাইড়ে যায়॥ (ধুয়া)
রাত্রে ঝুড়ে দিনে পুড়ে কমি নাহি হয়
যতেহ খরচ বাছা ততই বাইরে যায়॥ (ধুয়া)
রবিবারে আমাবশ্যা সপ্তমী অষ্টমী
প্রতি পদ আর পূর্ণিমাতে না ভোজে রমণী॥ (ধুয়া)
ইহাতে জন্মিলে শিশু হবে দুরাচার
যুবৎকালে দারিদ্রতে ঘিড়িয়ে তাহার॥ (ধুয়া)
মাসের মধ্যে একদিন বৎসরের মইধ্যে বারো
ইহার মইধ্যে যতো বাছা কমাইতে পারো॥ (ধুয়া)
ইহা ভিন্ন নিত্য নিত্য মিলিলে রমণী
দেহ হবে হীন তাহার নিকটে মরণ॥ (ধুয়া)
বিন্দু ভেদের কথা বাছা করলাম সমাপন
আমার সঙ্গে আয় বাছা ধন যাবো বৃন্দাবন॥ (ধুয়া)

যোগী : এই শুনলে হে বাপু এবার চল। তাহলে এবার চল।
ভর্তৃদাস : যায়া লাগবি?
যোগী : যাওয়া লাগবি না?
ভর্তৃদাস : আচ্ছা গুরুজী ঐযে চাপাবাজী কইলেন না।
যোগী : কি ?
ভর্তৃদাস : ঐ যে ঋ-ঋ যোগী মনে করিয়ে দেয় ঋতু ভেদ।
যোগী : কি ঋতু ? ঋতু মানবের হয়।
ভর্তৃদাস : কবে হয়ছিল?
যোগী : কবে না। এই যে সাতটা বার আছে এই সাতটা বারের যে কোন বারে যে কোন সময় হতে পারে।
ভর্তৃদাস : এই সাতটা বার আছে এর যে কোন বারে যে কোন টাইমে হইতে পারে।
যোগী : এর কোন সময় আর সীমা নাই।
ভর্তৃদাস : আচ্ছা গুরুজী এই সাতটা বার আছে না। এই সাতটা বারের মধ্যে ভালো মন্দ আছে।
যোগী : ভালো মন্দ নাই। ভালো মন্দ আছে তো। এই যেমন বৃহস্পতি খারাপ, শুক্রবার ভালো, বুধবার ভালো।
ভর্তৃদাস : তাহলে ভালো ও আছে মন্দও আছে।
যোগী : তবে কী! ভালো মন্দ আছেতো!
ভর্তৃদাস : অ্যা হ্যা তাহলে তোমারে আমি মাইনবোনা ক্যা, মাইনবোতো।

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তৃদাস : এই কোন দিনে ঋতু হইলে ভালো হয় আর কোন দিনে ঋতু হইলে খারাপ হয়। আর ভালো ঋতুতে ছেলে জন্ম নিলে কি হবে আর ঐ খারাপ ঋতুতেই বা ছেলে জন্ম নিলে কি হবে- এই কথা যদি বইলতে পারো তুমি তাহলে তোমার ঘাড়ে চইড়ে যাব আমি।

যোগী : তাহলে তোমর পাপ হবে বাপু।

ভর্তৃদাস : তাহলে পাপে মুক্তি।

যোগী : ভক্তি কইলে মুক্তি।

ভর্তৃদাস : তাহলে তোমাকে শালা করব।

যোগী : শালা নয় ছালাম করবে। এসো তোমাকে আশীর্বাদ করব। এতো বেশী কথা তোমাকে কে শিখাইছে।

ভর্তৃদাস : আমি বাচি কুটি?

যোগী : তুমি বোকা, তোমার বোকামো কমেনি। তোমার এতো বুদ্ধি জানলে আমি সাথে নিতাম না।

ভর্তৃদাস : এ্যা আমি মূর্খ্য কম। তাহলে আমি বোকাটাছি। বলে যোগীকে জড়িয়ে ধরে।

গান শুরু-

ধুয়া: রে গুরুজী ভক্তিভাবে করিরে আমি ঋতু ভেদের কথা

ওরে কহিব কহিব কথা কথা বড় কায়
আর গুপ্ত কথা ব্যক্ত করলে নারী বেজাড় হয়া(ধুয়া)
ওরে ও গুরুজী ভক্তি ভবে...।
ওরে সোম বারে ঋতু হইলে নারী ভাগ্য মনি
ওরে মঙ্গল বারে ঋতু হইলে নারী চণ্ডালিনী
ধুয়া:...।
বুধবারে ঋতু হইলে নারী ভাগ্যবান
বৃহস্পতিবারে ঋতু হইলে পুত্র পায় দান
ধুয়া:...।
শুক্রবারে দিনে নারী ঋতু স্থান ও পায়
সেই ঋতুর ছেলে বাছা ধনবান ও হয়
ধুয়া:...।
শনিবারে দিনে নারী ঋতু স্থান পায়
সেই ঋতুর ছেলে বাছা বিষম ডাকাত হয়
ধুয়া:...।
শনিবারে দিনে ঋতু আমাবশ্যা পায়
নিশ্চয় জানিবে তাহার স্বামী মারা যায়
ধুয়া:...।
রবিবারে দিনে নারী ঋতু স্থান পায়
সেই ঋতুর ছেলে বাছা গর্ভে বিনাশ হয়
ধুয়া:...।
রবি বারে দিনে ঋতু শুল যোগ পায়
নিশ্চয়ই জানিবে তাহার জোড়া মৃত্যু হয়।
ধুয়া:...।
ঋতু ভেদের কথা বাছা কইলাম সমাপন
আমার সংগে চল বাছা যাব বৃন্দাবন
ধুয়া:...।

ভর্তৃদাস ঘুরতে ঘুরতে দর্শকের কাছা কাছি বসে মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন করে অর্থাৎ হঠাৎ চিৎকার করে বলে আমি কাঠাল খাবো।

ভর্তৃদাস : ওরে বাপুরে এ্যা এমনতো সর্বনাশা মানুষতো দেখলাম না।

যোগী : তোমার কি হয়েছে।

ভর্তৃদাস : হায় হায় হায়। আমি কেবল একটু শুয়ে ঘুমাইতে লপোন দেখছি।

যোগী : স্বপোন ?

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তৃদাস : হ, লপোন।
যোগী : হেই অপুল্যা মানুষে দেখে স্বপন আর তুমি দেখছিলে লপন।
ভর্তৃদাস : আমি দেখছি বইল্যে।
যোগী : লপোন না স্বপোন স্বপোন।
ভর্তৃদাস : না লপোন লপোন।
যোগী : আবার বলে লপুন স্বপন।
ভর্তৃদাস : না লপুন আমাগে নপুন।

পাইল দোহার : কি দেখছিলে তা কইয়া ফেলাও দেখি।

ভর্তৃদাস : আমার লপোনের কতাডা শুইনবে ?
যোগী : হ্যা।
ভর্তৃদাস : দেখেন আমার আস্ত একটা ঘুম আইসেছে। ঘুম আসার পরে আমারে লুপনে বলতিছে হে ভর্তৃকদাস তুমি গরিব। আচ্ছা তোমার ঐ বাড়ী ঘর যদি দালান কোঠা কইরে দি তইলে তুমি নিব কি?
যোগী : তখন তুমি কি কইলে ?
ভর্তৃদাস : আমি কইলাম কি তা তুমি যদি কইরে দাও তাইলে নেয়া যাইতে পারে। তারপরে দেখতে দেখতে একটা রাজবাড়ীর মতো উঠোই দিছে। তারপরে দোতালা তেতালা বিল্ডিং কইরে দিল।
যোগী : তারপরে ?
ভর্তৃদাস : তারপরে কইছে এই এই ভর্তৃদাস তাড়াতাড়ি ঘুমাই পর। আমার সে সে তো খ্যাওরের ঘরে থাকে দালানে শোয়নি। এর মধ্যে কে একজন চলে গেল।

এইভাবে ভর্তৃদাস স্বপ্নে প্রসংগ তুলে সে যোগীর কাছে কানতে চায় স্বপ্ন ভেদের কথা। আর যোগী ভর্তৃদাসকে বোঝানোর জন্য শুরু করে স্বপ্ন ভেদের গান।

ধুয়াঃ ও-ও-ওশুন শুন রে মন স্বপ্ন ভেদের ক-অ-থা।

আর কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
ওরে সত্য কথা ব্যক্ত করলে নিজের ক্ষতি হয় ॥
ধুয়াঃ ...।
আর স্বপ্নমেতে যে জনরে মরার মাংস খায় রে,
নিশ্চয়ই জানিবে সে জন সম্পত্তি পইরা পাও রে॥
ধুয়াঃ ...।
আর স্বপনেতে যে জন পিতল দেখতে পাও রে,
ওরে নিশ্চয়ই জানিবে তাহার লক্ষীর দৃষ্টি হয় ওরে॥
ধুয়াঃ ...।
আর স্বপনেতে যে জনরে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে রে,
ওরে নিশ্চয়ই জানিবে তাহার ভাই ও মারা যায় রে॥
ধুয়াঃ ...।
আর স্বপনেতে যে জনরে পাকা আমও খায়ও রে,
ওরে নিশ্চয়ই জানিবে তাহার পুত্র মারা যায়ও রে ॥
ধুয়াঃ ...।

এইভাবে একের পর এক স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে যোগী শেষ করে এর পরে ভর্তৃদাস আবার শুরু করে-

ভর্তৃদাস : আমার আর যাইতে মন চায় না গুরুজী।
যোগী : ক্যা যাইতে মন চায়না ক্যা ?
ভর্তৃদাস : হাসতে হাসতে দিনতি খোলা হইরমু।
যোগী : তা তুমি আমার সাথে যাবেতো ?
ভর্তৃদাস : চলেন যাই। হঠাৎ চিৎকার করে ভগবান যাওয়া হলনা। বলেই সে যোগীর পেছনে পেছনে গিয়ে জড়িয়ে ধরে যোগীকে। ঐ যে দাড়াই থাকল যে।

Dhaka University Institutional Repository

যোগী : কৈ?

ভর্তৃদাস : ঐ হাতির মত লটপট করল যে। ঐ যে হাইসছে যে!

যোগী : আরে বাপু ওটা তো গাছ বটবৃক্ষ।

ভর্তৃদাস : গাছ -বাঃ ভালোইতো লাইগছে।

যোগী : কত বড় বৃক্ষ ডানা ভাল লাগবি না।

ভর্তৃদাস : ছেলে মরভু।

যোগী : ক-মহা।

ভর্তৃদাস : হ্যা হ্যা মহাপ্রভু গাছ যেমন ডানা মেইলে ডাল আছে শেকড় আছে, গাছের গোড়া আছে।

যোগী : সব আছে সব। তোমাকে তো আগেই বলেছি। যা আছে বহিরভাণ্ডে তা আছে নিজভাণ্ডে।

ভর্তৃদাস : বাপরে যা আছে বউয়ের ঘাড়ে তা আছে আমার ঘাড়ে।

যোগী : তা না হে বাপু, যা আছে শয়ের সংসারে তা আছে তোমার নিজের সংসারে।

ভর্তৃদাস : তালে গাছ আছে ?

যোগী : গাছ আছে ।

ভর্তৃদাস : গাছের গোড়া আছে। গোড়া ফল ডাল পাতা সব আছে। ক্যা তালে মাইনবো না ক্যা। মাইনবোতো ওরে আমার সোনারে।

যোগী : আমি তো মানার কথাই বলছি বার বার তুমি তো খালি আমার সাথে প্যাচ লাগাচেছা। তুমি আমার সাথে যাবেতো।

ভর্তৃদাস : আমার এই দেহের মধ্যে গাছ কে গাছের গোড়া কে, ডাল কয়ডা, কোন ডাল কোন দিকে গ্যাছে আর ঐ গাছের পাতা কে আর ঐ গাছের ফল কে - এই যদি বইলতে পারো তুমি তোমায় কান্দে কইরে নিয়ে এবার চইলে যাব আমি।

যোগী : তা আমি যদি বইলতে পারি তুমি যাবে তো ?

ভর্তৃদাস : (মুচকি হাসি ছাড়ে)।

যোগী : তোমার এই মুচকি মারা হাসি দেইখে আমার ভাল লাগছে না। মনে হয় তুমি যাবে না। আচছা আমি যদি বইলতে পারি তালে তুমি যাবে তো?

ভর্তৃদাস : বইল্যামনা সেইডা আমার মোন।

যোগী : তাইলে তরে বইল্যা দি কান খুইল্যা শোন।

পাইল : খুব বিরক্ত করে। আগে জানলে এরাম সাথে নেয়া যাইত না।

যোগী : তাইর ভাই। খুব বিপদে পইড়ে গেলাম। প্রথমে কইল আমার কিছু নাই। বউ নাই। ছাওয়াল নাই, ভাই নাই, বোন নাই। এখন আস্তে আস্তে ওর সবই আছে। এডা কুন বিপদে ফেলছে আমায়।

ভর্তৃদাস : কে ফেইল ?

পাইল : আরে লোকটা টেটরতো!

যোগী : হ আর কি আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি। খন্দায় খন্দায় খুটি খুটি কথা বাইর করতিছে।

পাইল : যক্কোর ছ্যাচ্চোর লোক, বলে জানেনা কিছু আর ওর বউ ওরে দিছিল হুক ফুকের তাবিজ। আচ্ছা আমি এবার বইল্লে আমার সাথে যাবে তাড়াতাড়ি।

গান শুরু করে-

ধুয়া: ওরে গুরু দেব ভক্তি ভাবে করছি আমি দেরাক নামার কথা।

ওরে কে বা হল গাছের গোড়া কে বা হোল ডাল,
আর কে বা হল গাছের পাতা কে বা হল ফল॥
ধুয়া: ...।
আর হকিকত গাছের পাত মারেফত হয় ফল,
ওরে একপানা ডাল গেল দোজখ মাজারে॥
ধুয়া: ...।
আর আর একখানা ডাল গেল বেহেস্ত মাজারে,
ওরে আর একখানা ডালে আমার দিন নাথ বসে॥
ধুয়া: ...।
আর তাহারও হুকুমে গাছের একটি পাতা ঝরে,
ওরে তরিয়া শুনিয়া পাতা বুজিবে যেদিন,

Dhaka University Institutional Repository

আর সেদিনে জানিবে বাছার হইবে মুশকিল॥
ধুয়াঃ ...।
ওরে আযরাইল ও বুঝিয়া পাতা জীবরাঈকে দিল,
ওরে জীবরাঈল লইয়া পাতা ইসরাফিলকে দিল॥
ধুয়াঃ ...।

এভাবে যোগী শেষ পর্যন্ত ভর্তৃদাসকে ছন্দে মিলিয়ে বলে থাকে "আমার সঙ্গে আয়রে বাছা যাব বৃন্দাবন।"

এরপরে নারীরাও যে ধনের অধিকারী তা বোঝাতে গিয়ে ভর্তৃদাস "ওরে গুরু দেব ভক্তিভাবে করছি আমি দেরাক নামার কথা"-এই গান দিয়ে তাঁর নিজস্ব একটি ঘটনার বর্ণনা শুরু করে। এ সময় তাঁর বর্ণনার শ্রোতা হল আসরে পাইল দোহারেরা এবং তাঁর প্রভু -যোগী বর।

ভর্তৃদাস : একদিন হইল কি জানেন, জৈষ্ঠ্য মাসের দিন ।
যোগী : আচ্ছা।
ভর্তৃদাস : যেতেম ঐ হাইতেম পূজায় হাটে।
যোগী : (শুধরে দেয়) হাতিম দার হাটে।
ভর্তৃদাস : দেখি হাতিম দা যায়। ছাপ্পান্তর টাকা দিয়ে কিনলেম এক হাতাল।
যোগী : ছাপ্পান্তর না ছেয়ান্তর আর শাঠাল না কাঠাল।
ভর্তৃদাস : হ্যা কাঠাল কিনা চলে আসলাম। আলেম ঐ রিক্সায় চইড়্যা চরিক্সায় নামায় দিল গেটের কাছে। ঐ অন্ধকারে এখন আর বাড়ী যেতে পারছিনা। তখন ঐধনের কথা মনে হইল। তখন ঐ ধনেরে ডাক দিলেম।
যোগী : কি বইলে ডাক দিলে ?
ভর্তৃদাস : আরে ঐ আমার মা।
যোগী : আরে আমার মা কিরে, বউরে কেউ আমার মা বলে নাকি ?
পাইল : এ লোকটা মাইর টাইর খাবে নাকি।
ভর্তৃদাস : অ্যাঃ অ্যাঃ কেন বউ মা হয় না।
যোগী : বউ কি করে মা হয় বাপু ?
ভর্তৃদাস : আমি যদি দেখাইতে পারতাম।
যোগী : আচ্ছা বেয়াদবকে সাথে বিয়েছি কনতো। মান সম্মান সব আমার শেষ কইরে দিল।
ভর্তৃদাস : আমি যদি দেখাই দিতে পারি।
যোগী : তুমি আমারে দেখাও দেখি।
ভর্তৃদাস : এই যে সমস্ত লোকজন বউ-টউ নিয়ে শুয়ে থাকে। তখন অন্য কোন লোক থাকে ?
যোগী : না, তা থাকে না।
ভর্তৃদাস : আচ্ছা রাত্তিরি ঘুম আইসে গেল। এখন ঘুমন্ত অবস্থায় পাছায় দিল ডাইয়্যার কামড়। তখন চিল্লায় উঠল মাগো। ঐ ঘরের মধ্যে আর কেউ নাই। তাড়াতাড়ি উত্তর দিল কি হইল তোমার কি হইল। তা হইলে কেডা হইল, উত্তর দিল কেডা।
যোগী : হ্যা, বউ উত্তর দিল।
ভর্তৃদাস : দিল না?
যোগী : হ্যা, তুমি তাইলে বুঝায় দিচ্ছ বউ এইভাবে মা হইল।
ভর্তৃদাস : আরে তা না। আমার এক ছেলে আছে বুঝলে। তার নাম রামা। ঐ রামা বইলতে আমা হয়ে গেছে।
যোগী : তোমার মুখে আসেনা।
ভর্তৃদাস : খাসেনা।
যোগী : হ্যা, আসেনা।
ভর্তৃদাস : ঐ আমার ডাক শুইনা মিয়ার বেটী আগারী চলে আইল। তখন ঐ শাঠাল এরম করে ধইরা এ্যাক কইরা ছাড়ায় দিল। তারপর আমার আগে আগে চইল্ল লিয়া। ধুপ কইরা কাঠাল ফেলায় দিল।
যোগী : দিল কাঠাল।
ভর্তৃদাস : ফেলায় দিয়া বল্ল কি আমাগোই তেল দিল পাইরে রসতে আর ফিরে দিল মাথাতে মাখতে।
যোগী : ফিরে দিলো পাইরে বসতে আর তেল দিল মাথাতে মাখতে।
ভর্তৃদাস : তাই নাকি। আমি ভাবছি তেলই পাইরে বসা লাগবি।
যোগী : তেল পইর বসে মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তৃদাস : তাই বলা যায় কি ?
(পাইল : ঐ জন্যি তাবিজ ধারন ঘড়ি ছিল।)

ভর্তৃদাস : হ্যা তারপর আমিতো তেল টেল নিয়ে চইলে গেলাম মরস্তানাতে।
যোগী : স্নান করতে।
ভর্তৃদাস : স্নান করতে। আর এই যে কচ্ছে কি ঐ শাঠাল ভাইঙ্গা রাইখ্যা দিছে। ওর মধ্যে ছোট ছোট আছে হরিবড়ি, ঐগুলা থালের চার সাইড দিয়া সাজায় রাখিছে। আর মধ্যে যে প্রধান সার আছে।
যোগী : সার।
ভর্তৃদাস : সার। আরে আমার বাড়ী ওয়ালীর নাম শাঠাল।
যোগী : বউয়ের নাম লেয়া হবিনা।
ভর্তৃদাস : ক্যা ?
যোগী : বউয়ের নাম নেয় তো মানুষ।
ভর্তৃদাস : বউ স্বামীর নাম না নেয় তো স্বামীর ও বউয়ের নাম না নেয়া উচিত।
যোগী : তুমি ও বউএয়র নাম বাছ।
ভর্তৃদাস : ক্যা বাইছপোনা ক্যা। আমার নাম যে নেয়না।
যোগী : আচ্ছা হল বউয়ের নাম তুমি বাছ ভাল কথা।
ভর্তৃদাস : তখন আমি চিন্তা কইলেম এই হরিবরি কখন আমি খাবনি। আর যতক্ষণে না হয় পেট ভরবে। যাইতো এই বড়ডা আগে খাই। এইডা আগে খেয়ে পেটটা ঠাণ্ডা করি।
ভর্তৃদাস : ঐ মইধ্যের ডা।
যোগী : হ্যা।
ভর্তৃদাস : এই বইলে বাপু ঐ সার তুলে মারছি এক কামড়। কাঠার বইলছে দাত ছাড় আর কাঠাল বইলছে দাত ছাড়। আমার আর দম সইছে না। তখন হায়রে ধনীর ধনা সেই দিন যে কি বাচা বাচাছে। পাড়াপাড়ি করে টানাটানি দেইখ্যা ঘরের মইধ্যে চইল্যা গেল। যাইয়া তেল নিয়া আইল। নিয়া আইসা মুখেত লাগাইয়া ডইল যখন। ধু-প কইরে পইড়ে গেল।
যোগী : বা-বা।
ভর্তৃদাস : অ্যা ?
যোগী : তেল না দিলে তুমি তখন মইরে যাতে।
ভর্তৃদাস : আর একটু হইলে মরিচের খ্যাপে গেইলুনানি। আর ঐ গুলো থুইয়ে যাওয়া যায়। ঠাণ্ডা।
যোগী : আচ্ছা তোমার যদি ঐ ধনের মমতা ছাড়াতে পারি তাহলে তুমি যাবেতো বাপু।
ভর্তৃদাস : কি ভাই পারবু ?
(পাইলদের মধ্যে একজন : "আরে পারবে না। পারবে না। এটা ওর কাম না")।
ভর্তৃদাস : পারছেনা পারছেনা কেউ পারছেনা।
যোগী : আচ্ছা আমি যদি পারি তাইলে তুমি যাবে তো ?
ভর্তৃদাস : (জিজ্ঞেস করে) পাইরতে পারে। সবাই না না বলে। কেউ ভোট দিচ্ছে না।...।
যোগী : আমি যদি বলি...

(এ সময় যোগিনী ও সামদাস বাইরে থেকে গান গাইতে গাইতে আসরে প্রবেশ করে এবং ভর্তৃদাস যোগিনী ও সামদাসের গান শুনে আসরের মধ্যে বিছানো পাটির নীচে, বাচ্চাদের গায়ের কাপড়ের নীচে লুকানো কিছু খুঁজতে থাকে।)

যোগিনী ও সামদাসের আসরে প্রবেশের গীত :

আবাল কালে হছিল বিয়া মাথায় সিদুর দিয়া,
আবাল কালে হছিল বিয়া মাথায় সিদুর দিয়া,
মোর যোগীরে দেও ফিরাইয়া।

উপরোক্ত গান গেয়ে যোগিনী ও সামদাস আসরে প্রবেশের মুহূর্তে আসরের ভিতরে অবস্থানরত যোগী ও ভর্তৃদাসের মুখোমুখি হয়ে যায় :

ভর্তৃদাস : (যোগিনীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যোগীকে প্রশ্ন করে) জন্ম নিল কি ?

Dhaka University Institutional Repository

যোগিনী : (যোগিনীর সাথে যোগীর চলার পথে দেখা হয়ে যায়। তাই যোগিনী প্রথমে যোগীকে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করে...)

আবে ওরে, যোগী হইয়াছো যোগ ধইরাছো ভবে গুনাহ কইরাছো ভবে সার।
মায়ের পেটে ওরে জন্ম নিয়া দুধ খাইয়াছো মার।
আবে ওরে, কয় কড়িতে জপোরে মালা কয় কড়িতে জপো।
বুম বুম রাধা রুদ্রাক্ষীর মালা কাহার হাতে রাখ।

যোগীর উত্তর :

আবে ওরে, দুই কড়েতে ধরিরে মালা তিন কড়িতে জপি।
ঘুমের আবেগ হলে মালা গুরুর গলায় রাখি।

যোগিনীর প্রশ্ন :

আবে ওরে, আইর লড়ে বাইরও লড়ে বাতাসে লড়ে পানি,
ভূ কম্পেতে দুনিয়ে লড়ে অলড় কোন খানি।

এমন সময় ভর্তৃদাস এ্যা...এ্যা... এ্যা... হ্যা... হ্যা... ইত্যাদি শব্দ করে শরীরে মোচড় খেতে খেতে যোগী-যোগিনীর মাঝখানে গিয়ে তাঁদের গান থামিয়ে দেয়। এবং বলতে থাকে-

ভর্তৃদাস : না কি হল আমি নেব।
যোগী : কি নিবে, কি দেখেছো ?
ভর্তৃদাস : (সামদাসকে দেখিয়ে) ঐ ওর সাথে কি উডা। ঐ মানুষ আমি নিব।
যোগী : আগে তুমি জাইনবে তো ঐ মানুষ যে তুমি নিবে, ঐ মানুষ কে, কি নাম-ধাম, কোথায় বাড়ি-কি...
ভর্তৃদাস : না আমি নিব।
যোগী : ঐ লোক যদি তোমার আমার কেউ হয়। আগে পরিচয় লও। আগে তার নাম-পরিচয় লও।
ভর্তৃদাস : কিরে সাধু নাকি ভাই? এ ভাই তুমি-আমি বন্ধু করি এ্যা ?
এ্যা মানুষ বন্ধু করে, দোস্ত করে, কোন জিনিস বদল করে। শুন, আমরা দুজন বন্ধু। আমার দাদার বউ তুমি নিবে ঐ মানুষটাকে আমাকে দে। এই দুইজন অদল-বদল হয়ে বন্ধু হয়ে গেল।
সামদাস : ক্যা। তোর দাদার বউ নিয়ে আমি কি করব। কাঠের ব্যবসা করতে পারো।
তুই আমার মানুষের সাথে কি করবি ?
ভর্তৃদাস : ক্যা সাথে সাথে ঘুরব, দপ। আচ্ছা তোর ঐ মানুষের নাম কি কতো ?
সামদাস : এ্যা, নাম দিয়ে কাম কি ?
সামদাস : আমার মা মশাইয়ের নাম পাইল এই ছাগলা শো এই মানুষের নাম যখন শুনবো তখন তোর মনে লবে খাবো।
ভর্তৃদাস : ওর নাম রসোগোল্লা।
আমি খাইরে-গুরু-ও আমি খাইনে, তুই খা। তোর মা মশাইয়ের একটু দে। কওনা ভাই নামটা কি।
সামদাস : টেকা আছে টেকা ?
ভর্তৃদাস : কি এক বেসাৎ নিয়ে আইছে নাম শুনতেও টেকা লাগে। হ্যা।
যোগী : তা ওরা যদি টাকা চায় তো দিতে হবি।
ভর্তৃদাস : তা আমি কোত্তি পাবো টেকা ?
যোগী : তা আমি কি টাকা আনছি ? না এ্যা, আরে তুমি যদি পরিচয় নিতে চাও তো ঐ দশ ভাইয়ের কাছে ভিক্ষা দিক্ষা করে দেখ। না আমি পারবো নাকো।

যোগী ও ভর্তৃদাস গান ধরে-

তোমরা ভিক্ষা দাওগো নগর বাসী
আমি যোগিনীর নামটা শুনে নি।
হায় হায় যে আমারে ভিক্ষা দিবে
ঐ না চিরদিন সুখী রবে।

ভর্তৃদাস : এ ভাই শোনেন টাকা ধলা নিবু না কালো নিবু ?

Dhaka University Institutional Repository

সামদাস : আমি ভাই ধলা টাকা নিবু। ওই টেকা কাগজের সাদা টেকা নিব।
ভর্তৃদাস : কয় টেকা ? দে যা তোর সম্বল আছে ?
ভর্তৃদাস : একশো টেকা দিবো ?
সামদাস : আমার মা মশাইয়ের নাম শুনবে- রসোবতী।

ভর্তৃদাস গান ধরে-

ও তেরে রসোবতী কাহা যাইত।
একলা কোথায় যাইত তুমি।
ভর্তৃদাস নাচে তাকে ধরতে।
এবার আমর সঙ্গে আইস।
ও তেরে রসোবতী কাহা যাইত।
বন্দী করে মন পিয়া।
এবার থমর থমর করছ।
ও তেরে রসোবতী যাইছো।
ঘোমটা পড়ছে নলক দিয়া।
এবার এদিক একটু আইস।

ভর্তৃদাস : লোক খালি হয়ে গেল
সামদাস : তবে কি তোকে তার দর্শন টা দেবে নাকি দিয়ে গেলিই হয়।
ভর্তৃদাস : দিয়ে গেলিই হয়।
সামদাস : আবার টেকা নিয়ে আইস।

সামদাস ও ভর্তৃদাসের কথা শুনে যোগী ও যোগিনী মুখোমুখি এসে তাঁদের মধ্যে নিম্নরূপ সংলাপাত্মক গীতের আদান-প্রদান হয় :

যোগিনী : ভবের আগের জনম
ভবের ফকিরের বেজায় তুমি স্বর্গের সের ও লাঠি
আসমান হইল কয় জোন জমিন হইল জাতি
ঐ তোমরা আমার কালের যোগীর আগের জনম কী
যোগী : ভবের ফকিরের ও বেজার আমি দরবেশের ও লাঠি
আসমান হইল কয় তোলা জমিন হইল কয় রতি।
যোগিনী : ভবের ওরে কোন ফকিরে দেখাইতো পারো জমের ওরে বাড়ি
কোন ফকিরে দেখাইতে পারো বুকের উপর দাড়ি
যোগী : আবে ওরে, সূর্য হেন ফকির দেখ গ্রামের ওরে বাড়ি
আরে ইনি ফকির দেখ বুকের উপর দাড়ি
যোগিনী : আবে কোন খানে দেখাইতে পারো দিন পাতার পাটি
কোন খানে দেখাইতে পারো বিনা তেলের বাতি
যোগী : আবে ওরে, জীবনে নি চাইয়া দেখে বিনা পাতার পাটি
চক্ষু পানে চাইয়া দেখ বিনা তেলের বাতি
যোগিনী : আবে ওরে, তার কালো দেখাইতে পারো যাবো তোমার সায়
না যদি দেখাইতে পারো ছাইল্যাম তোমার সায়।
যোগী : আবে ওরে, এক কপালো পাইয়া খোলে আরে আর এক কপালে বেশ।
চার কালো দেখাইয়া দিলাম ওলো যোগীর মাথার কেশ
যোগিনী : আবে ওরে শোন আবে শোন গো গোসাই শোনগো হামারা বাত
যোগী : কও তোমরা বাত
যোগিনী : আবে ওরে চারি সাদা দেখাইতে পারো যাবো তোমারা সাত
না যদি দেখাইতে পারো ছইলুম তোমরা সাত

Dhaka University Institutional Repository

যোগী ও যোগিনীর মধ্যে উপরোক্ত সংলাপাত্মক গীত অংশটুকু চলার পরে যোগী ভর্তৃদাস ও সামদাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন- ভর্তৃদাস, সামদাস তোমরা দুই ভাই। তোমরা দুইজন তোমাদের মায়ের কোলে চইলে যাও। আর আমরা দুজন আপন সংসার কইরা খাই।

ভর্তৃদাস ও সামদাস খুশিতে উঃ - হুঃ - উঃ শব্দ করতে করতে আসরের বাইরে চলে যায়। এবং আসরের পাইল দোহারেরা সবাই জমিন প্রণাম করে আসর ত্যাগ করে। প্রথমে ভর্তৃদাস ও সামদাস এবং পরে অন্যান্যরা আসর ত্যাগ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থ

ড. অজিত কুমার ঘোষ, নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ , কলিকাতা, ১৯৯১

আব্দুল ওহাব সরকার, বাংলাদেশের লোকগীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

আব্দুল কাদের, বাংলার লোকায়ত সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৫

আলি নওয়াজ, ময়মনসিংহ গীতিকা, ময়মনসিংহ, ১৯৭৮, পৃ. ৫৬

ডঃ আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, পূর্ব্ববঙ্গ : মৈমনসিংহ-গীতিকা, ঢাকা, ১৯৯৫

ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

ড. ওয়াকিল আহমদ, লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা-১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৬

গৌরী শংকর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, কলিকাতা, ১৯৭২

জিয়া হায়দার, স্ট্যানিসলাভস্কি ও তাঁর অভিনয় তত্ত্ব, সাগর পাবলিশার্স, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা, ১৯৯৫

তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৮

ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, কলিকাতা, ১৩৯১

নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, বাংলাসাহিত্যের কথা, কলিকাতা, ১৩৯৯

নিহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৬

পবিত্র সরকার, নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরূপ, কলিকাতা, ১৩৯৭

বরুণ কুমার চক্রবর্তী, গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, কলিকাতা, ১৯৯৩

মহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), চর্যাগীতিকা, ঢাকা, ১৯৮৯

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, বাংলাদেশের লোককাহিনী : ২য় খণ্ড, নরসিংদী, ১৯৯৭

শামসুজ্জামান খান ও ডঃ মোমেন চৌধুরী (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলনঃ ৫৩, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯২

শ্রীসনৎকুমার মিত্র, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, কলিকাতা, ২০০০

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভরত নাট্যশাস্ত্র-১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৫

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভরত নাট্যশাস্ত্র-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯০

ড. সেলিম আল দীন, বাঙলা নাট্যকোষ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৮

ড. সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, ময়মনসিংহ গীতিকা, ঢাকা, ১৯৯৯

ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, ঢাকা, ১৯৯৫

রওশন ইজদানী, মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য, বাংলা একাডেমী-ঢাকা, ১৩৬৪

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসসমীক্ষা, কলিকাতা, ১৩৮৪

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ : দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯৬

Sonia Moore, The Stanislavski System, Penguin Books, USA, 1984

Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka 2000

Zulekha Haque, Terracotta Decorations Late Medieval Bengal, Dhaka, 1980

Maciver A.C.H, Society, London, 1955

পত্রিকা

ড. আশরাফ সিদ্দিকী, আমাদের গীতিকা সাহিত্য, সাহিত্য সাময়িকী, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা-শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর ২০০১

ফাতেমা কাওসার, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চৌত্রিশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, ১৩৯৭

মুহম্মদ আবু তালেব, 'লোকনৃত্য : গম্ভীরা ও আলকাপ', বাংলাদেশের লোকশিল্প : সোনার গাঁও, ১৯৮৮

শুভাশিস সমীর, 'মণিপুরীদের পালাগান', দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারী-শুক্রবার, ঢাকা, ২০০১।

সানন্দা, ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৮ সংখ্যা, কলিকাতা

ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, সাহিত্য পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা-সাঁইত্রিশ বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০০

THE TELEGRAPH FRIDAY 26 December, 1997

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

আলাউদ্দিন বয়াতী, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০০

ইসলাম উদ্দিন বয়াতী ও তাঁর দল, টিএসসি সেমিনার (৩য় তলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

কুদ্দুস বয়াতী, মহানগর নাট্যমঞ্চ, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০১

পঞ্চানন মণ্ডল ও দুষ্টুপদ মণ্ডল, দীঘাপতিয়া, নাটোর, জানুয়ারী ১৯৯৭

রাধালক্ষ্মী, মাছিমপুর বাজার, পিরোজপুর সদর, ডিসেম্বর ১৯৯৭

শিহাব শাহীন, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, ইসি বাংলাদেশ, লালমাটিয়া, ঢাকা, জুন ২০০১

সম্রাদ সরকার, ঝংকার শিল্প গোষ্ঠী, নেত্রকোনা, কেন্দুয়া, জানুয়ারী, ১৯৯৭

সাইদুর রহমান, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারী ২০০২